বৃষ্টিমুখর বেণুমুখর

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

SEAN
PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা বই পড়ি কেন? জানার জন্য—নিজেদের জানা, এ পৃথিবীকে জানা, আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানা। জ্ঞানের উৎস সর্বজ্ঞ স্রষ্টা। এই জ্ঞানই সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সমাজকে টিকিয়ে রাখে।

জ্ঞানের আধার বই। জ্ঞানচর্চা আমাদের ঐতিহ্য। কালের বিবর্তনে আজ তা হারিয়ে গেছে। তথ্য বিস্ফোরণে জ্ঞান আজ কোণঠাসা। শিক্ষার দৈন্যতায় অজ্ঞতার মহামারী। জ্ঞানার্জনে অনাগ্রহের পাশাপাশি বইয়ের দুর্বোধ্য ভাষা, মলিন প্রচ্ছদ আর জীর্ণ পৃষ্ঠা পাঠ-অনাকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। গ্রন্থগারদে বন্দি প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানের নয়, চারদিকে আজ লঘু বিনোদনের জয়জয়কার।

"সিয়ান পাবলিকেশন"-এর স্বপ্ন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপস্থাপন: ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর জ্ঞান।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে আমরা জীবনঘনিষ্ঠ এবং তথ্যসূত্রে প্রামাণ্য; আমাদের লক্ষ্য সাবলীল ভাষা এবং নান্দনিক উপস্থাপনা। সময়, শ্রম ও সম্পদ সাশ্রয়পূর্বক সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার নিমিত্তে আমাদের রয়েছে ই-কমার্স সংযুক্তি www.seanpublication.com ক্লিকেই পৌঁছে যাবে আপনার ঘরে।

আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞানের এ প্রসার আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীর ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে ইনশা'আল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com



মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় মহান দয়ালু

বৃষ্টিমুখর রৌদ্রমুখর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পৃষ্ঠাসজ্জা	‖	মাসুদ শরীফ
প্রচ্ছদ	‖	মুহাম্মাদ শরীফুল আলম
বানান	‖	যাহিদ আহমাদ (আরবি শব্দের বানানরীতি লেখকের নিজস্ব)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বৃষ্টিমুখর রৌদ্রমুখর

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে। এবং এ সংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আর সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থরচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সহীহুল-জামি' আস-সাগীর, হাদীস নং-৭৬৬২]

অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> « ...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। »
>
> [বাকারা, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আর সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> « ...তোমরা সীমালঙ্ঘন কোরো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। »
>
> [মাইদা, ৫:৮৭]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্পণ

রুবাইয়া মাহমুদ
রোয়াইফা মাহমুদ
ওবায়দুল্লাহ মাহমুদ নাসিম
আবীদুল্লাহ মাহমুদ নাফিস

ওরাই আমার কাঁচামিঠে রোদ,
ইলশেগুঁড়ির বৃষ্টি
আমার দু-চোখ সবুজ করেছে
ওদের অবুঝ দৃষ্টি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচি

১১ | প্রবেশক

২১ | বনের পাখিরে কে চিনে রাখে

৬৭ | ফজরে আমি উঠতে পারি না

৮১ | আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে

১২১ | রৌদ্রমুখর

১৭১ | আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

২২১ | গ্রন্থপঞ্জি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রবেশক

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد

প্রচ্ছদ দেখেই আপনার মনে প্রশ্ন জাগলো:

পাঠক আমি, হচ্ছে না বোধ—

কীসের বৃষ্টি? কেমন এ রোদ?

চলুন, এ নিয়েই আপনার সাথে কিছুক্ষণ গল্প হয়ে যাক। বইয়ের হেরেমে ঢোকার আগে তোরণে দাঁড়িয়েছেন আপনি। হেরেম বড় হবার কারণে তোরণটাও একটু বিস্তৃত। অসুবিধে নেই, গল্প করতে করতেই আমরা দ্বারদেশ পার হয়ে যাবো।

শ্রাবণের রাতে হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি নামতে দেখে আপনি আনমনা হয়ে যান। আমিও কিন্তু উদাসী হয়ে পড়ি। খোলা বাতায়নের ফাঁক গলে চৈতালি রোদ যখন আপনার পা ছুঁয়ে যায়, তখন শার্সি গুটিয়ে আপনি বাইরে তাকান। আমিও তাকাই। মুষলধারে বৃষ্টি এলে আমাদের চৈতন্য ঔদাসীন্যের উষ্ণতায় ঘুমাতে চায়, ঝাঁঝালো রোদের তীব্রতায় সেই উমজড়ানো ঘুম রূপকথা হয়ে যায়। এই বইয়ে আপনার চিরচেনা সেই বৃষ্টিকণাই ঝরবে, সেই পরিচিত রোদ্দুরই লুকোচুরি খেলবে আপনার সাথে।

একটু পার্থক্য অবশ্য আছে। এই বৃষ্টি আপনাকে শুধু আনমনা করে দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, আপনার খুব কাছে এসে গল্পের আসর জমাবে। এই রোদ আপনার বোধকে নাড়া দিতে চাইবে। শুধু বৃষ্টি আর রোদ নয়, আপনার চারপাশে পরিদৃষ্ট নিসর্গকে তৃতীয় নয়নে তাকানোর প্রবর্তনা জোগাবে। ফুটন্ত ফুল আর উড়ন্ত প্রজাপতির গল্প শোনাতে শোনাতে অপার্থিব কোনো বাগিচায় আপনাকে ঘুরিয়ে আনবে। চেনা-অচেনা পাখিদের ডানায় আপনাকে সওয়ার করিয়ে ফিরদাউসের পাখি হবার স্বপ্ন দেখাতে চাইবে। এক্ষুনি বলবে, 'চলো মৌমাছি হয়ে যাই!' পরক্ষণেই বলবে, 'চলো ডাহুক হই!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুস্থ-স্বাভাবিক দুই দুটো চোখ থাকার পরও বইটা কেন আপনাকে 'তৃতীয় চোখ' উন্মেষের জন্যে প্রেরণা ও প্রেষণা জোগাতে চায়? উত্তর পাওয়ার জন্যে আমাদেরকে যেতে হবে উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা ﵂-এর কাছে। তাঁর কাছ থেকে একটা গল্প জেনে নিতে পারি আমরা।

নবিজি ﷺ একদিন বললেন: "গত রাতে আমার ওপর একটা আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াতটা যে পড়বে, কিন্তু এ নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করবে না, তার জন্যে ধ্বংস!"[১]

কোন সে আয়াত? আমাদের যেমন কৌতূহল জন্মেছে, 'আয়িশা ﵂-ও কৌতূহলী হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে দিয়ে দেরি না করেই আয়াতটি পাঠ করতে শুরু করলেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

"আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে অবশ্যই বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।"[২]

আমাদের কাছে এই আয়াতের দাবি কী? আকাশকে নীল চাদোয়া কল্পনা করে কবিতা লেখা, কিংবা সবুজের সমারোহে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাওয়া—এটুকুই কি আমাদের কাজ? না, আমাদের কাজ আরেকটু বেশি। এই নীল আর সবুজ মিলে যে রংতুলি তৈরি হয়েছে, সেই রংতুলিতে ভাবনার ক্যানভাস রঙিন করা চাই। ক্যানভাসে আঁকা চিত্রটা হওয়া চাই আল্লাহর কাছে পছন্দসই! যে চিত্র হৃদয়ে পবিত্র আবেশের জন্ম দেবে, যে চিত্রের প্রতিভাসে বিশুদ্ধতাই প্রতিভাত হবে। আমাদের ভাবনার ক্যানভাস যদি দিনশেষে আকাশ ও জমিনের স্রষ্টার কথা স্মরণ করাতে না পারে, তাহলে অন্যদের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য থাকলো না।

চিন্তা-ভাবনা কে না করে? প্রকৃতির নানা উপাদান-উপকরণকে সামনে রেখে যে যার মতো করে ভাবেন, কল্পনার জাল বোনেন। মেঘের কথাই ধরুন। কালিদাস এই মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকে প্রেয়সীর দূত হিসেবে কল্পনা করেছেন, রচনা করেছেন একটা মহাকাব্য: মেঘদূত। লংফেলো'র কবিতায় লক্ষ করবেন, অবগুণ্ঠিত মেঘের মধ্যে তিনি একজন যাজক খুঁজে বেড়ান।[৩] 'হ্যামলেট' নাটকে দেখা যায়, এলোমেলো কিছু মেঘখণ্ডের মিলিত অবয়ব লক্ষ করে শেক্সপিয়রের মনে হয়েছে, এটা বুঝি একটা উট![৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মেঘের দিকে তাকিয়েছেন, ভেবেছেন, চিন্তা করেছেন। তবে তাঁর ভাবনা-চিন্তার মূলসুর ছিলো আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। তিনি মেঘ দেখে স্মরণ করতেন সেই সব জাতির কথা, যাদের জন্যে আল্লাহ মেঘ-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বৃষ্টিকেই আযাব হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। মেঘের রুদ্রমূর্তি দেখে তিনি উম্মাতের পরিণতির কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়তেন, হাদীসে সে কথা খুব স্পষ্টভাবেই এসেছে।[৪]

এই হচ্ছে একজন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর চিন্তা-অনুধ্যানের মৌলিক ব্যবধান। আমাদের যেকোনো কাজ ও সৃজনে অর্থবহতা থাকে, একটি সুনির্দিষ্ট আবেদন থাকে। আল্লাহর কাছে নিবেদনের মাধ্যমেই এই আবেদনের সমাপ্তি ঘটে। আমাদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। আমাদের সব অনুপ্রাণনাতেই বিশ্বাসের সুর অনুরণিত হয়। একজন অবিশ্বাসী চিন্তক ও বিশ্বাসী চিন্তকের মাঝে এখানেই এসে পার্থক্য সূচিত হয়। যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তার পরের আয়াতেই সার্থক চিন্তক ও বোদ্ধাদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا

"যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আর বলে: আমাদের রব্ব! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।"[৬]

কী বোঝা গেল? বিপুল সৃষ্টিরাজির যেখানেই তার চিন্তাদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, সেখানেই তৈরি হয় আল্লাহকে স্মরণের উপলক্ষ্য। দাঁড়িয়ে হোক কিংবা বসে হোক, সব অবস্থায় ও সবসময় আল্লাহর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অনুভব করাটাই তার কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সৃষ্টি কতটা অর্থবহ, সৃষ্টিনৈপুণ্য কতটা নিখুঁত সেসবকিছু ভাবতে ভাবতে ভাবলেশহীন হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বিশ্বাসকে চাঙা করার উপাদান ও উপকরণ খুঁজে বেড়াতে উদ্দীপ্ত হন তিনি। এই উদ্দীপনা থেকেই সূচনা হয়েছিলো বইটি লেখার কাজ।

প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে গল্প করা হয়েছে এখানে। গল্পের মোড় খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে, একটু পরপর বাঁক সৃষ্টি হয়েছে। যে প্রসঙ্গেই গল্প শুরু হয়েছে, সেটা শুধু গল্প হয়ে থাকেনি। কখনো আল্লাহর বাণী সামনে চলে এসেছে, কখনো প্রিয়তম নবিজির সীরাত বা সাহাবিদের জীবন প্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, কখনো বিভিন্ন ভাষার কবিদের নানা উক্তিও উদ্ধৃত হয়েছে। সবকিছু কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটা চেতনায় এসে, আর তা হলো, সৃষ্টিনৈপুণ্যের আবাহনে আল্লাহর মহিমা অনুধাবনের আহ্বান, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সম্মোহনে নিসর্গস্রষ্টার প্রতি সমর্পিত হবার প্রণোদনা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রামে যারা বড়ো হয়েছেন, তাঁদের কাছে মোরগের ডাক খুব পরিচিত। সুবহে সাদিকের সময় তার ডাক অন্যরকম ধ্বনিব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেকসময় মোরগের ডাকেই ফজর সালাতের জন্যে উঠতেন। মোরগ ডাকলে তার প্রতি উষ্মা প্রদর্শন না করার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যেহেতু সে ফজর সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭] অন্যদিকে, আব্বাসী আমলের কবি আবূ নুওয়াস তাঁর এক কবিতায় বলেছেন, মোরগের ডাক শুনলেই তাঁর মদ্যপানের কথা মনে পড়ে![৮]

ভাবনার পৃথিবীতে এরকম দুটো মেরু কেন সৃষ্টি হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সালাত ছিলো চক্ষুশীতলকারী, তাঁর অন্তর আলোকিত হতো সালাতের অনুপ্রাণনায়। অন্যদিকে আবূ নুওয়াস নিজেই বলেছেন: শরাবই তার আলো![৯] যার ধ্যান-জ্ঞানে সালাতের ভালোবাসা, সে মোরগের ডাকে সালাতের আহ্বানই শুনতে পাবে। যার শিরা-উপশিরায় মদ-শরাব ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই, মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে তার তো মদপানের কথাই মনে আসবে। এটাই স্বাভাবিক। আপনাকে এই ব্যবধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে, এই ব্যবধানের মাঝে আপনার অনুধ্যানকে চিনিয়ে দিতে চেষ্টা করবে এই বই।

বই পড়তে পড়তে কিছু প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে আপনার মনে। সব গল্পেই দেখা যাবে, 'উত্তম পুরুষ সর্বনাম' ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে কি লেখক স্মৃতিকথা লিখতে বসেছেন? নাকি এটা নিছক আত্মজৈবনিক গদ্য?

না, এর কোনোটাই নয়। এই বই পুরোপুরি ফিকশনাল। আসলে পুরোপুরি ফিকশনাল বললেও পরিচয়টা স্পষ্ট হয় না। 'ফিকশনাল ধাঁচে নন-ফিকশন' বললে হয়তো কিছুটা মিলতে পারে। লেখকের পূর্বতনগ্রন্থ 'শেষরাত্রির গল্পগুলো'র পাঠকদের কাছে এই ধারাটি পরিচিত। আমরা এ ধরনের লেখার নাম দিয়েছিলাম 'প্রবন্ধগল্প'। এটিও প্রবন্ধগল্পের বই। তবে পূর্বোক্ত বইটির উপজীব্য ছিলো ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, আর এবার পুরোপুরি কল্পনানির্ভর। 'উত্তম পুরুষ সর্বনাম' ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো, লেখাগুলো পাঠ করার সময় পাঠক যেন কল্পিত চরিত্রের মাঝে নিজেকে কল্পনা করেন, নিজের সাথে নিজেই কথা বলতে পারেন। কাজেই, যত জায়গায় 'আমি', 'আমার' কিংবা 'আমাকে' ইত্যাদি সর্বনাম এসেছে, সবই গল্প নির্মাণকল্পে আনীত কল্পনা। হ্যাঁ, কোথাও কোথাও হয়তো লেখকের শৈশবস্মৃতি অবচেতনে চলে এসেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু টুকরোও সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে কোথাও কোথাও। গল্পের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত না করার জন্যে সেগুলো যথাস্থানে বর্তমান আছে। তবে পুরো বইজুড়ে তার পরিমাণ এক-দশমাংশের বেশি নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো কোনো গল্পে নতুন একটা চরিত্র চলে এসেছে 'তুমি' অভিধা নিয়ে। লেখকের চে' বয়সে বড়ো কেউ যখন 'তুমি' সম্বোধনের মুখোমুখি হবেন, তখন বিব্রত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। না, বিব্রত হবার কিছু নেই। এই 'তুমি'টাও গল্পের গতিময়তা ধরে রাখার জন্যে আনা হয়েছে। পাঠক মূল চরিত্রের জায়গায় যেমন নিজেকে বসিয়ে পাঠ করে যাবেন, তেমনি অন্যান্য চরিত্র ও সম্বোধনেও নিজেকেই কল্পনা করার অনুরোধ থাকলো।

কুরআন ও হাদীসের কোনো প্রসঙ্গ যখন এসেছে, তখন সেটাকে গল্পের পূর্বাপর প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার আশ্রয় নিইনি। প্রামাণ্যগ্রন্থ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত সালাফ (ন্যায়পর পূর্বসূরি)দের বিশ্লেষণ ও নির্বচনকেই আমরা নির্বাচন করেছি, একইসাথে সেগুলোর যথাযথ তথ্যসূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, এ সমস্ত বিবরণ ও আমাদের পরিচিত দৃশ্যপটের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে, সেই সেতু ঢালাইয়ের জন্যে কল্পনার মালমসলা ব্যবহার করা হয়েছে সতর্কতার সাথে।

নানা ভাষার তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের প্রতি লেখকের ঝোঁকপ্রবণতার ছাপ এখানেও পড়েছে। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের কবিতাংশ ও উদ্ধৃতি গল্পের প্রবাহে চলে এসেছে। এখানে সেইসব কবিও উদ্ধৃত হয়েছেন, যাদের আচরিত আদর্শ বা সামগ্রিক দর্শনের সাথে লেখক কিংবা পাঠকদের একমত হবার সুযোগ নেই। এরপরও কেন তাদেরকে উদ্ধৃত করা হয়েছে?

আমরা তাঁদের সেই উক্তি ও উদ্ধৃতিগুলোই এনেছি, যা আমাদের বিশ্বাস ও চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এটা রাসূলুল্লাহর নীতি। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের বর্ণনা প্রাসঙ্গিক।[১০] রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ভ্রমণে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সাহাবি আশ-শারীদ ﷺ। রাসূলুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا "তোমার কাছে কি উমাইয়া ইবন আবিসসালত-এর কোনো কবিতা (মুখস্থ) আছে?" শারীদ বললেন: জি, আছে। রাসূলুল্লাহ বললেন: "আবৃত্তি করো।" শারীদ একটা পঙ্‌ক্তি শোনালেন। রাসূলুল্লাহ বললেন: هيه "চালিয়ে যাও।" শারীদ আরও একটা শোনালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও বললেন: هيه "চালিয়ে যাও।" এভাবে শারীদ একে একে একশটা পঙ্‌ক্তি সেদিন রাসূলুল্লাহকে শুনিয়েছিলেন।

এই উমাইয়া ইবন আবিসসালত ইসলামের দাওয়াত পেয়েও কাফির অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন।[১১] এরপরও রাসূলুল্লাহ তাঁর কবিতা শুনতে পছন্দ করতেন। কারণ, তাঁর কবিতায় তাওহীদ ও আখিরাতের কথা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।[১২] জাহিলি যুগের বিখ্যাত মু'আল্লাকাত কাব্যস্রষ্টাদের একজন তারাফা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইবন 'আবদ। প্রচণ্ড উড়নচণ্ডী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত পঙ্‌ক্তি দিয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময় অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন।[১৩] এখানেও কারণটা স্পষ্ট। সেই পঙ্‌ক্তিগুলোই রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্ধৃত করতেন, যেগুলো ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। প্রসঙ্গক্রমে যখন কোনো অবিশ্বাসী কবির কবিতা লেখকের মানসপটে চলে এসেছে, তখন সেটা সংস্থিত করার আগে আমরা এই মূলনীতির দিকে খেয়াল রেখেছি।

আমাদের উদ্ধৃত সব কবিতা ও উদ্ধৃতাংশ বিশ্বাসী দর্পণেই বিম্বিত হয়েছে বারবার। প্রশ্ন আসতে পারে, বিশ্বাসকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো তাঁরা লিখেননি, আপনি কেন সেগুলোকে বিশ্বাস সংহত করার উপকরণ হিসেবে নিচ্ছেন?

এই কাজে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ। জাহিলি যুগের আরেক বিখ্যাত কবি ছিলেন যুহাইর বিন আবু সুলমা। আরবের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিত্ব হারম ইবন সিনানের প্রশংসায় যুহাইর দারুণ একটা চরণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'উমার ﷺ কী করতেন, এই পঙ্‌ক্তিটাকেই রাসূলুল্লাহর প্রশংসায় তিনি উদ্ধৃত করতেন! চরণটা শুনুন:

لو كنت من شيء سوى بشر * كنت المنور ليلة البدر

"আপনি যদি মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে আপনি পূর্ণিমার চাঁদই হতেন!"

যুহাইর এটা রচনা করেছিলেন হারমের প্রতি মুগ্ধ হয়ে। তাতে কী? 'উমার ﷺ তাঁর মুগ্ধতা ও অনুপ্রেরণার মানুষ প্রিয় নবিজি ﷺ-কে যখন দেখতেন, তখন তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করতেন এই পঙ্‌ক্তি উচ্চারণের মাধ্যমেই।[১৪] অর্থাৎ, কবিতার আক্ষরিক আবেদনটাই তিনি গ্রহণ করছেন এবং তার ইতিবাচকায়ন করছেন। 'বৃষ্টিমুখর রৌদ্রমুখর'-এ এরকম ইতিবাচকায়নের দৃষ্টান্তও নজরে পড়তে পারে। মোদ্দা কথা, আমাদের ভাবনায় যা কিছুই এসেছে, সেটাকেই বিশ্বাসী চেতনার চাদরে আবৃত করা হয়েছে।

কিছু গল্পে দেখা যাবে, প্রসঙ্গ তোলার পর বিষয়টা স্পষ্ট না করে গল্পটা কুরআন থেকেই পড়ে নেয়ার জন্যে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাঠকদের কাছে আমরা একটি বার্তা পৌঁছাতে চেয়েছি, আর তা হলো, জান্নাত অভিমুখী এ পথচলার পাথেয় হিসেবে তাঁরা যেন এরকম বই বা সাহিত্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে না পড়েন, হিদায়াতের মূল উৎস হিসেবে তাঁরা যেন কুরআনকেই অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। এই বার্তা পৌঁছানোর জন্যেই আমরা গল্পের মাঝখানে হঠাৎ করে কুরআন অধ্যয়নের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছি। রাসূলুল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ﷺ-কে 'রোল মডেল' হিসেবে গ্রহণ করার বোধনটুকু উদ্বোধন করিয়ে দেয়ার প্রয়াসও ছিলো। জীবনের প্রতিটি পর্বে তাঁর সুন্নাহকে প্রাসঙ্গিক করে নেয়ার মধ্যেই অস্তিত্বের ছান্দসিকতা নিহিত, গল্প পড়তে পড়তে সে-কথা যেন পাঠকের মনে রেখাঙ্কন করে, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

কিছু বিষয় একাধিক গল্পে পুনরাবৃত্তি হয়েছে, এমনটা মনে হতে পারে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে হতাশ না হয়ে পড়া এবং আল্লাহর স্মরণে স্থিত হয়ে আল্লাহর শরণে আস্থাশীল হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে কয়েক জায়গায়। নফল 'ইবাদাতের প্রতি যত্নবান হবার প্রেষণাও হয়তো কয়েকভাবে গোচর হবে। পারিবারিক পরিমণ্ডলে দীনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক চর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যেও আমরা একাধিকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। প্রধানত তরুণদের দিকে লক্ষ রেখে লেখা হয়েছে বিধায় তাদের অনুবন্ধী বিষয়াদি ইচ্ছাকৃতভাবেই বিভিন্ন আঙ্গিকে আনা হয়েছে।

এই বইয়ের প্রাণপ্রবাহ আমার দাদাজান। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমি মরে যাওয়ার পর তুই-ই ওদের দাদা'। সেদিন আড়ালে চোখ মুছলেও ঐ গুরুভার আমার লঘু কাঁধে এখনো বর্তমান। দাদাজান নাতি-নাতনিদের গোল করে বসিয়ে কুরআনের গল্প শোনাতেন, নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তাঁর অবর্তমানে কাজটা এখন করতে হয় আমাকে। একদিন লক্ষ করলাম, কয়েকটা ফুল নিয়ে গল্প করতে করতে জীবনঘনিষ্ঠ আলাপে ঢুকে গিয়েছি, ওরাও সেটা উপভোগ করেছে। 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' লেখাটির প্লট ঐদিনই প্রস্তুত হয়েছিলো। ফুল নিয়ে গল্পের আসর যখন খুব জমলো, নাফিস আবদার করলো, পাখি নিয়ে গল্প করতে হবে। ব্যস, ওদেরকে গল্প শোনাতে শোনাতেই দাঁড়িয়ে গেলো আরেকটা প্রবন্ধগল্পের নকশা: 'বনের পাখিরে কে চিনে রাখে?' আল্লাহ দাদাজানকে ক্ষমা করুন, উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করুন, সালসাবীলের ঝরনাধারায় তাকে সিক্ত করুন, আমাদেরকে সেই জান্নাতে একত্র করুন। আল্লাহুম্মা আমীন ইয়া রব।

আব্বুর কথা সর্বতোস্মর্তব্য। তিনি আমার পিতা ও শিক্ষক, আমার দিশারী ও বন্ধু। শৈশবে আব্বুই আমাকে ভাবনার ভেলায় চড়িয়ে মেঘের ওপারে নিতেন। নিঝুম রাতে তারা দেখিয়ে গল্প শোনাতে শোনাতে তারার স্রষ্টাকে অনুভব করাতেন। মাদরাসায় হাদীসের দারস দিয়ে এসে সন্তানদেরকে সেই হাদীসগুলো আবার গল্পাকারে শোনাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'জীবনাদর্শ' হিসেবে গ্রহণ করার বাস্তব অনুপ্রেরণা তিনিই জোগাতেন আমাদেরকে। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনাগুলো জীবনের সাথে মিলিয়ে নেয়ার যে অল্পবিস্তর ঝোঁক নিজের ভেতর অনুভব করি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই বইয়ে গল্প বলতে বলতে আমাদের লেখাও যে ঝোঁকের দিকে ঝুঁকেছে, তার পেছনেও আছে শৈশব-কৈশোরে আব্বুর কাছে পাওয়া প্রণোদনা। আব্বু তাঁর সন্তানের ভেতর যখন টুকটাক লেখালেখির অভ্যাস আবিষ্কার করলেন, তখন থেকেই উপদেশ দিতেন, 'তোমার লেখনী যেন বিশ্বাসী তরুণদের প্রতি এই মর্মে বার্তাবহ হয় যে, আমাদের আচরিত দ্বীনই আমাদের দিনগুলোকে ফুল্ল-ফুলেল করতে পারে, আল্লাহর দেয়া জীবনশৈলী সর্বান্তকরণে ধারণ করলেই জীবনের শীলনে পরিতোষের মিলন ঘটে।' এই উপদেশ, দু'আ ও অনুপ্রেরণার ফসল হলো 'প্রবন্ধগল্প' ধারাটির অবতারণা। এই বই সেই ধারাটির মুকুটে যুক্ত হওয়া দ্বিতীয় পালক। আল্লাহ আব্বুকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, তাঁর ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন।

পাঠকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে, গল্পগুলো পড়ার সাথে সাথে যেন নিজের সাথে কথা বলেন, একইসাথে শুদ্ধতম অনুভূতিটি সহোদর-সহোদরা কিংবা কাছের বন্ধুটির মাঝেও সঞ্চার করতে যেন উদ্যোগী হন।

এই বইয়ের কোনো লেখার মধ্যে উপস্থাপনায় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে, কোনো মত ও সূত্র উল্লেখে ত্রুটি গোচরীভূত হলে, অথবা কোনো বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় অসামঞ্জস্য অনুভূত হলে লেখককে জানানোর জন্যে বিনীত অনুরোধ করছি। আল্লাহ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, আমাদের প্রচেষ্টা তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কবুল করুন।

কোনো গল্পের কল্পডানায় চড়ে আপনার হৃদয় যদি ক্ষণিকের জন্যেও নীল-সবুজের মোহনায় এসে ভিড়তে চায়, তাহলে লেখকের নামটি আপনার দু'আয় স্মরণ রাখবেন।

الفقير إلى عفو ربه
আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
১৭/০১/২০১৮
পদ্মা-৭০০৮, বিজয় একাত্তর হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
amnazib.1997@gmail.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

টীকা

১. সাহীহ ইবন হিব্বান: ৬২০
২. সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৯০
৩. «And the hooded clouds, like friars, ...»
[Voices of the Night, p. (Midnight Mass for the Dying Year, Stanza 4.)]
৪. «Do you see yonder cloud, that›s almost in shape of a camel?...»
[Hamlet, Act III, scene 2, P. 87]
৫. সহীহ মুসলিম: ২১২২
৬. সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৯১
৭. সুনান আবূ দাউদ: ৫১০৩
৮. আবূ নুওয়াসের ভাষায়: ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا * وأمله ديك الصباح صياحا [আস-সাবূহ, খামরিয়াত]
৯. আস-সাবূহ কবিতার চতুর্থ পঙ্‌ক্তি
১০. সহীহ মুসলিম: ৬০২২
১১. আত-তানওয়ীর শারহ জামি' সাগীর, খ. ১ পৃ. ২১১
১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ উমাইয়া ও তার কবিতার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন: آمن شعره وكفر قلبه "তার কবিতা ঈমানগ্রহণ করেছে, কিন্তু তার হৃদয় কুফরি করেছে।" [ফাতহুল বারী, খ. ৭ পৃ. ১৫৪] অর্থাৎ, উমাইয়া ব্যক্তি হিসেবে কাফির, তবে তার কবিতায় ঈমানী মূল্যবোধসম্পন্ন বক্তব্য আছে।
১৩. মুসনাদ আহমাদ: ২৪০৬৯
১৪. শারহ আয-যারক্বানী 'আলাল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়াহ বিল মিনাহ আল-মুহাম্মাদিয়াহ, খ. ৫ পৃ. ২৫৮
১৫. মুসনাদ আহমাদ: ৩৮৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বনের পাখিরে কে চিনে রাখে

দিঘির পাড়ে দিঘল চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাল-তমালের সারি। বাসা বানানোর জন্যে তালগাছের শাখা বাবুই পাখিদের খুব প্রিয়। খুব যত্ন করে বুনন করা এই ঝুলন্ত বাসাগুলো দৃষ্টিনন্দন। গ্রামীণ উপকথায় আমরা শুনে এসেছি, সন্ধ্যার সময় বাসা আলোকিত করার জন্যে ঝোপঝাড় থেকে ঠোঁটে করে জোনাক পোকা নিয়ে আসে বাবুই পাখিরা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর কখনো বাবুই পাখির বাসা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি আমার। তবে দূর থেকে তাকালে বাসার আশেপাশে অনেকগুলো জোনাকপোকা দৃষ্টিগোচর হয়। উলটো কলসের মতো ঝুলে থাকা এই নান্দনিক বাসাগুলো তৈরি করতে যে পরিশ্রম ও কৌশল পাখিগুলো প্রয়োগ করে, সেদিকে লক্ষ করে এদেরকে 'শিল্পী পাখি' বলা হয়।

দিঘির উত্তর দিকে হোগলা পাতায় ছাওয়া একটা ছোট বন। এটাকে জোনাক পোকার স্বর্গরাজ্য বললে ভুল হবে না। রাত নেমে এলে একটানা ঝিঁঝি পোকার আওয়াজের সাথে জোনাক পোকার বাতিবাজি চলতেই থাকে। 'বাতিবাজি' শব্দটা আমার দাদার মুখে শুনতাম। ওদিকটাতে চালতা পাতারও দেখা মেলে অনেকসময়। এই পাতার শরীরে অঙ্কিত শৈল্পিক কারুকাজ আমাদের নজর কাড়ে।

শিল্পীপাখি বাবুই, শিল্পিত পাতা চালতা—এদের প্রতি আমার মুগ্ধতা আছে, সম্মোহন নেই। এই শিল্পসচেতন পাখি, এই শিল্পখচিত পাতা যিনি সৃজন করেছেন, শিল্পের মূল তো তিনিই। হতে পারে এজন্যেই বিশ্বাসী মানুষেরা বল্গাহীন শিল্পচর্চায় আস্থা রাখেন না, বরং স্রষ্টার প্রতি সমর্পিত জীবনশৈলীকেই সবচে' বড়ো শিল্প বলে মনে করেন।

হোগলার বন পেরোলেই সারি সারি সুপারি গাছ। আছে বেশ কিছু জামগাছও। এইদিকের গাছগুলো শাখা-প্রশাখা ও পাতায় বেশ ঘন হয়ে আছে। অনেকগুলো পাখি এখানে নির্বিঘ্নে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। দুষ্টু ছেলেরা গাছে উঠে অনেকসময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ডিম নিয়ে আসে। কখনো কখনো বাসাও ভেঙে দেয়। এলাকার ইমাম সাহেব ব্যাপারটা জানার পর ছেলেগুলোকে তাঁর কাছে ডেকেছেন। ওদের একটা গল্প শোনালেন তিনি।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বেরোলেন। পথিমধ্যে ঘন বৃক্ষ পরিবেষ্টিত একটি জায়গায় তিনি এলেন। রাসূলুল্লাহর সফরসঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি 'হুম্মারাহ' পাখির বাসা থেকে ডিম নিয়ে এলো। পাখিটা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের মাথার উপর এসে চক্কর দিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমাদের মধ্যে কে ডিম নিয়ে এসে এই পাখিকে শোকাকুল করেছো? একজন বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তার ডিম নিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: পাখিটার প্রতি দয়া দেখিয়ে ডিমটা এক্ষুনি রেখে এসো।

ছেলেগুলো এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থাকলো। তাদের চেহারায় অনুশোচনার ছাপ দেখতে পেয়ে ইমাম সাহেবো ভীষণ খুশি হলেন। এই ফাঁকে তাদেরকে শোনালেন আরেকটা চমৎকার হাদীস। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

"পৃথিবীতে যারা আছে, তাদের প্রতি দয়া করো। আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের দয়া করবেন।"[১৬]

মানে কী দাঁড়ালো? আমরা যদি আল্লাহর দয়া পেতে চাই, তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহর যত সৃষ্টি আছে, সবার প্রতি দয়াপরবশ হতে হবে!

ছেলেগুলো তাদের ভুল বুঝতে পারলো। প্রতিজ্ঞা করলো, আর কখনো পাখির বাসা ভাঙবে না, পাখির ডিম পেড়ে আনবে না। আচ্ছা, খড়ের মাথায় ঝিকা গাছের আঠা লাগিয়ে ওরা যে ফড়িং ধরে, লেজের মাথা ছিঁড়ে দেয়, ফড়িংগুলোরও কি কষ্ট হয় না? নিশ্চয়ই হয়। তাহলে তো এই কাজটাও বাদ দিতে হয়! বনরুটির ভেতরে ছোট ছোট একাধিক সুচ ঢুকিয়ে দিয়ে কুকুরকে খেতে দেওয়ার পর প্রাণীটা যখন ছটফট করতে থাকে, তখন ওরও ভীষণ কষ্ট হয়। ছেলেগুলো সিদ্ধান্ত নিলো, এই গর্হিত কাজ থেকেও ওরা দূরে থাকবে।

দেখলে, কোনো বকা দিতে হলো না, ধমক বা ভর্ৎসনারও প্রয়োজন হলো না, একটু গল্প বলাতেই ওদের মধ্যে ভাবান্তর ঘটে গেলো! সুন্দর কথার এমনই মূল্য!

শুনলে হয়তো অবাক হবে, হাদীসে আমরা দেখি, শুধু একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন একজন ব্যভিচারিণী নারীকে। আবার অন্য হাদীসে এসেছে, একটা ক্ষুধার্ত বিড়ালকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আটকে রেখে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার কারণে একজন নারীকে জাহান্নামে যেতে হয়েছে।[১৭]

বোঝাই যায়, আল্লাহর দীনের এই সর্বব্যাপী কল্যাণমুখিতা ও হিতৈষণা শুধু মানুষই নয়, জীব-নির্জীব নির্বিশেষে তাবৎ পৃথিবীর জন্যেই আশীর্বাদস্বরূপ। আমরা আল্লাহর যতো কাছাকাছি আসার চেষ্টা করবো, কল্যাণ ও নিরাপত্তা ততই আমাদের কাছাকাছি আসবে।

সুপারি গাছের বেশ কিছু শাখা ঝরে পড়েছে। আমি কয়েকটা কুড়িয়ে কাঁধে তুলে নিলাম। একটু শুকিয়ে গেলে এই শাখাগুলোর খোলে বাচ্চাদের চড়িয়ে আনন্দ দেওয়া যায়। বালুকাময় উঠোনে খোলের উপর একজনকে বসিয়ে দেওয়া হবে, তারপর পাতাসমেত শাখার উপরিভাগ একজন টেনে নিয়ে যাবে। এই দৃশ্যটা আমাদের শৈশবে খুব দেখা যেতো গ্রামে। এখন অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। শহর থেকে ফুপাতো ভাইয়ের পিচ্চি-পাচ্চারা বেড়াতে এসেছে, ওদের গ্রামীণ বিনোদনের নিত্য-নতুন উপকরণের সাথে পরিচিত করার দায়িত্ব আমার কাঁধে। কাজেই আগপাছ না ভেবে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম।

দিঘির এক কোণে কয়েকটা কলাগাছ অযত্নে পড়ে আছে। কলার কাঁদির ফাঁকে বাসা বেঁধেছে চড়ুই পাখি। এই পাখিটার এই এক গুণ, যেখানে-সেখানে বাসা বেঁধে ফেলে। কবুতরের খোপে অথবা মুলিবাঁশের ঝোপে, নারকেলের শাখে কিংবা ভেন্টিলেটরের ফাঁকে—যেখানেই সুযোগ পায়, এরা অনায়াসে ঘর-সংসার সাজিয়ে ফেলে। যেকোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে চড়ুই পাখির সহজাত অভিযোজন-ক্ষমতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন তাঁর প্রিয় সাহাবি 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ﷺ-এর দুই কাঁধে হাত দিয়ে একটা উপদেশ দিয়েছিলেন: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل "দুনিয়াতে এমনভাবে থেকো, যেন তুমি এক আগন্তুক, অথবা নিছক একজন মুসাফির।"[১৮] এই আগন্তুকের জীবনে অচেনা প্রতিকূলতায় অভিযোজিত হওয়ার বিকল্প রাস্তা নেই। এই মুসাফিরি জিন্দেগী অল্পকিছু উপকরণ জাম্বিলে নিয়েই সুদূরের মঞ্জিলে উপনীত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। মাঝপথে যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই বিশ্রাম নেয়। চড়ুই পাখির বৈচিত্র্যপূর্ণ আবাসনবৃত্তি আমাকে যেন এই হাদীসের প্রতি আরেকবার অভিনিবেশ করতে বলে যায়।

দিঘির সাথে লাগোয়া উঁচু ভূমিটার প্রান্ত যেখানে এসে ফসলি জমির সাথে মিশেছে, সেদিকে কিছুদূর পরপর কয়েকটা নারকেল গাছ নজরে আসে। কাঠবিড়ালির উৎপাত থেকে রক্ষার জন্যে নারকেলগুলোকে বস্তা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। একটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘুঘুকে দেখা গেলো পুরোনো নারকেলের শলা দুই ঠোঁটে নিয়ে উড়াল দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। হয়তো অদূরে কোথাও নতুন করে বাসা বাঁধবে। আমি সেদিকে আর আগালাম না। কারও উপস্থিতি টের পেতে শুরু করলেই এরা সেখানে আর থাকে না। এমনকি ওরা যদি বুঝতে পারে যে, তাদের বাসা কেউ দেখেছে, তাহলে দেরি না করে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। আমাদের শৈশবে দুরন্ত ছেলেদের ঘুঘুশিকার করতে দেখেছি। শালবনের ধারে ঝাঁকে ঝাঁকে তিলাঘুঘু, মানিকজোড় এবং হরিয়াল পাখির আনাগোনা ছিলো। এখন সেই বন প্রায় উজাড় হবার পথে, পাখির অস্তিত্ব তো অনেক আগেই নাই হতে শুরু করেছে। গাছের ছোট কাণ্ড এবং সুতোর সাহায্যে বিশেষভাবে বানানো হতো ঘুঘু শিকারের ফাঁদ। আরেকটা পদ্ধতিতে ঘুঘু ধরা হতো। শিকারকৃত ঘুঘুকে খাঁচায় আটকে রাখা হতো, তার ডাক শুনে অন্য ঘুঘু চলে আসতো, আর এই ফাঁকে সেটাকেও শিকার করা হতো। বাংলায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে: 'ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি'। ঘুঘু শিকারের এসব অভিনব কৌশলের দিকে লক্ষ করেই হয়তো প্রবাদটি চালু হয়েছে। এখনকার শিশু-কিশোররা এসব পাখি চেনে না। বর্ণমালা শিক্ষার বইতে যে কয়টা পাখির ছবি আছে, ওরা সেগুলোকেই পাখি বলে জানে। কিছুটা বড়ো হবার পর যদি ধৈর্যে কুলিয়ে উঠে জীবনানন্দের কবিতা পড়তে বসে, তাহলে কদাচিৎ সেখানে ঘুঘু পাখির দেখা পায়।[১৯] এর বাইরে প্রকৃতিতে এসে এই আলংকারিক ও মায়াবী পাখিকে দেখা তাদের জন্যে কল্পনাতীত। বাস্তবে কখনো ঘুঘু দেখে ফেললে হয়তো ভ্রু কুঁচকে বলে উঠবে, হায় হায়! কবুতরের গায়ে এত আঁকাআঁকি কে করলো গো! তাই আমি পূর্বোক্ত প্রবাদটিকে তাদের জন্যে খানিকটা পরিবর্তন করার প্রস্তাব রাখি: 'ঘুঘুও দেখোনি, ফাঁদও দেখোনি।'

বাকল-উঠে-যাওয়া একটা ডুমুর গাছে কাঠঠোকরা দেখলাম। বাকলের ভাঁজে থাকা শুঁয়াপোকা খুঁজে খুঁজে উদরপূর্তি করছে সে। একটু পরপর ধারালো ঠোঁটের অগ্রভাগ দিয়ে মুহুর্মুহু ঠোকর দিয়ে যাচ্ছে। খুব কাছ থেকে দেখা সম্ভব হলে চোখে পড়ে, কাঠঠোকরার নাকের উপর কিছু অতিরিক্ত পালক আছে, যা অন্য পাখির ক্ষেত্রে দেখিনি। গাছে ঠোকর দেয়ার সময় তার অবস্থান যেরকম থাকে, তাতে করে খুব সহজেই অল্পকিছুক্ষণের মধ্যে ছাল-বাকলের গুঁড়ো এসে তার নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত পালকের কারণে নাকে আর ঢুকতে পারে না। চোখের ক্ষেত্রেও তাই। ঠোকরানোর সময় একটা আলাদা আবরণ এসে তার চোখকে ঢেকে রাখে। এই অতিরিক্ত পালক ও আবরণ সৃষ্টির রহস্য জানার পর আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টিকুশলতার এক ঝলক আমাদের সামনে চলে আসে, সিজদাবনত অন্তর আরও বেশি সমর্পিত হয়ে যায় আমাদের অজান্তেই। তাই বুঝি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাঠঠোকরার চোখে যখন একটা আবরণ আসে, তখন আমার চোখে একটা আয়াত ভাসে:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

"আমাদের রব্ব! এ তো আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি!"[২০]

একটা বাতাসি পাখি একা একা উড়ে যাচ্ছে। ছাই বর্ণের ছোট পাখিটা দেখলেই মায়া জন্মায়। ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার মতো উড়ছে সে। আচ্ছা, এই যে পাখিগুলো আকাশে অনায়াসে উড়ে যায়, শূন্যের উপর কে তাদের ভাসিয়ে রাখে? এদের এই বিচিত্র আচার, স্বভাব-প্রকৃতির ভিন্নতা কীভাবে হলো? একেক পাখির একেকরকম জীবিকা আহরণের কৌশল, পরিবেশের সাথে অভিযোজনের উপযোগী নানা রকম স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, সবকিছু স্মরণ করিয়ে দেয়, একজন সূক্ষ্মদর্শী পরিকল্পনাকারীর হাত এতে রয়েছে। উত্তুরে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে বাতাসি পাখি যখন উঁচুনিচু নানা ভঙ্গিতে ডানা মেলে স্বচ্ছন্দে উড়ছে, তখন আমার মনে পড়ে বাতাসি পাখির স্রষ্টাকেই:

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"তারা কি শূন্য আকাশে উড়তে থাকা পাখিদের দেখে না? আল্লাহই তো তাদেরকে আকাশে ধরে রাখছেন। ঈমানদারদের জন্যে এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।[২১]

নারকেল ও সুপারিবৃক্ষসারির মাঝামাঝি কোনো এক জায়গা থেকে হঠাৎ *চিক চিক চিক ক্রে..ক* শব্দ শোনা গেলো। আরে, এ তো তিতিরের ডাক! এই পাখি এখনো বাংলাদেশে আছে, এটাই তো আশ্চর্যের। চালচলনে এরা মুরগির মতো, আর তাদের গায়ে যে আল্পনা, সেটা ঘুঘুর মতো। পাখিবিশারদদের কাছে ধৃত হবার আশঙ্কা না থাকলে আমি একে 'মুরগিঘুঘু' বলে নাম দিয়ে দিতাম।

তিতিরের প্রসঙ্গ যেহেতু এলো, একটা ভিনদেশি গল্প মনে পড়লো। আরবি সাহিত্যে আবুল 'আলা আল-মা'আররী নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁর কোনো এক বন্ধু একদিন আস্ত তিতির রান্না করে পাঠালেন। মা'আররী সেই পাখিটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: 'আফসোস! তুমি যদি শাহীন পাখি হতে, তাহলে এই পরিণতি বরণ করতে হতো না।' অর্থাৎ, শাহীন পাখি দুরন্ত আর শক্তিমান; থাকেও ঊর্ধ্বাকাশে, মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কেউ তাকে শিকারের চেষ্টা করে না। কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিতির যেহেতু অত উঁচুতে উড়তে পারে না, মানুষের শিকারের নাগালের মধ্যেই থাকে, তাই তাকে তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাদের খাদ্যে পরিণত হতে হয়। আল্লামা ইকবাল তাঁর এক কবিতায় এই গল্পটি ছন্দাকারে উল্লেখ করেছেন।[২২]

পৃথিবীর অলিখিত নিয়মই যেন এটা। আপন শৌর্য-বীর্য ও প্রতাপ-প্রভাব নিয়ে নিজের জগৎ গড়ে তুলতে না পারলে, দুর্বলতা ও দাক্ষিণ্যনির্ভরতায় অন্যের করায়ত্ত জগতে বিচরণ করলে যে-কাউকেই নির্মম পরিণতি বরণ করতে হয়। মা'আররীর এই গল্প উদ্ধৃত করে ইকবাল কি মুসলিম জাতিকে সেই বার্তাই পৌঁছাতে চেয়েছেন?

পেয়ারার গাছে নজরে পড়লো কূজনরত বেশ কিছু বুলবুলি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল-এর মৃত্যুর পর খুব দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখেছিলেন:

"বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে
ঝরা বনগোলাপের বিলাপ শোনে..."[২৩]

পুত্রবিয়োগের বেদনা সহ্য করা একজন পুত্রবৎসল পিতার জন্যে খুবই কঠিন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পুত্র কাসিম শৈশবে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভারাক্রান্ত মন দেখে কাফিরদের অনেকে তৃপ্তিভরে হাসছিলো। আস ইবন ওয়ায়িল নামের এক জঘন্যপ্রকৃতির ব্যক্তি নবিজির মনস্তাপকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে এবং মানসিকভাবে আরও কষ্ট দেওয়ার জন্যে তাঁকে أبتر নামে অভিহিত করলো। 'আবতার' মানে আঁটকুড়ে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিলেন এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে[২৪] :

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ[২৫]

"আপনার প্রতি বিদ্বিষ্টরাই আসলে আঁটকুড়ে।"

ইতিহাসের ধারাক্রম থেকে সেই লোকগুলোর নাম-নিশানা আজকে নাই হয়ে গেলো! অথচ রাসূলুল্লাহর বংশপরম্পরা এখনো চলমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিয়ে যাওয়া অধম লোকগুলো যেমন আবু জাহল, শায়বাহ, ইবন ওয়ায়িল—এদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার একটা মানুষও পৃথিবীতে নেই। অথচ রাসূলুল্লাহর রেখে যাওয়া জীবনাদর্শকে মনেপ্রাণে ধারণ ও কাজেকর্মে পালন করার জন্যে কত সহস্র মানুষের উদ্যমতার সাক্ষী এই পৃথিবী! আঁটকুড়ে কারা, তা তো সহজেই অনুমেয়।

আচ্ছা, নজরুল তাঁর এই বিষণ্নতার প্রকাশ বুলবুলিকে অবলম্বন করেই কেন করলেন? একটা কারণ এটা হতে পারে, তাঁর পুত্রের নামের সাথে মিল আছে। এটাও হতে পারে, বিষণ্ন মুখাবয়বের সাথে বুলবুলিকে সহজে মিলানো যায়। এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পাখিটা নীরব হয়ে বসে থাকলে আসলেই কেমন মনমরা দেখায়।

ঝুঁটিদার মাথা, ঝোলানো লেজ আর শীতল চাউনি নিয়ে ডালে বসে থাকা ছোট পাখিটাকে দেখে মনে হয় কোনো রাশভারী হেডমাস্টার চেয়ারে সটান বসে আছেন। আরবিতে এই পাখিটিকে نُغَر 'নুগার' বলা হয়। যেগুলো আরেকটু ছোট, তাদের বলা হয় نُغَيْر 'নুগাইর'।

এই পাখিটার কথা হাদীসেও এসেছে।

উঁহু! কথায় কথায় হাদীস!

এটা কিন্তু ভীষণ মজার হাদীস।

ওহ, তাহলে তো শুনতেই হয়।

আনাস ইবন মালিক (র)-এর এক ছোট ভাই ছিলো, সবাই তাকে আবূ উমাইর নামে ডাকতো। তার একটা ছোট বুলবুলি (নুগাইর) ছিলো, যেটা নিয়ে সে খেলা করতো। পাখিটা একদিন মারা গেলো। এরপর সে রাসূলুল্লাহর কাছে যখনই আসতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে বলতেন:

يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ (ইয়া আবা 'উমাইর! মা ফা'আলাননুগাইর?)[২৬]

অর্থ করলে দাঁড়াচ্ছে:

"এই যে আবূ 'উমাইর!
কী করলো তোমার নুগাইর?"

বাচ্চা শিশুটা তার প্রিয় পাখিটাকে হারিয়ে মন ভার করে থাকার সুযোগ পেতো না, নবিজি ﷺ-এর কাছে এলেই তিনি তাকে হাসিয়ে মন ভালো করে দিতেন।

আমাদের নবিজি এমনই ছিলেন। সর্বাবস্থায় হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন, অন্যের মুখেও সর্বক্ষণ হাসি ফুটিয়ে যেতেন। সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস বলছেন: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم

"আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে কাউকে আমি দেখিনি।"[২৭]

সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম নমুনা ছিলেন আমাদের নবিজি ﷺ। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে হাস্যরসের যথেষ্ট উদাহরণ আছে, তবে সেগুলো ছিলো পরিশীলিত ও পরিমিত। তাঁর সীরাত থেকে এরকম আরও দুয়েকটা মজার কাহিনি শুনে ফেলি তাহলে। এরপর আমরা বুলবুলি নিয়ে আরও কিছুক্ষণ গল্প করবো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এক ব্যক্তি এসে নবিজির কাছে একটা বাহন আবদার করলো। হৃষ্টপুষ্ট ও প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ঘোড়া, গাধা কিংবা উট—এসবই তো বাহন হিসেবে মানুষ ব্যবহার করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন: 'আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা দেবো'। লোকটা তো অবাক! উটনীর বাচ্চা দিয়ে বাহনের কাজ সারা যায় নাকি? বিনয়ের সাথে রাসূলুল্লাহকে বললো, 'উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন: وهل تلد الإبل إلا النوق 'উটকে কি উটনী ছাড়া কেউ প্রসব করে?'[২৮] অর্থাৎ, তোমাকে আমি যেরকম উটই দিই না কেন, ওটা তো কোনো-না-কোনো উটনীর বাচ্চাই ছিলো! লোকটা এবার স্বস্তি পেলো।

আরেকদিনের কথা।

একজন বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং দু'আ চাইলেন, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: জান্নাতে তো কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না!

বৃদ্ধা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। বললেন: তাহলে তাদের কী হবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কি কুরআনের ঐ বাণীটা শোনোনি?—

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا[৯২]

"আমি জান্নাতী রমণীগণকে নতুনভাবে সৃষ্টি করবো। এরপর তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেবো।"

অর্থাৎ, জান্নাতে যে নারীরা প্রবেশ করবে, তারা সকলেই কুমারী তরুণীরূপে প্রবেশ করবে। জান্নাতে প্রবেশের সময় বার্ধক্যের অবয়ব আর থাকবে না কারও[৩০]। কাজেই, জান্নাতে বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না, এমনটি নয়; বরং বৃদ্ধা বৃদ্ধারূপে প্রবেশ করবে না, তরুণী হয়ে প্রবেশ করবে, ব্যাপারটা এমন।

নবিজি ﷺ-এর মুখে এরকম কৌতুক শুনে তোমার যেমন অবাক লাগছে, সাহাবিদেরও কিন্তু অবাক লেগেছিলো। তাঁরা সবিস্ময়ে বললেন: يا رسول الله إنك تداعبنا 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুক করেন!'

তাঁরা ভেবেছিলেন, যিনি আল্লাহর মনোনীত মহামানব, আল্লাহর কাছে যাঁর এতো মর্যাদা, আমাদের কাছে যাঁর এতো সম্মান, তিনি বোধহয় সবসময় গুরুগম্ভীর হয়েই থাকবেন। কিন্তু তিনি তো ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম নমুনা! রোল মডেল!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا 'কৌতুক করি বটে! তবে আমি সত্যটাই বলি।'[৩১]

অর্থাৎ, কোনো চটুল কথা, বানোয়াট কাহিনি, সত্য-মিথ্যার মিশেলে চটকাদার ঘটনা বানিয়ে তিনি মানুষকে হাসাতেন না। যা কিছু বাস্তব, যা কিছু দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও সত্য, তাকেই অবলম্বন করে তিনি কৌতুক করতেন, অন্যদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতেন। আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছো কি না জানি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটা কৌতুকেই রহস্যপূর্ণ কথাগুলো বলে শ্রোতাকে এক মুহূর্ত ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়ে পরক্ষণেই কিন্তু মূল বিষয়টা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন। যাঁর সাথে তিনি কৌতুক করছেন, তাকে একটু হাসার সুযোগ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু কৌতুকের রহস্যপূর্ণ প্রথমাংশকে বেশিক্ষণ স্থায়ী করছেন না, যাতে ঐ ব্যক্তি কোনোরূপ দুশ্চিন্তায় না পড়ে যান, কিংবা কোনো মনঃকষ্টে না ভোগেন। আমরাও যখন কারও সাথে কৌতুক করবো, হাস্যরস করবো, তখন এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবো ইন শা-আল্লাহ। সত্য কথা ও বাস্তব প্রসঙ্গ হবে আমাদের কৌতুকের বিষয়। কাউকে কষ্ট পেতে হয় কিংবা দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতে হয়, এমন কোনো কৌতুক আমরা করবো না। এটাই নবিজি ﷺ-এর শিক্ষা।

শুধু হাস্যরসই নয়, দৈনন্দিন জীবনযাপন ও মানুষের সাথে সামাজিক জীবনাচারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন প্রাণবন্ত ও প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্বের প্রভাকর। হাসতেন, হাসাতেন। ভালোবাসতেন, ভালোবাসাতেন। কাছে আসতেন, কাছে টানতেন।

একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী সাহাবিদের মধ্যে একজন ছিলেন যাহির ইবন হারাম। তাঁর চেহারা দেখতে সুশ্রী ছিলো না। ছিলেন খাটো একজন মানুষ। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনি একদিন বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়রত ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে এলেন। রাসূল ﷺ যাহিরের পেছনে এসে দুই হাত দিয়ে তাঁর চোখের ওপর ধরে রাখলেন। তারপর বললেন: 'বলো দেখি এটা কে?'

দৃশ্যটা এক মুহূর্ত কল্পনা করে দেখো!

মানবের সাথে মহামানবের প্রীতিনিলয় স্ফুরণের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্ফূটন পৃথিবীর মানুষ কি আর দেখবে?

যাহির সামান্য ঘুরে দাঁড়ালেন, বুঝতে পারলেন, ইনি তাঁর প্রিয়তম নবিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ﷺ। তাঁর পিঠের সাথে রাসূলুল্লাহর বুক লেগে আছে, এটা বোঝার পর তিনি আর নড়লেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহর বান্দাটাকে কে কিনে নেবে?

যাহির বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, দেখবেন আমাকে কেউ নেবে না, আমি অচল পণ্য!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: لكن عند الله لست بكاسد (কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে অচল পণ্য নও!)

আরেক বর্ণনায়: لكن عند الله أنت غالٍ (তুমি কিন্তু আল্লাহর কাছে খুব দামি।)[৩২]

যাহিরকে খুব ঈর্ষা হচ্ছে, তাই না? কী সৌভাগ্যবান মানুষ তিনি!

খুব ছোটবেলায় আমরাও কিন্তু অনেকে বন্ধুদের সাথে এমনটি করেছি। মাঝেমধ্যে এরকম অদ্ভুত কাজ করে চমকে দেওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা অধিকতর শক্তিশালী হয়। সকল পর্যায়ের মানুষের সাথে বন্ধুবৎসল আচরণের এই দৃষ্টান্তগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন; আমাদের এগুলো শুধু জানলেই চলবে না, হৃদয়ঘরের দাওয়ায় সবার জন্যে সমানভাবে আসন পেতে দেওয়ার মাধ্যমে এই সুন্দর জীবনদর্শনকে জীবন্ত করা চাই।

লক্ষ করো, এই হাদীসে উল্লিখিত সাহাবি যাহির ﷺ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণের। এতৎসত্ত্বেও তাঁর কর্মগুণে আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়েছেন। ইসলামের সহজাত সৌন্দর্যের একটি অনন্য দিক এটি। ইসলাম চামড়ার বরণ বা চেহারার গড়ন ইত্যাদির নিরিখে কোনো মানুষকে বিচারের ঘোর বিরোধী। আল্লাহর রাসূলের প্রিয় সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কৃষ্ণবর্ণের। ইসলাম-পূর্ব মুহূর্তে এই মানুষগুলোর গলায় দাসত্বের বেড়ি পরানো ছিলো, ইসলাম এসে সেই মানুষগুলোকে মানবিক মর্যাদার পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিয়েছে। বর্ণভেদের জাঁতায় পিষ্ট হতে থাকা প্রাণগুলোকে পৌঁছে দিয়েছে সম্মানের অত্যুঙ্গ চূড়ায়। অঙ্গসৌষ্ঠব, দৈহিক গঠন ইত্যাদির ন্যূনতম মূল্যকে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইসলাম স্পষ্ট করেই বলেছে:

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم [৩৩]

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও ধন-সম্পদের দিকে তাকাবেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকেই তাকাবেন।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদেরকে চামড়া ফর্সা করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বলে। আল্লাহর দীন আমাদেরকে হৃদয়ের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে উদ্যমী হতে বলে।

বস্তুবাদী দর্শন আমাদের সবক দেয়, সম্পদের প্রাচুর্যই জীবনের সবকিছু। আল্লাহর দেওয়া জীবনদর্শন আমাদেরকে শেখায়, কর্মের পরিশুদ্ধিই জীবনের অলংকার।

একসময় বার্ধক্যের শীতল বাতাসের ঝাপটায় চামড়ার রূপের লাস্যময়ী শিখাটাও নিভে যায়। কিন্তু হৃদয়ের সৌকর্য যে দীপ জ্বালে, সেটা দিনভর সূর্য হয়ে জ্বলে, রাত এলে সপ্তর্ষি তারকার মতো জেগে থেকে রাতভর তার অস্তিত্বের জানান দেয়। সময়ের আবর্তনে সেই আলোর স্বভাব বিবর্তিত হয়, প্রভাব পরিবর্তিত হয় না।

বিত্ত-বৈভবের পাহাড়টাও হঠাৎ কোনো ভারী বর্ষণে ধসে যায়, নিদেনপক্ষে ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু পরিশুদ্ধ কর্মের আবেদন প্রবহমান নদীর মতো, ভারী বর্ষণে তার দুকূল উপচে পলিমাটি জমে, যতদূরে বয়ে যায়, উর্বর করে যায় দুপাশের জমি।

আমরা তো দেখি অন্যদিকে চলে যাচ্ছি! এইতো, আরেকটা গল্প বলেই আমরা বুলবুলি পাখির কাছে ফিরে যাবো ইন শা-আল্লাহ। এই গল্পে আমরা দেখবো কীভাবে কঠিন না হয়ে কৌতুকচ্ছলেই কাউকে সংশোধন করা যায়। আমরা জানতে পারবো, স্খলিত হৃদয় কীভাবে ললিত আচারের স্পর্শে বিগলিত হয়।

"মক্কার রাস্তায় একবার খাওওয়াত ইবন জুবাইর ﵁ বনূ কা'ব গোত্রের মহিলাদের দিকে ফিরে বসে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হঠাৎ কোথা থেকে তাঁর কাছে এলেন,

বললেন: 'আবু আব্দুল্লাহ![৩৪] মহিলাদের সাথে তোমার কী কাজ?'

তিনি (কোনোরকম একটি অজুহাত পেশ করার জন্যে) বললেন: আমার হতচ্ছাড়া উটটিকে বাঁধার জন্যে তাঁরা রশি পাকাচ্ছেন। (আমি সেই রশি পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি।)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রয়োজন সারার জন্যে চলে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, (আমাকে তখনও বসা দেখতে পেয়ে) বললেন:

'আবু আব্দুল্লাহ! সেই হতচ্ছাড়া উট কি এখনো তোমার পিছু ছাড়েনি?'

খাওওয়াত বললেন: আমি লজ্জায় চুপ করে থাকলাম। এরপর সবসময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতাম। একপর্যায়ে মাদীনাহতে এলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাসজিদে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখলেন এবং আমার দিকে এগিয়ে এসে বসলেন। এটা দেখে আমি সালাত দীর্ঘ করতে শুরু করলাম। তিনি ﷺ বললেন: 'সালাত দীর্ঘ কোরো না, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।' যখন সালাম ফিরালাম, তিনি বললেন:

'আবু আব্দুল্লাহ! সেই হতচ্ছাড়া উট কি এখনো তোমার পিছু ছাড়েনি?'

আমি বললাম: সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীন নিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার ইসলামগ্রহণের পর থেকে উটটি হতচ্ছাড়া হয়নি। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! হে আল্লাহ, আপনি আবু আব্দুল্লাহকে হিদায়াত দিন।'

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর তাঁর ইসলামী জীবন খুব সুন্দর হয়ে গেলো, আল্লাহ তাঁকে হিদায়াত করলেন।"[৩৫]

দেখলে! হাসতে হাসতেও মানুষের ভুল সংশোধন করে ফেলা যায়! কাউকে যখন আমরা অসংগত আচরণ করতে দেখবো, অথবা কারও কোনো স্বভাব যখন আমাদের কাছে দীন-বহির্ভূত বলে মনে হবে, আর আমরা তাকে এ বিষয়ে দৃষ্টি-আকর্ষণপূর্বক সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করবো, তখন আমাদের উচিত হবে এই ঘটনাটি সামনে রাখা। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো ঠিক আছে, এমন কারও কথায় বা আচরণে বিশেষ কোনো দুর্বল দিক নজরে পড়লেই তড়িৎগতিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া কখনোই উচিত নয়। সম্ভাব্য সুন্দর উপায়ে তাঁর কাছে বিষয়টি উপস্থাপনের পর ধৈর্য, সহনশীলতা ও বন্ধুবৎসল আচরণের মাধ্যমে তার মধ্যে বোধোদয় ঘটার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় তার মধ্যে অনুশোচনার উপলব্ধি জাগ্রত হবে। এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে তার সাথে সৌহার্দের সম্পর্কটা স্বাভাবিক ও প্রীতিপূর্ণ থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা দেখতে পাই, খাওওয়াত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ﷺ-এর মধ্যে দৃষ্ট ত্রুটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হালকা ভাবেই নিয়েছেন, যেহেতু তাঁর ঈমান ও অন্যান্য ফরয 'ইবাদাতে কোনো গাফলতি দেখা যায়নি। এরপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে ভারিক্কি কোনো কথা বলা বা ভীতি প্রদর্শনের পরিবর্তে হাসতে হাসতেই একাধিকবার তার বোধিবৃক্ষ নাড়া দিয়ে গেছেন। এই আচরণে খাওওয়াত ﷺ নিজেই হালকাবোধ করতে লাগলেন। বাহ্যিক কোনো চাপ যেহেতু মাথায় ছিলো না, তিনি একান্তে নিজেকে নিয়ে ভাবার সুযোগ পেয়েছেন। তারপর তার মধ্যে অনুশোচনা এলো, তিনি ভুল বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্যে দু'আ করলেন। অবশেষে তিনি হিদায়াতের বারিধারায় স্নাত হলেন। দা'য়ীদের জন্যে এই ঘটনায় ভাবনার খোরাক রয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরেকটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা ﷺ বলছেন:

"একদিন এক লোক রাসূলুল্লাহ'র ﷺ কাছে এসে ভেতরে ঢোকার অনুমতি প্রার্থনা করলো। লোকটিকে চিনতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে নিজে বললেন: بئس أخو العشيرة (বংশের সবচে' মন্দ লোকটা এলো)। যখন লোকটি ঢুকলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই নম্র ভাষায় তার সাথে কথা বললেন। আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি লোকটির ব্যাপারে ওরকম বললেন, আবার তার সাথেই নম্রভাবে কথা বললেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

أي عائشة، إنّ شرّ النّاس من تركه النّاس أو ودعه النّاس اتّقاء فحشه

"আয়িশা! মানুষের মধ্যে সবচে' নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই, যার গর্হিত কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার সঙ্গ ত্যাগ করে।"[৩৬]

বোঝা গেলো, কোনো মানুষের মধ্যে মন্দস্বভাব অথবা খারাপ চারিত্রিক দিক উপস্থিত থাকলেও সামনাসামনি তাকে সে প্রসঙ্গে বিব্রত করা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ ছিল না। এই হাদীসটি আমাদের বলছে, মন্দস্বভাবের কাউকে মন্দ কথা বলে সংশোধন করা যায় না। মন্দের বিপরীতে উত্তম কথাই হতে পারে সংশোধনের হাতিয়ার। কুরআনেও এই বাস্তবতাটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে:[৩৭]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্যে কোমলহৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সরে যেত।"

কোনো মানুষকে উত্তম উপায়ে ও কোমল ভাষায় 'নাসীহাহ' দিয়ে ভুল-ত্রুটি থেকে তাকে ফেরানোর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ রেখে গিয়েছেন। আমরা এ ব্যাপারটি সবসময় সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করবো।

এসো তবে বুলবুলির কাছেই ফিরে যাই।

ফিরে আর যাবো কি, আমরা অন্য গল্প করতে করতে ওরা আর ডালে নেই, উড়ে গেছে। দেখি অন্য কোনো পাখির দেখা মেলে কি না।

দিঘিতে অবাধ জাল ফেলা রোধ করার জন্যে পুঁতে দেওয়া ছিপের আগায় দুয়েকটা মাছরাঙা দেখা যাচ্ছে। কিছু মাছরাঙার বুক একেবারে সাদা দেখায়, দূর থেকে তাকালে মনে হয় গভীর সমুদ্রের মাঝখানে একটা সাদা পাল প্রচ্ছন্নভাবে তার অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। আজকে সেগুলোর কোনো দেখা মিলছে না।

কাঙ্ক্ষিত মাছরাঙার দেখা না মিললেও আরেকটা বিরল প্রজাতির পাখি নজরে পড়লো হঠাৎ। গ্রামে বড়ো হয়েছে, কিন্তু পিউ-পিউ ডাকতে থাকা পাপিয়া পাখি দেখেনি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যে পাপিয়ার ডানা খয়েরি রঙের হয়ে থাকে, তাকে আমাদের স্থানীয় ভাষায় 'খয়রাপাখ পাপিয়া' বলে। আমি গ্রামে এলেই এই সৌপর্ণ পাখিটাকে খুঁজে বেড়াই চারপাশে। আজকে দেখা মিললো তাহলে! ইস, কেন যে মোবাইলটা বাড়িতে রেখে এলাম! একটা ছবি তুলে রাখতে পারলে মন্দ হতো না। ইংরেজি সাহিত্যে এই পাখিটা খুব আলোচিত। জন কিটসের বিখ্যাত গীতিকবিতা Ode to a Nightingale লেখা হয়েছিলো একটা বাগানে বসে। একদিন প্রাতরাশের পর বাগানে বসে ছিলেন তিনি। একটা পাপিয়া পাখিকে তিনি গান করতে দেখছিলেন, পাখিটা তাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছিলো, আর বসে বসে তিনি এই কবিতাটি লিখছিলেন।[৩৮]

পাখির দিকে তাকিয়ে কিটস যেমন একটা কবিতার অবতারণা করেছেন, ইবনুল ক্বাইয়িম পাখির দিকে তাকিয়ে একটা উপলব্ধির অবতারণা করেছেন। আল্লাহর দিকে ছুটে যাওয়া অন্তরকে তিনি পাখির সাথে তুলনা করেছেন। তারপর বলেছেন:

"ভালোবাসা হচ্ছে এই পাখিটার মস্তক। আর পাখিটার দুটো ডানা হলো 'আল্লাহর আযাবের ভয়' ও 'আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশা'। যখন পাখির মাথাটি সুস্থ ও নিরাপদ থাকে, তখন সে ভালোভাবে উড়তে পারে। আর যখন মাথা কাটা পড়ে, তখন পাখিটিরও মৃত্যু হয়। আবার যখন সে ডানা হারিয়ে ফেলে, তখন উড়ার সক্ষমতা হারিয়ে শিকারীর শিকার্য বস্তুতে পরিণত হয়।"[৩৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খুব গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি। একদম বাস্তবসম্মত জ্ঞানোদয়। ঈমানের সাথে যাপন করতে চাওয়া জীবনের মূল দর্শন এখানে তিনটা উদাহরণে চলে এসেছে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যত প্রবল ও গাঢ় থাকবে, যত বেশি নিখাদ হবে, অনন্তের পথে আমাদের এই যাত্রা তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন হবে। এই ভালোবাসার তীব্রতা যার যত বেশি, আল্লাহর বিধিনিষেধ পালনে তার সতর্কতা তত বেশি। হৃদয়ের জমিনে এই ভালোবাসার শিকড় নিচের দিকে যার যত গভীর, তার অন্তর্দৃষ্টি উপরের দিকে তত বেশি গতিশীল, তত দ্রুত আকাশছোঁয়া।

একইসাথে, আল্লাহর আযাবকে ভয় করা এবং তাঁর ক্ষমা ও পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রত্যাশা সমানভাবে জাগরূক রাখাও এই পথচলার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। এ দুটোকে ধারণ করা ব্যতীত আল্লাহর কাছে পৌঁছা স্বপ্নাতীত। আল্লাহ তাঁর নৈকট্যপ্রত্যাশীদের পরিচয় বর্ণনা করেছেন এভাবে:

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

"এবং তারা আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করে, তাঁর আযাবকে ভয় করে।"[৪০]

আরেকটা আয়াতে ভয় ও আশার মাঝামাঝি অবস্থানের দিকে আল্লাহ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন:

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

"আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন: আমিই অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এটাও জানিয়ে দিন: আমার শাস্তিই ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৪১]

বোঝা গেলো, ভয় ও প্রত্যাশা কোনোটাই মুমিন জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর যেকোনো একটি হারিয়ে যাওয়া মানেই একটি ডানা ভেঙে পড়া। একটি ডানা ভেঙে পড়া মানেই এগিয়ে চলায় ছন্দপতন, উড়ন্ত গতিপথ থেকে নিশ্চিত ছিটকে পড়া। এজন্যে ভয় ও আশাকে ভালোবাসার সাথে বিরাজমান রাখা চাই, এদের বিভাজন করা থেকে বিরত থাকা চাই।

ভালোবাসার অনুপস্থিতি যেকোনো অনুরাগকেই বিরাগে পরিণত করে, ইবাদাতের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে থাকে। অন্যদিকে, আল্লাহর ভয় অন্তর থেকে হারিয়ে গেলে জীবনাচার অনিবার্যভাবেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। আবার তাঁর রহমতের আশা না থাকলে হতাশার গহ্বরে নিমজ্জিত হতে হবে আপনাতেই, আর এই হতাশা থেকেই বিপথগামিতার সূচনা। সুতরাং, এই তিনটি বাহুকে একসাথে নিয়েই ঈমানের ত্রিভুজ সংহত করতে হবে। এদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানে ত্রুটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হলে শাইত্বান তার শিকার্য বস্তুতে পরিণত করার কাজে একধাপ এগিয়ে যাবে।

পাখিটা উড়ে বরই গাছের দিকে চলে গেলো। দেরি না করে আমিও সেদিকে ছুটলাম। বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হলো না। ঝুঁটিদার পাখি উড়াল দিয়ে অদৃশ্য হলো। ততক্ষণে দিঘিতে ডুবসাঁতার খেলতে দেখলাম একটা পানকৌড়িকে। কিছুক্ষণ একটানা সাঁতরালো। সাঁতারের সময় পা দুটো এমনভাবে চালিয়ে নিচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো কোনো ধীর স্বভাবের মাঝি সুশান্ত নদীতে নৌকার দাঁড় বেয়ে চলেছে। ততক্ষণে আরও কয়েকটা পানকৌড়ি এসে হাজির। বড়শির মতো বাঁকানো তার ঠোঁটাগ্র দেখে আমার মনে একটা পুরোনো দুঃখ নতুন করে উঁকি দিয়ে গেলো। ছোটবেলা থেকে কতবার বড়শি নিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একটা মাছও আমার বড়শিতে ঠোকর দেয় না। একবার তো একটা বিশালকায় মাছ টান দিয়ে আমার বড়শির ছিপসহ পুকুরের নিচে নিয়ে গিয়েছিলো। জাল ফেলে মাছ ধরার কসরতও কম করিনি। কিন্তু আমার জালপ্রক্ষেপণে কী যেন ত্রুটি হয়ে যায়, পুকুরে ছুড়ে দেওয়ার সময় জালটা একেবারে সরু হয়ে পানিতে গিয়ে পড়ে। জালপ্রক্ষেপণও আসলে একটা বড়ো শিল্প। এই শিল্পে হাত পাকা করার জন্যে যথাযথ অনুশীলনের দরকার হয়।

পানকৌড়িদের ডুবসাঁতার চলছে, এর মধ্যেই কোনদিক থেকে যেন দোয়েলের শিস কানে এলো। দোয়েলের বিচিত্র সুরের গান ভীষণ পছন্দ আমার। অবশ্য এদের কূজন ভোরবেলাতেই বেশি উপভোগ্য হয়। সমবেত কলকাকলিতে ভরিয়ে তোলে ঊষারাঙা ভোর। ছটফট করার ক্ষেত্রেও এরা অদ্বিতীয়। এ-ডাল থেকে ও-ডাল, এখান থেকে ওখান, উপর থেকে নিচ, নিচ থেকে উপর—এভাবে তার অস্থির চলন চলতেই থাকে। শিস শোনার পর তার উপস্থিতি কোথায়, সেটা খুঁজতে যাওয়ার আগেই লাফাতে লাফাতে চোখের সামনে হাজির। আমি বিস্ময় নিয়ে দেখি, ছোট পাখিটার পিঙ্গল বর্ণের চোখে কেমন অভিজাত একটা চাহনি!

এমিলি ডিকিনসনের একটা দারুণ কবিতার কথা মনে পড়ছে, যেখানে দোয়েলের উল্লেখ আছে। না, দোয়েলের চাঞ্চল্যের বর্ণনা কিংবা তার অতুলনীয় স্বরগ্রামের প্রশংসা নয়। একটু অন্যরকম। কবিতাটির[৪২] কাব্যানুবাদ করা যেতে পারে:

"কারো ভাঙা বুকে যদি দিতে পারি গাঢ় মমতার ছোঁয়া
সার্থক হবে জীবন আমার, বৃথাই যাবে না খোয়া
বিপন্ন কোনো জীবনকে যদি স্বপ্ন দেখাতে পারি
ব্যথাতুর মনে যদি হতে পারি প্রশান্তি-সঞ্চারী;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মূর্ছিত যেই দোয়েলটা চায় ফিরতে আপন নীড়ে—
আমার হাতেই সে যদি আবার সুখনীড় পায় ফিরে
সার্থক হবে বেঁচে থাকা এই অর্থহীনের ভিড়ে।"

কী সুন্দর মনোবাসনা তাঁর!

ঝড়ের কবলে পতিত হয়ে নীড় থেকে অনেক দূরে একটা ছোট্ট দোয়েল পাখি আহত হয়ে পড়ে আছে। আমি তাকে হাতে তুলে নিয়ে তার নীড়ে, বাবা-মায়ের আশ্রয়ে দিয়ে এলাম। পাখিটা নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখলো, নতুন পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকালো। পাখিটির বাবা-মা মৃতপ্রায় সন্তানকে ফিরে পেয়ে এ-ডাল থেকে ও-ডালে আনন্দমুখরতার জানান দিচ্ছে নানান সুরে গান গেয়ে। আমি সে দৃশ্য দেখে আত্মপ্রসাদে বুক ভরিয়ে তুলছি। এরকম একটা দৃশ্যকল্প চোখ বন্ধ করে ভাবতেও তো কত ভালো লাগে, তাই না!

পীড়িতের পাশে দাঁড়ানোর এই উদগ্র বাসনা, অসহায় প্রাণে সঞ্জীবনী সঞ্চারের এই সুতীব্র অভীপ্সা মানুষমাত্রই লালন করে। অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়াতে পারার যে আত্মতৃপ্তি, তার কোনো তুলনা হয় না। হাসতে-ভুলে-যাওয়া একজন মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কারণ হতে পারলে নিজেকে কেমন সুখী মনে হয়, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন আল্লাহতে-বিশ্বাসী মানুষ এক্ষেত্রে দ্বিগুণ পুরস্কার পান। একে তো তিনি পূর্ণ মানুষিকতার চর্চায় মানসিকভাবে তৃপ্তি পেলেন, আবার আল্লাহর কাছেও এই মানবিকতার জন্যে দারুণ একটা প্রতিদান তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জন্যে সুসংবাদ দিচ্ছেন:

ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোনো প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে পাশে থাকবেন। যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের কাছ থেকে একটি দুনিয়াবি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন।"[৪৩]

ইসলামী জীবনে মানবিক মূল্যবোধ চর্চার জায়গাটা এত বেশি প্রশস্ত এবং এত বেশি প্রশান্তিদায়ক যে, অপরের কল্যাণে যেকোনো ছোটখাটো উপকার নিয়ে এগিয়ে আসলেও সেটা আল্লাহর কাছে মহৎকর্মের স্বীকৃতি পায়, এবং ঐ ব্যক্তিটি সর্বোত্তম প্রতিদানেই পুরস্কৃত হন! শুধু আরেকজনের বিপদ দূর করাই নয়, অন্যের মান-সম্ভ্রম রক্ষায় আমার যেকোনো ভূমিকাকেও আল্লাহ মূল্যায়ন করবেন। হাদীস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তা-ই বলছেঃ

ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة

"যে ব্যক্তি অপর কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ ঢেকে রাখবেন।"[৪৪]

সুন্নাহ থেকে পাওয়া এই সুন্দর আদর্শগুলোর যথাযথ সামষ্টিক চর্চা একজন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও সম্মানের নিরাপত্তা দুটোকেই নিশ্চিত করে। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দেওয়া বিধানগুলো একটি সুস্থ-সুস্থির ও সুন্দর-স্বাভাবিক সমাজ বিনির্মাণে কত বেশি অপরিহার্য।

ভালো কথা মনে পড়লো, আমরা পাখি নিয়েই যেহেতু গল্প করছি, এক্ষেত্রেও পাখিদের জীবনাচার থেকে কয়েকটা উদাহরণ টানা যেতে পারে। অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের নজির শুধু মানুষের মধ্যে নয়, তাদের মধ্যেও আছে।

লেজঝোলা ফিঙে পাখি আমাদের সবার কাছেই খুব চেনা। এই পাখিটা অন্যান্য ক্ষুদ্রাকার পাখির জন্যে একটা ভরসাস্থল। এরা যে বৃক্ষে বাসা বাঁধে, সেখানে এসে অন্য পাখিগুলো বাসা বেঁধে নিরাপদবোধ করে। কারণ হিংস্র চিলের থাবাকে বিপুল সাহস নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে প্রতিহত করে দেয় ফিঙে পাখি। ফিঙে যে গাছে বাসা বাঁধে, ভালোভাবে খুঁজলে দেখা যাবে, সেখানেই কোনো এক ডালে হলদে পাখি বাসা বেঁধেছে। হলদে পাখি নিজে যেহেতু আক্রমণ ঠেকাতে পারে না, সেজন্যে ফিঙে পাখির প্রতিবেশী হয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চায়। ফিঙে পাখিও তার ওপর রাখা এই আস্থাকে বরাবরই সত্য প্রমাণ করে যায়।

আমাদের প্রায় সকলের কাছে অপছন্দনীয় পাখির তালিকায় শীর্ষে থাকা কাকও এই গুণে গুণান্বিত। গ্রামে বড়ো হওয়া এমন কোনো শিশু নেই, যে কিনা সন্তানের প্রতি কাকের ভালোবাসা ও মমতা দেখেনি। শুধু নিজের সন্তানই নয়, কাকের বাসায় রেখে যাওয়া কোকিলের বাচ্চাগুলোকেও সে পরম যত্নে লালনপালন করে বড়ো করে তোলে। এ ধরনের সন্তানবাৎসল্য ও পরহিতৈষণার জন্যে ঘুঘু পাখিরও নামডাক আছে।

জান্নাতী ব্যক্তিদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাখিদের হৃদয়ের মতোই তারা কোমলপ্রাণ ও ভালোবাসাপূর্ণ অন্তরের অধিকারী। কোমলপ্রাণের অধিকারী সাহাবি আবূ হুরায়রা ﷺ এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

يدخل الجنة أقوام أفئدتُهم مثل أفئدة الطير

"জান্নাতে এমন কিছু লোক প্রবেশ করবে, যাদের হৃদয়গুলো পাখিদের হৃদয়ের মতো।"[৪৫]

পাখিদের হৃদয়ের সাথে কেন সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে—উত্তরটা খোঁজার চেষ্টা করেছেন ইমাম নাওয়াওঈ। তিনি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই হাদীসটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুইটি পয়েন্ট সামনে এনেছেন[৪৬]:

- তাদের হৃদয় পাখির মতোই নরম ও কোমল।
- সৃষ্টজীবের মধ্যে পাখিরা তুলনামূলক অধিক ভীতিপূর্ণ হৃদয় ধারণ করে। তেমনি এই লোকদের হৃদয়ও আল্লাহর ভয়ে পূর্ণ থাকবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা থেকে সারবস্তু পাওয়া গেলো দুটি: কোমলতা ও আল্লাহভীতি। এই দুটো বৈশিষ্ট্য সর্বাবস্থায় ধারণের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত আমাদের। জান্নাতের স্বপ্নচারী হলে তো জান্নাতের দূরাচারী পথ পাড়ি দেয়ার সব উপকরণ সাথে রাখা চাই! তেমনই দুটো উপকরণ হলো হৃদয়কে কুসুমকোমল রাখা এবং কুসুমঘ্রাণের মতোই আল্লাহর ভয়কে হৃদয়ের সবখানে ছড়িয়ে রাখা।

দোয়েলের সাথে ভাবনাপর্ব শেষ হতে না হতেই টের পেলাম, অবিকল দোয়েলের শিস বাজিয়ে কে যেন এদিকে এগিয়ে আসছে। পেছন ফিরে দেখি, বাল্যবন্ধু আতহার। হাতে তার গুলতি। ছোটবেলার স্মৃতি এখনো স্পষ্ট মনে আছে। গুলতির জন্যে গুলি বানাতে আমরা নরম কাদামাটি নিয়ে আসতাম। রসগোল্লার চেয়ে একটু ছোট, মার্বেল পাথরের চেয়ে একটু বড়ো, এরকম মাঝামাঝি সাইজের গুলি পাকাতাম। তারপর নাড়ার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গুলিগুলো শক্ত করতাম। গুলতি ব্যবহারে আমি বরাবরই অদক্ষতার পরিচয় দিয়ে এসেছি। তবে আতহারের নিশানা ছিলো ভালো। একসাথে ঘুড়িও উড়াতাম আমরা। দুজনেই কত বড়ো হয়ে গেলাম চোখের পলকে! আমি তাকে দেখে উৎফুল্ল, সেও আমাকে দেখে যারপরনাই খুশি। বরই গাছের নিচে হলুদের গাছ। বরই গাছের ডাল ছাঁটা হয়েছে কয়েকদিন আগেই—দেখে বোঝা যাচ্ছে। কাঁটাসমেত অনেক ডাল নিচে পড়ে আছে। হলুদ গাছের পাতার ফাঁকে পা ফেলার সাথে সাথেই নিচে থাকা একটা ডালের কাঁটা পায়ে বিঁধে গেলো। আমি 'উহ্' করে উঠলাম, সাথে সাথে আবার 'আলহামদুলিল্লাহ'ও বললাম। আতহার তো অবাক! 'কষ্ট পাইলি, আবার আলহামদুলিল্লাহও কইলি! মাথা ঠিক আছে নি তর?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি বললাম, একটা হাদীস মনে পড়ে গেছে, তাই 'আলহামদুলিল্লাহ' বললাম।

ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها [৪৭]

"একজন মুসলিম যে-বিপদেই আপতিত হোক না কেন, সেটার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর গোনাহ মুছে দেন। এমনকি যে কাঁটাটি বিদ্ধ হয়, তার বিনিময়েও।"

কী সুন্দর দীন আমাদের! একটা কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার সামান্য ব্যথাকেও স্থায়ী আসন গাড়ার সুযোগ দিচ্ছে না! বিপদে আপতিত হওয়ার পর দিশেহারা হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না! এমনকি অসুখের সময়ও আমরা অসুখী হতে পারি না। গত মাসে যখন প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছিলাম, অস্থিরতায় কাঁপছিলাম আর মনে হচ্ছিলো জীবনটাই বিষিয়ে উঠছে, তখন বাবা আমাকে একটা হাদীস শুনিয়েছিলেন, যেখানে জানতে পারলাম, উম্মুস সায়িব-নাম্নী একজন সাহাবিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর জ্বরের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপক কথা বলছিলেন। নবিজি ﷺ তাকে এটা না করার জন্যে বললেন। একইসাথে শুনিয়ে দিলেন প্রশান্তিদায়ক একটা কথা:

فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد [৪৮]

"জ্বর আদমসন্তানের পাপগুলো এমনভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে হাঁপরের আগুন লোহার সংকর ধাতু দূর করে দেয়।"

আমার জ্বর এত তীব্র ছিলো যে, ঐ অবস্থায় নিজের হাত দিয়ে নিজেকে ছুঁয়ে দেখলে জ্বরতাপের তীব্রতায় নিজেই ভয় পেয়ে যাই। সেই জ্বরতাপ গনগনে বোশেখের খরতাপের চেয়েও তীব্র। অস্থিরতায় লক্ষ্যহীন পায়চারি করতে করতে হাদীসটা সামনে আসে, আর মনে হতে থাকে, আমি একটা লৌহ, আমাতে জমে আছে কিছু অপাঙ্‌ক্তেয় মরচেকণা, আর এই জ্বর-নাম্নী হাঁপরের আগুন আমাকে পরিশুদ্ধ করার জন্যেই জ্বলছে। তারপর এই তপ্ত আগুনের অর্চি আমার চোখে বনগোলাপের পাপড়ি হয়ে যায়।

এমন একটা জীবনদর্শনে আস্থা রাখার সৌভাগ্য হয়েছে, যেখানে প্রচণ্ড অস্থিরতার প্রতিটা মুহূর্তে এভাবেই এক পশলা স্বস্তির বৃষ্টি ঝরে পড়তে দেখি।

আতহার আমার কথাগুলো শুনে আর খানিক পরপর আমাকে পরখ করে দেখে। উশকোখুশকো চুলে কিছুক্ষণ আঙুল চালিয়ে একটা ঢোক গিললো, তারপর আমাকে বললো:

'বন্ধু, তোর লাইফটা কত সুন্দর আছে! আমার লাইফটা হাত থিকা ছুইট্যা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্যাছে গা। আমার লাইফ আমার কাছে নাইক্যা।'

হঠাৎ এমন কথা বলছে কেন সে? অবাক হলাম একটু। জানতে চাইলাম, কেন এভাবে বলছে।

'তুই সবখানেই শান্তি খুঁইজ্যা পাইতাছস। কাঁটা ফুটছে, এইখানে তর শান্তি। জ্বর আইছে, ওইখানেও তর শান্তি। আমি পাইতাছি না, বন্ধু। আমার সবকিছুতেই অশান্তি লাগে। দুইন্যা থিকা শান্তির মা মইরা গ্যাছে গা।'

এখনো তার কথা পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারি না। কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'এভাবে হতাশ হইস না। আমাকে খুলে বল কী হয়েছে।'

ও যা বললো, তার সারমর্ম এই, মফস্বলের উঠতি তরুণদের মধ্যে একদল খুব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। আতহার এদের খপ্পরে পড়ে নানাবিধ অনৈতিক কাজে জড়িয়েছে। আসলে বাস্তবতা হচ্ছে, পুণ্যের কাজে সাময়িক কষ্ট হলেও তার সুন্দর প্রভাব চিরস্থায়ী থাকে। অপর দিকে পাপের কাজে সাময়িক আনন্দ পেলেও তার দীর্ঘমেয়াদি কুপ্রভাব জীবনকে হতাশার গহ্বরে ফেলে দেয়। তবে সে যেহেতু অনুতপ্ত, ফিরে আসার ব্যাকুলতা যেহেতু তার ভেতর শুরু হয়েছে, আমি তাকে কিছুক্ষণ সময় দিলাম। ওর সাথে গল্প বলার পরিবেশটা প্রস্তুত করার জন্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি বাণী আগে শুনিয়ে দিলাম:

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ [৪৯]

"যখন দেখবে তোমার ভালো কাজ তোমাকে আনন্দিত করছে, তোমার পাপ কাজ তোমাকে ব্যথিত করছে, তখন বুঝবে তুমি মুমিন।"

ওর ভারাক্রান্ত চেহারায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচার আনন্দ। সে যে অন্যায় করেছে, সেই অন্যায়বোধ যে তাকে পোড়াচ্ছে, এটা চিন্তা করার পর বুঝলো, তাহলে তার ঈমানের পালস এখনো অচল হয়নি, সে এখনো মুমিনদের কাতারেই আছে। এই উপলব্ধিটা তাকে উৎসাহিত করলো আমার সাথে আরও কিছুক্ষণ গল্প করার জন্যে।

আচ্ছা আতহার, আমরা দুজন যখন ঘুড়ি উড়াতাম, তখন ঘুড়িটাকে রং-বেরঙের কাগজ দিয়ে কী সুন্দর করেই না সাজাতাম! তারপর সুতোয় বেঁধে উড়িয়ে দিতাম। আমার কী মনে হয় জানিস? আমাদের জীবনটাও একটা ঘুড়ি, যাকে প্রতিনিয়ত নতুন সাজে সাজিয়ে চলছি। এই ঘুড়িতে সবসময়ই একটা সুতো দরকার। ঘুড়ি উড়ানোর জন্যে নানা রকম সুতো আছে: শক্ত, চিকন, কালো, হলদে, তামাটে— কত রকম সুতো! জীবনঘুড়ি উড়ানোর জন্যেও নানা ধরনের চিন্তা, দর্শন ও ধর্মকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানুষ অবলম্বন করে। ঘুড়ির সুতো কেনার সময় আমরা যেমন সবচে' টেকসই ও শক্ত সুতোটা পরখ করে কিনে আনি, তেমনই জীবনঘুড়ির জন্যেও সর্বোত্তম সুতা বেছে নেওয়া প্রয়োজন। 'ইসলাম' তথা 'আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ'কে আমার কাছে সবচে' টেকসই, আস্থাপূর্ণ ও শক্তপোক্ত সুতো বলে মনে হয়, যেটাতে ঘুড়ি বেঁধে দিলে নির্ভয়ে আকাশে উড়তে থাকে। আমার অদক্ষতায় কখনো সুতোটা ছিঁড়ে গেলে পরক্ষণেই জোড়া দিই অথবা ঘুড়ি পাক খেয়ে দূরে কোথাও চলে গেলে খুঁজে বের করে আনি, সুতোর সাথে আবার জুড়ে দিই। এভাবে আমার ঘুড়ি আমার হাতেই থাকে, হাতছাড়া হয় না।

এই যে তুই বললি, জীবন তোর হাতছাড়া হয়ে গেছে, কেন জানিস? কারণ, তোর ঘুড়িতে কোনো সুতো নেই। সুতোবিহীন ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দিলে কীভাবে তোর হাতে থাকবে, বল?

'আমি এহন করুম কী?'

খুব সহজ! ঘুড়িতে সেই সুতোটা লাগিয়ে দে, যেটা আমি লাগিয়ে নিশ্চিন্ত আছি!

'কিন্তু লাইফটা তো শেষ হইয়া গ্যাছে গা। আমি খুঁইজ্যা পাইতাছি না।'

বোকা ছেলে! ছোটবেলায় যখন বাতাসের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে ঘুড়ি ছিঁড়ে ছিটকে পড়তো, তখন কি এভাবে হতাশ হয়ে বসে থাকতি? ঘুড়িটা যখন তোর ঘোরপাকে কিংবা বাতাসের ঘুরপাকে ছিঁড়ে গিয়ে কেয়াবনের মাঝখানে পড়তো, তখন সুচালো কাঁটার চতুর্মুখী আক্রমণ উপেক্ষা করে তুই তো সেই কেয়াবনের ঝোপঝাড় থেকেও ছিন্ন ঘুড়িটা বের করে আনতি। অথবা কখনো ঘুড়িটা চৌধুরিবাড়ির সীমানায় পৌঁছে ছিঁড়ে গেলে গোঁফওয়ালা পেয়াদাগুলোর রক্তচক্ষু আমলে না নিয়ে সীমানাপ্রাচীর টপকে ঢুকে যেতি ঘুড়িটাকে নিয়ে আসার জন্যে। কী, নিয়ে আসতি না?

'হ, আনতাম।'

জীবনটাকে যেহেতু ঘুড়ির সাথে মিলিয়ে দেখলাম, এবার ঘুড়ি উদ্ধারের মতোই জীবনটাকে তোর হাতে নিয়ে আয়। বেশি দূরে যায়নি। তোর অন্তরের চৌহদ্দিতেই কোথাও আছে। সুতো কাটার কারণে কোনদিকে গেছে, বুঝতে পারিসনি, এই যা।

আতহার রাজি হয়। চোখেমুখে তার নিজেকে পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা আমি আঁচ করতে পারি। মনে হতে থাকে, জীবনঘুড়িকে সে নতুন করে সাজাবে আবার। এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘুড়িতে সমর্পণের সুতো জুড়ে দিয়ে আবার মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেবে সে। সুতো কেটে গেলে দেরি না করে আবার জোড়া দেবে। ঘুড়ি ছিটকে গেলে দেরি না করে খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে।

ওর হাত থেকে গুলতিটা নিয়ে দুয়েকটা গুলি ছোড়ার চেষ্টা করলাম। আমার গুলতি ছোড়ার হাত এতদিনে আরও বেশি কাঁচা হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়লো, কাঁটাসমেত সেই ডালটা সরিয়ে রাখা হয়নি! এখানে তো অনেক শিশুই খেলতে আসে। ওদের কারও পায়ে যদি কাঁটা বিঁধে যায়! আমরা হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর চলে এসেছিলাম। খানিকটা পেছনে ফিরে এসে সেই কাঁটা খুঁজে বের করলাম, তারপর ওখান থেকে সরিয়ে দিলাম। এটা খুব ছোট একটা কাজ, কিন্তু অনেক বড় পুণ্যের!

একটা কাঁটাওয়ালা গাছের কাণ্ড পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার কারণেই আল্লাহ এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন![৫০] শুধু কাঁটা নয়, মানুষের চলাচলের রাস্তা থেকে যেকোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া অনেক বড় পুণ্যের কাজ। এমনকি জান্নাতে যাওয়ার কারণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির গল্প বলছেন:

لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى المسلمين [৫১]

"আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। সে জান্নাতে গিয়েছে রাস্তার উপর থেকে একটা গাছ সরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, যেটা মুসলিমদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে ছিলো।"

এগুলো খুবই ছোট কিছু কাজ, কিন্তু আল্লাহর কাছে বড় প্রতিদান পাওয়ার জন্যে ছোট কাজগুলোই একেকটা বড় উপলক্ষ্য। ছোট পাপ বলে যেমন কোনো পাপকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই, ছোট কাজ বলেও কোনো পুণ্য কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখাতে কোনো উপকার নেই। ছোট-বড় সব ভালো কাজেই নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা প্রয়োজন, ছোট-বড় সব পাপ থেকেই নিজেকে সরিয়ে রাখা জরুরি।

আতহার প্রস্তাব দেয়, উত্তরের জলাধারে একসাথে বালিহাঁস শিকারে যেতে চায় সে। জানতে চাইলাম, পাখিশিকারের উদ্দেশ্য কি নিছক সময় কাটানো বা বিনোদন করা, নাকি প্রয়োজনবশত পাখির গোশত খাওয়া?

এরকম প্রশ্নে সে অপ্রস্তুত হয়।

'ইরাম প্রশ্ন তো আর করিস নাই!'

হ্যাঁ, করিনি। আজ করছি, তার কারণ হলো, নবিজি ﷺ বিনা কারণে পাখি না মারতে বলেছেন। খাওয়ার প্রয়োজন হলে পাখি শিকার করে খেতে বারণ নেই, কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনর্থক পাখি শিকারকে নিষেধ করেছেন। এমনকি এ-ও বলেছেন:

من قتل عصفورا عبثا عجّ إلى الله- عزّ وجلّ- يوم القيامة يقول: يا ربّ إنّ فلانا قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة [৫২]

"যে ব্যক্তি অনর্থক কোনো চড়ুই পাখি শিকার করবে, কিয়ামতের দিন সেই পাখিটি চিৎকার করে আল্লাহকে বলবে: হে আমার রব্ব! ঐ লোকটি আমাকে শুধু শুধু হত্যা করেছে। কোনো উপকারী উদ্দেশ্যে আমাকে মারেনি।"

ছেলেমানুষি চরিতার্থ করার জন্যে উদ্দেশ্যহীন পাখিশিকার করে শুধু শুধু আল্লাহর কাছে অভিযুক্ত হওয়ার পথে হাঁটবো কেন? এতদিন তো এসব জানতাম না, তাই শৈশবের দুরন্তপনার কারণে করেছি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। এখন যেহেতু জানতে পারলাম, শিকারটা না-ই করি, কী বলিস?

আতহার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলো। মুমিনদের বৈশিষ্ট্যই তো এটা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নির্দেশনা পৌঁছার সাথে সাথে বিনয়াবনত চিত্তে সেটাকে মেনে নেবে।

সে খুব আফসোস করে বলছিলো, দীন সম্পর্কে ভালো করে না জানার কারণে কত চমৎকার বিষয়-আশয় আমাদের অগোচরে থেকে যাচ্ছে! এই যে হাদীসটা আমরা পড়লাম, একটা জীবনকে অর্থবহ করার জন্যে কী বিপুল শিক্ষা তাতে রয়েছে! জীবনে সফল হওয়ার জন্যে অর্থহীন কাজ বর্জনের কোনো বিকল্প নেই। যা কিছু অর্থবহ, যা কিছু অর্থপূর্ণ, যে কাজের একটি সুন্দর ও ইতিবাচক আবেদন আছে, যা করলে প্রাপ্তির খাতায় শূন্য ওঠে না, একজন সফলতাপ্রত্যাশী মানুষ সেটাই তো করবে! আল্লাহর দীন এই বিষয়টাতে সর্বোচ্চ জোর দেয়। সেজন্যেই তো পাখিশিকারের মতো ছোটখাটো কাজেও একটা উদ্দেশ্য থাকার প্রয়োজন হচ্ছে! খাবারের প্রয়োজনে হালাল উপায়ে কোনো পাখির গোশত খাওয়া আমার জন্যে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু নিছক বিনোদন বা সময় কাটানোর জন্যে উদ্দেশ্যহীন পাখিশিকারকে আমার জন্যে অবৈধ করা হয়েছে। কী সুন্দর নিয়ম আল্লাহ তা'আলার!

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন, একজন লোক কবুতরের পেছনে ছুটছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

شيطان يتبع شيطانة [৩৫]

"এক শয়তান ছুটছে আরেক শয়তানের পেছনে।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই কথাটুকু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আক্ষরিক অর্থ নিয়ে অনেকে এই হাদীসের ভিত্তিতে কবুতর প্রতিপালনকে নিষিদ্ধ মনে করেন, কেউ কেউ তো কবুতরকে শয়তানের প্রেতাত্মা বা অশুভ কিছু ভেবে থাকেন। আসলে তা নয়। সুনান আবূ দাউদের সবচে' সমাদৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ عون المعبود আমাদেরকে জানাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিটিকে শয়তান বলে অভিহিত করার কারণ হলো, সে কবুতর নিয়ে খেল-তামাশায় মত্ত থাকতো, আবশ্যকীয় কাজ থেকে দূরে থেকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলিতেই মশগুল থাকতো। অন্যদিকে কবুতরটিকে শয়তান বলেছেন এ জন্যে যে, কবুতরটিকে নিয়ে মেতে থাকার কারণে ঐ ব্যক্তির অন্তরে এরকম গাফলতি সৃষ্টি হয়েছে, ফলে লোকটি আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকছে[৫৪]।

খেল-তামাশায় মত্ত হয়ে 'ইবাদাতে কোনো ব্যত্যয় ঘটার আশঙ্কা না থাকলে, আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘনের আশঙ্কা[৫৫] না থাকলে কবুতর প্রতিপালনে কোনো বাধা নেই। বাচ্চা উৎপাদন, ডিম আহরণ বা পত্রের আদান-প্রদানে কবুতরের ব্যবহার বিধিসম্মত।[৫৬]

খেয়াল করে দেখো, প্রয়োজন হলে পাখিশিকার করে গোশত খাওয়া বৈধ, কিন্তু বিনোদনের উদ্দেশে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। একইভাবে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কবুতরকে ব্যবহার করায় নিষেধ নেই, কবুতরের মাধ্যমে সব ধরনের বৈধ উপকার গ্রহণও সংগত, কিন্তু একে নিয়ে নিরর্থক খেল-তামাশায় মত্ত হওয়ার অনুমতি নেই। তোমাকে, আমাকে অর্থহীনতা থেকে বাঁচানোর জন্যে ইসলাম কত সূক্ষ্ম বিধি প্রণয়ন করছে, বুঝতে পারছো তো?

শুধু পাখিশিকার বা পাখি নিয়ে খেল-তামাশার ক্ষেত্রেই নয়, যেকোনো কাজেই ইসলাম আমাদেরকে অর্থহীনতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে উৎসাহ দেয়। একটা উদাহরণ নাও। পার্থিব ও অপার্থিব দুই জীবনেই যারা সফল মুমিন, তাদের কিছু পরিচয় আল্লাহ কুরআনে দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি পরিচয় হচ্ছে:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

"এবং যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে।"[৫৭]

আতহার বাকি পরিচয়গুলোও শুনতে চাইলো। তাকে বললাম, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, সবগুলো বৈশিষ্ট্য এক এক করে শোনানোর সময় হবে না আমাদের। এক কাজ করিস, মাগরিবের সালাতের পর যখন পড়তে বসবি, কুরআন খুলে সূরা মুমিনূন-এর ০১ থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত অর্থসহ পড়ে ফেলিস! আল্লাহ এখানে সফল মুমিনদের চমৎকার কিছু গুণের কথা বলেছেন। এগুলো এমন কোনো শর্ত নয়,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যা মেনে চলা তোর জন্যে কষ্টসাধ্য। একদম সহজ, একেবারে জীবনঘনিষ্ঠ। পড়তে আবার ভুলে যাস না কিন্তু!

আতহার কথা দিলো, সে আয়াতগুলো পড়ে নেবে।

সে আরেকটা চমৎকার ভাবনার সূত্রপাত করলো। এই আয়াতের প্রেষণায় আমরা যদি সবকিছুকেই অর্থপূর্ণ হওয়া বা না হওয়ার ভিত্তিতে ভাগ করে নিই, তাহলে জীবনে অনেক মূল্যবান সময়ই বেঁচে যাবে, যা অনেক ফলপ্রসূ কাজে ব্যয় করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন অযথা আড্ডায় ডুবে যাওয়ার পর চিন্তা করবো, এই খাপছাড়া বাক্যালাপ ও হাস্যরস দিনশেষে আমাদের জন্যে কোনো অর্জনই বয়ে আনবে না, তখন আমরা সময় অপচয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অনুঘটক থেকে নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নিতে পারবো। এবার এই সময়টাকে সার্থক করে তোলার জন্যে আত্মগঠনমূলক বা জনকল্যাণমূলক যেকোনো কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারি। অন্যদিকে দিনরাতের সিংহভাগ সময় যখন আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ফেসবুকের হোমপেজ স্ক্রল করে কাটিয়ে দেই, তখন এর অর্থহীনতা উপলব্ধি করতে পারলেই আমরা এর নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারবো, আর সেসময়টা কোনো অর্থপূর্ণ বই পড়ায় মনোযোগী হতে পারবো। এর অর্থহীনতা ও ফলাফলশূন্যতা উপলব্ধি করার একটা উপায় হলো: দুই ঘণ্টা ধরে একটি বই পড়ার পর আমার কী অর্জন হয়, আর দুই ঘণ্টা ফেসবুকিংয়ের পর আমার অর্জনে কতটুকু যোগ হয়, দুটোকে পাশাপাশি রেখে চিন্তা করা।

ঠিক এভাবে সবকিছুতেই অর্থহীনতা ও অর্থপূর্ণতার বিপ্রতীপ সম্পর্ককে বুঝতে পারলেই জীবনটা সুবিন্যস্ত হয়ে যায়। সার্থকতা ও অনর্থকতার বিপরীতমুখী প্রভাবের এই একটা উপলব্ধিই গোটা জীবনকে পরিপাটি করে তুলতে পারে। ইসলাম এজন্যেই সফলতার মাপকাঠিগুলোর মধ্যে 'অনর্থক কাজ বর্জন করা'কেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আতহার নিজ থেকেই বললো, 'দ্যাখ বন্ধু, আল্লাহর এই সুন্দর বিধানগুলা নিজের ভিত্রে প্রয়োগ করতে পারলে আখিরাতের জীবন তো বটেই, দুনিয়ার জীবনটাও কত সুন্দর আর গোছালো হয়া যায়! এতদিন ক্যান যে এসব নিয়া ভাবি নাই!'

আতহার ভাবতে থাকুক।

আমরা এই ফাঁকে একটা দারুণ সুন্দর দু'আর সাথে পরিচিত হই। অর্থহীনতা থেকে পরিত্রাণের জন্যে আমাদের রাসূল ﷺ কিন্তু সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিলেন! জীবনকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থবহ করার জন্যে রাসূলুল্লাহর আদর্শ আমাদের জন্যে অনুসরণীয় এজন্যেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সার্থক জীবন গঠন করার সব রকম উদাহরণই রেখে গিয়েছেন।

আল্লাহর কাছে সবসময়ই অর্থহীনতা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন তিনি। কী সুন্দর দু'আ তিনি করতেন!

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا [৫৮]

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই সেই জ্ঞান থেকে, যা কোনো উপকারে আসে না।

আমি পানাহ চাই সেই অন্তরের অধিকারী হওয়া থেকে, যে অন্তর আপনাকে ভয় করে না।

আমি পানাহ চাই সেই আত্মা থেকে, যা সর্বাবস্থায় তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে না।

আমি পানাহ চাই সেই দু'আ থেকে, যে দু'আর কোনো প্রত্যুত্তর আসে না।"

কত সুন্দর চাওয়া তাঁর! দু'আটা মুখস্থ না থাকলে করে ফেলা উচিত।

আমরাও এমন জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবো, যে জ্ঞান নিছক কিছু 'তথ্য' জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং জীবনের অর্থবহতা বয়ে আনতে সহযোগী হবে। আল্লাহর কাছে এমন জ্ঞান আমরা চাইবো, যে জ্ঞান আমাদের দুনিয়ার জীবন সংযত করবে, আখিরাতের প্রস্তুতিকে সংহত করবে।

আল্লাহর ভয় থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া অন্তর থেকেও আমরা নিরন্তর পানাহ চাইবো তাঁর কাছে। এই ধরনের অন্তর আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের যাত্রাকে মন্থর করে দেয় ধীরে ধীরে। অল্পতে তুষ্ট হয় না, আবার অনেক পেয়েও রুষ্ট হয়, এমন দুষ্ট আত্মাকে পাত্তা না দেয়ার জন্যে স্থিতপ্রতিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। একইসাথে এই আত্মার বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করার জন্যে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। নচেৎ জীবনের অর্থ খোঁজার সব প্রচেষ্টাই ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে এর সংক্রমণে।

সূর্য এখন অস্তপাটে চলে যাচ্ছে। মাগরিবের আযানের সময় অত্যাসন্ন। পশ্চিমদিগন্তে গোধূলির আবির রং আজকে ততটা তীব্র দেখাচ্ছে না। কৃষকেরা ঘরমুখো। চারণক্ষেত্র থেকে সারি বেঁধে গোয়ালে ফিরছে গরুর পাল। পাখিরাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে যাচ্ছে যার যার নীড়ে। আমরা দুজন বিলের নাড়া মাড়িয়ে মসজিদের দিকে রওনা হলাম। সূর্যকিরণ ক্রমশ নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হতে হতে ডুবে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। দোয়েলের গান শোনা যাচ্ছে আবারও। নীড়ফেরা বেশ কিছু পাখিকেই সন্ধ্যায় এরকম গলা ছেড়ে দিতে দেখা যায়। জীবনমুখর দিন কাটিয়ে দিনশেষে তার প্রভুর শোকর করছে নিশ্চয়। একটা হাদীসের কথা মনে পড়ে যায়:

لو أنكم توكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، وتروح بطاناً

"যদি তোমরা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তোমাদেরকে সেভাবেই রিযক দিতেন, যেভাবে পাখিরা রিযকপ্রাপ্ত হয়। সকালে তারা খালিপেটে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যায় তৃপ্তিভরে পেট পূর্ণ করে নীড়ে ফিরে আসে।"[৫৯]

এই পাখিগুলো নীড় থেকে যখন প্রত্যুষে বের হচ্ছে, তখন একেবারে অভুক্ত। রিযকের সন্ধানে তারা বেরিয়ে যায়। আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে তারা। উড়ে যায় অনিশ্চিত গন্তব্যে, কিন্তু হৃদয়টা নিশ্চিত রিযকপ্রাপ্তির ব্যাপারে থাকে নিশ্চিন্ত! আল্লাহ তাদের রিযকের ব্যবস্থা করে দেন। সন্ধ্যায় যখন ঝাঁক বেঁধে ফিরে আসে, তখন কেউ অভুক্ত থেকে ফিরে আসে না। 'তাওয়াক্কুল' তথা আল্লাহর ওপর ভরসা ও আস্থা দৃঢ় রাখার জন্যে পাখিরা হতে পারে আমাদের জন্যে উত্তম উদাহরণ। নিখাদ তাওয়াক্কুল মানুষকে নিরাশ করে না। আল্লাহ তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে ও কল্পনাতীত পরিমাণে রিযক দিয়ে থাকেন। কুরআনও বলছে:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্যে তিনি সংকট উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন, এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযকের ব্যবস্থা করে দেন, যার কথা সে কল্পনা করেনি। যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৬০]

তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে নবিজি ﷺ সম্ভবত এ কারণেই পাখিদের উদাহরণ এনেছেন যে, এখানে উল্লিখিত দিকগুলোর সবটাই পাখিদের মধ্যে অনুপুঙ্খভাবে দেখা যায়। পাখিরা আল্লাহর বিধানের প্রতি বাধ্যগত, তাঁর হুকুম পালনে সদা জাগ্রত, সুতরাং হর্ষ-বিষাদে আল্লাহই হয়ে যান তাদের জন্যে আশ্রয়। আবার কোথা থেকে তাদের রিযক আসবে, সে ব্যাপারে তারা আমাদের মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে না। কিন্তু তাদের চিন্তার আওতার বাইরে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযকপ্রাপ্ত হয়। এটা এজন্যেই সম্ভব হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণমাত্রায় ভরসা করে, আল্লাহও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান। রাসূলুল্লাহর সেই হাদীসের ভাষ্যমতে, পাখিদের মতো যদি আমরাও যদি সত্যিকারের তাওয়াক্কুল ধারণ করতে পারি, তাহলে আমরাও আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযকপ্রাপ্ত হতে পারি। এরপর উল্লিখিত কুরআনের আয়াতও এ বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন দিচ্ছে। তাহলে তাওয়াক্কুলের এ অভূতপূর্ব কার্যকারিতা নিয়ে আর সংশয়ের অবকাশই থাকলো না।

তবে একটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা চাই, পাখিরা কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করে নীড়ে বসে থাকেনি। তারা আল্লাহর নাম নিয়ে ঠিকই ডানা মেলে দিয়েছে। রিযকের সন্ধানেও বেরিয়েছে, আল্লাহর ওপর ভরসাও রেখেছে। সুতরাং কেউ যদি 'তাওয়াক্কুল' এর ধারণাকে ভুলভাবে বুঝে নেয়, তাহলে পস্তানোর আশঙ্কা আছে। রিযকের জন্যে অথবা অন্য যেকোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর ভরসা রাখা এবং তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা রাখার ব্যাপারে যেমন পরিপূর্ণ মানসিকতা থাকা চাই, একইসাথে সেই রিযক ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে আমার দিক থেকে সব প্রস্তুতি ও আয়োজনও ঠিক রাখা চাই। একটা গল্প বললে ব্যাপারটা হয়তো আরও স্পষ্ট হবে।

একদিন এক বেদুঈন উটে চড়ে মাসজিদ নাবাওয়িতে এলেন। অদূরে উটটিকে রেখে তিনি নবিজি ﷺ-এর কাছে এলেন। তাঁর চিন্তা হলো, উটটি আবার হারিয়ে যাবে না তো! এ অবস্থায় উট যদি কোথাও চলে যায়, তাহলে তো তাঁর মরুচারী জীবন কঠিন হয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি উটটিকে এমনিতে রেখে দেবো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করবো; নাকি উটটিকে বেঁধে রেখে আল্লাহর ওপর ভরসা করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: اعقلها وتوكل "তুমি বরং আগে উটটিকে বাঁধো, এবার আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রাখো।"[৬১]

বোঝা গেলো, উপায়-উপকরণের অবলম্বন তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি কোনো বিষয় নয়, বরং এই অবলম্বন ব্যতিরেকে 'তাওয়াক্কুল' পরিপূর্ণ হয় না। উপকরণের অবলম্বন প্রসঙ্গে শুধু নবিজি ﷺ নির্দেশনা দিয়েছেন, এমন নয়, বরং আল্লাহর নীতিই হচ্ছে বান্দার কর্মপ্রচেষ্টা ও তার পেছনে আন্তরিক অভিনিবেশ দেখে বান্দাকে সাহায্য করা, তার তাওয়াক্কুলের প্রতিদান দেওয়া। কুরআন থেকে একটা উদাহরণ আনা যেতে পারে। নূহ ﷺ-এর জাতি যখন অবাধ্য হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে এক প্রলয়ংকরী তুফান ও সর্বগ্রাসী বন্যা প্রেরণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। নূহ ﷺ-সহ অন্যান্য ঈমানদার তিনি একটি কিশতি বানানোর আদেশ দিয়েছিলেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছিলো, জমিন ফেটেও পানি বেরোচ্ছিলো। এরকম সর্বসন্তাপী ভয়াবহ বর্ষণের মধ্যেও আল্লাহ তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেই টালমাটাল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে আল্লাহর ইচ্ছায় কাঠপেরেকনির্মিত[৬১] একটি নৌকাই ছিলো তাদের আশ্রয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ চাইলে কোনো জলযান বানানো ব্যতিরেকেই তাঁদেরকে রক্ষা করতে পারতেন। সর্বশক্তিমান ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মহান আল্লাহর জন্যে এই কাজটি মোটেও কঠিন কিছু নয়। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রথমে একটি উপকরণের আশ্রয় নিতে বলেছেন। এরপর সেই উপকরণকে আল্লাহ তা'আলা ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর করুণা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। আল্লাহর নির্দেশিত উপকরণকে তারা অবলম্বন করেছেন, সেই অবলম্বনের ওপর এসেছে আল্লাহর সাহায্য।

সুতরাং এটা মোটেও অস্পষ্ট নয় যে, পার্থিব উপায়-উপকরণের প্রস্তুতি ও আয়োজন সম্পন্ন করা এবং একে অবলম্বন করে আল্লাহর ওপর ভরসা করাটাই তাওয়াক্কুলের দাবি, তদুপরি আল্লাহর নীতিও।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ। বুখারীর বর্ণনা ও 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ﷺ-এর জবানিতে আমরা একটি গল্প শুনতে পারি। ইয়ামানের অধিবাসীরা যখন হাজ্ব করতে আসতো, তখন কোনো পাথেয় তাদের সঙ্গে থাকতো না। তাঁরা চিন্তা করতেন, আল্লাহর ওপর আমরা তাওয়াক্কুল করেছি, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। এরপর একসময় নিরুপায় হয়ে মানুষের কাছে হাত পাততেন। তখন আল্লাহ একটি আয়াত নাযিল করে তাদেরকে পাথেয় সাথে নিয়ে আসার জন্যে আদেশ করলেন। [৬৩]

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

"তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও। তবে তাক্বওয়াই সেরা পাথেয়।"[৬৪]

আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, শুধু তাওয়াক্কুল করে বসে থাকা উচিত নয়, হাজ্বে আসার সময় প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নিয়েই আসতে হবে। একইসাথে এটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন, মুমিনের জীবনে তাক্বওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

এরপরেও কিছু লোক তাওয়াক্কুলের ধারণাটিকে আংশিক বোঝার কারণে পাথেয়বিহীন হাজ্বযাত্রা করতে থাকলো। 'উমার ﷺ যখন খলীফাহ, তখনো এই ধারাটি অব্যাহত ছিলো। ইয়ামান থেকে আসা এরকম কিছু লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কারা?

তাঁরা বললেন: আমরা হলাম মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহর উপর ভরসাকারী)।

'উমার বললেন: মুতাওয়াক্কিল নও, তোমরা হলে মুত্তাকিল (অন্যের উপর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নির্ভরশীল)।

এরপর তাদেরকে সত্যিকারের মুতাওয়াক্কিলের পরিচয়টি দিয়েছেন এভাবে:

إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض، ويتوكل على الله

"মুতাওয়াক্কিল তো সে-ই, যে জমিনে বীজ বপন করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে।"[৬৫]

আসলেই তো, বীজ বপন না করেই যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে থাকা হয়, তাহলে ফলের আশা করা বৃথা। যথাযথ নিয়মে বীজ বপন করতে হবে, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে, তাঁর কাছে চাইতে হবে, যেন অঙ্কুরোদ্গম থেকে শুরু করে পরিণত গাছে রূপান্তরিত হওয়া এবং কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তি পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিকভাবে ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

সবক্ষেত্রেই এ জিনিসটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি যখন ছাত্র, তখন জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে এবং কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবো এবং তাঁর ফায়সালায় আস্থা রাখবো, সাথে সাথে পড়াশোনাতেও মনোযোগী ও যত্নবান হবো। এটাই তাওয়াক্কুল। আমি যখন ব্যবসায়ী, তখন ব্যবসায় বরকতের জন্যে আল্লাহর ওপর ভরসা করবো, একইসাথে হালাল উপায়ে রুজি-রোজগারের প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখবো। এটাই তাওয়াক্কুল।

নীড়ফেরত পাখির কল্পডানায় ভর করে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আজকের সব গল্প কিন্তু পাখিদের কেন্দ্র করে। সুতরাং পাখিদের কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত। মাগরিবের সালাত সারার পর আমি ও আতহার যার যার পথে চলে গেলাম। যাওয়ার সময় কিন্তু সূরা মুমিনূনের আয়াতগুলো পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তোমাকেও কি স্মরণ করিয়ে দেয়া লাগবে?

আজকে যেহেতু সন্ধ্যা হয়েই গেলো, পাখি দেখার সুযোগ নেই। আগামীকাল পাখি দেখার জন্যে শালবনে যাওয়ার নিয়ত আছে, ইন শা-আল্লাহ। শালবনে কী কী পাখির দেখা পাই, তাদের কাছ থেকে কী কী শিখতে পারি, সেসব নিয়ে কালকেই গল্প করা যাবে।

আজকে রাতটা কি তাহলে গল্প ছাড়াই কেটে যাবে? না, তা হবে কেন? ঐ যে দূরে একটা ডাহুকের ডাক শোনা যাচ্ছে। বাতাসে কান পাতলেই শুনতে পাবে। বেতস বনের কোনো ঘোলাটে ডোবায় হয়তো কচুরিপানার ফাঁক থেকে পাখিটা ডাকছে। 'কোয়াক কোয়াক' করে যখন পাখিটা করুণ সুরে ডাকছে, তখন একটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিরহের অধরা আমেজ শ্রবণেন্দ্রিয়ের আশেপাশে ঘুরতে ঘুরতে পরানের গহিনে ঢুকে যায়। জীবনানন্দের 'ডাহুকী' কবিতা হঠাৎ করে প্রাসঙ্গিক হয়ে যায় বিরহকাতর হতে যাওয়া মননে:

"মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা অবনতমুখী,—
নিদাঘের রৌদ্রতাপে একা সে ডাহুকী
বিজন তরুর শাখে ডাকে ধীরে ধীরে
বনচ্ছায়া-অন্তরালে তরল তিমিরে!
—আকাশ মন্থর মেঘ, নিরালা দুপুর!
—নিস্তব্ধ পল্লীর পথে কুহকের সুর
বাজিয়া উঠিছে আজ ক্ষণে-ক্ষণে!
সে কোন পিপাসা কোন ব্যথা তার মনে!"[৬৬]

বিরহ ও বিয়োগের স্বয়ংপ্রকাশের ক্ষেত্রে কবিদের কবিতায় ডাহুক অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে অনেকভাবে। বিশেষত জীবনানন্দ ও আল মাহমুদের কবিতায়। ডাহুকের একটানা ডাক গভীর রাতে ঘুমন্ত প্রকৃতির বুক ফালি ফালি করে কেটে কেমন যেন একটা বেদনার্ত আবেশ প্রযুক্ত করে দেয়। শোকাকুল কবিমনে প্রতীক বা রূপক হিসেবে ডাহুকের উপস্থিতি তাই বিচিত্র কিছু নয়। শোনা যায়, সঙ্গীকে না পেয়ে রাতভর করুণ আওয়াজে ডাকতে ডাকতে ভোর হতে না হতেই গলায় রক্ত উঠার কারণে ডাহুকের মৃত্যু হয়। বিরহের ছায়াশ্রিত কবিতায় ডাহুক কি এজন্যেই অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে আসে বারবার?

আমি কান পেতেই আছি। নিস্তব্ধ রাতের মাঝখানে ডাহুকের একটানা সুর অনেকক্ষণ ধরে থেমে আছে। একটু পরে আবার শুরু হলো। ভাবনার অন্য পিঠে চোখ যায় আমার। এই নিঝুম নীরব রাতে শুধু ডাহুকেরই কথা বলে যাওয়া, ঘুমন্ত পৃথিবীর কোলে শুধু তারই জেগে থাকা, অনুভূতিশূন্য একটি আবহের মাঝখানে কেবল তারই রোদন ধ্বনিত হতে থাকা—আমার কল্পনায় ভিন্নতর একটা দৃশ্যকাব্য রচনা করে যায়। এই ভিন্নতর অনুভবকে গভীর থেকে ছুঁতে পেরেছিলেন কবি ফররুখ। তাই তার 'ডাহুক' কবিতার কোলে গিয়েই আশ্রয় নেয় আমার বিমূর্ত ভাবনা:

"রাত্রিভর ডাহুকের ডাক...
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দিঘি অতল সুপ্তির!
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশা খেলা আজ পড়ে থাক,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।"[৬৭]

এই পঙ্‌ক্তিগুলো ভরাট কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে কল্পিত দৃশ্যপট আমার আরও কাছে চলে আসে। আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পাই, বৈষয়িক জীবনের হিসেব-নিকেশের খাতা পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়ে ঘরের কোণায় জায়নামায বিছিয়ে দিয়েছেন একজন আল্লাহপ্রেমী। করুণ আর্তিতে ডাহুক যেমন একাকী সুর তুলে যাচ্ছে, তিনিও হৃদয়ের ব্যথা-বেদনাগুলো তাঁর প্রভুকে সমর্পণ করছেন একাকী নিভৃতে। বেতস বনে এখন ডাহুক ছাড়া কেউ জেগে নেই, আর মানুষের জনপদে তিনি অথবা তাঁর মতো দুয়েকজন ছাড়া তেমন কেউ জেগে নেই। বিরহের গভীরতর প্রকাশে ডাহুকের গলায় রক্ত ঝরছে, এদিকে জমা হওয়া পাপের ক্ষমা প্রার্থনায় জায়নামাযে আসীন ব্যক্তিটির দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। ডাহুকের ডাকে তাই ভেসে আসে রাত্রিজাগরণকারী একজন সমর্পিত বিশ্বাসী মানুষের নিবেদনের সুর। ফররুখের 'ডাহুক' কবিতার আরও কয়েকটা ছত্র এই কল্পনার স্পন্দনকে দেয় নতুন মাত্রা:

"এই ম্লান কদর্যের দলে তুমি নও,
তুমি বও
তোমার শৃঙ্খলমুক্ত পূর্ণ চিত্তে জীবনমৃত্যুর
পরিপূর্ণ সুর।"[৬৮]

মহাজাগতিক সংগীতের যে সুর শেষরাত্রির সেতারে বাজে, পূর্ণতার দাবি করা শুধু তারই সাজে। কদর্যতার ভারী বাতাসে শুদ্ধতার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে তাই একদল মানুষ জেগে থাকেন, জায়নামাযের স্যাঁতসেঁতে জমিন তাদের অশ্রুতে স্নিগ্ধ হতে থাকে। রাত্রির শেষ প্রহর জুড়ে আবেদন ও সমর্পণের যে কোরাস প্রকৃতির নীরবতায় ধ্বনিত হয়, ডাহুকের একটানা সুর তারই অংশবিশেষ। এই সুরের আবেদন ফররুখের অনুভূতি অতিক্রম করে যায়নি।

ডাহুকের মতো আরও কিছু নৈশঅনুষঙ্গ এই মহাসংগীতকে ধারণ করে যায়। শেষরাত্রির গল্প লেখার জন্যে আহ্বান করে যায় আমাদের, যে গল্পের প্রতিলিপি সহসাই পৌঁছে যায় আরশের ঠিকানায়। রাতের বুকে ছড়িয়ে থাকা এরকম কী কী অনুষঙ্গ থাকতে পারে, সেগুলোকে একত্র করে একটা কবিতা লেখার কিঞ্চিৎ আকিঞ্চন:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"একটানা সুরে একটা ডাহুক
ডাকছে ভীষণ, ডাকতে থাকুক।
ডাকতে ডাকতে হোক মৃতপ্রায়
গলায় উঠুক রক্ত
আজ রাতে তার ডানায় নামুক
তাহাজ্জুদের অক্ত।

যামিনীতে ফোটা কামিনী-সুরভী
অন্তরে তার বাজাক পূরবী
সিজদাবনত শিউলির ঘ্রাণ
মাতাল করুক রাতজাগা প্রাণ
ঝরে পড়া বেলি পায় না কাজ?
ওরা হয়ে যাক জায়নামাজ।

শেষ রাতে যদি একটু তাকাও
দেখবে, রুকুতে গাছের শাখাও!
ঝুঁকেছে তারকা আকাশের বুকে
চলো, আমরাও পড়ি তবে ঝুঁকে?

তাসবি জপছে হাসনাহেনারা
পরাগেরা ভেসে বাতাসে বেড়াক
সেই বাতাসের শীতল ঝাপটা
নিভাক মনের কামনা-চেরাগ।

আজকে দু-চোখে বৃষ্টি ঝরুক
হৃদয়ে আসুক অশ্রু-শ্রাবণ
পাপের কালিমা ধুয়ে মুছে শুধু
শুদ্ধাচারের নামুক প্লাবন।"[৬৯]

রাত গভীর হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে গেলাম আমরা সবাই। সুবহে সাদিকের খানিক আগে শোনা গেলো মোরগের ডাক। ফজরের আযানে ঘুম ভাঙলো আমাদের। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে অনেকে আরেকটু আগেই বিছানা ত্যাগ করেছেন। শেষ রাতের সালাতে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা, করুণার ভিখারি হয়ে হাত পেতেছেন আল্লাহর কাছে। ঐ যে, ডাহুক হয়েছেন তাঁরা! আমরাও তো চাইলে মাঝেমধ্যে ডাহুক হতে পারি। পারি না?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যথারীতি ফজরের জামা'আত সেরে চলে এলাম। পিচ্চি ছেলেমেয়েরা রেহাল ও গিলাফসমেত কুরআন বুকে নিয়ে মক্তবের দিকে আসছে। কারও কারও হাতে জুয আম্মা'র (ত্রিংশত্তম পারা) খণ্ডিত সিপারা। কিছু পিচ্চির মাথায় কিশতি টুপি। কারও কারও টুপি মাথার চেয়ে বড়ো বিধায় হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ পরপর মাথায় হাত দিয়ে সতর্ক থাকছে, যেন টুপিটা না পড়ে যায় কিংবা বেহাত না হয়। এই চিরচেনা দৃশ্যগুলো কত গ্রামে হারিয়ে যেতে বসেছে! প্রতিদিন কত মক্তব বন্ধ হচ্ছে! এ গ্রামেও মক্তবের সেই জৌলুস আর নেই। শিশুদের উপস্থিতি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আর মাত্র একদিন থাকবো গ্রামে। শালবনের অভিযানটা আজকে সেরে ফেলতে হবে। একবার ভাবলাম, আতহারকে সাথে নেব কি না। কী জানি ভেবে পরে ঠিক করলাম, একাই যাবো।

সূর্যের আলো একটু সাদা হতে শুরু করার সাথে সাথে আমি রওনা হলাম। যেতে যেতে শুষ্কপ্রায় ডোবা ও জলাশয়গুলোতে অনেকগুলো বক দেখা হয়ে গেলো। কপট ব্যক্তিদের 'বকধার্মিক' বলে সম্বোধনের একটা রেওয়াজ আছে পণ্ডিতমহলে। আপাতদৃষ্টিতে খুব নিরীহ সেজে দাঁড়িয়ে থাকলেও মাছ শিকার করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। ধ্যানমগ্ন সাধুর বেশে দাঁড়িয়ে থাকা, এরপর শিকার সামনে এলে তাকে বধ করা—মুহূর্তের ভেতরে বকের এমন পরিবর্তনধর্মী চরিত্রের দিকে লক্ষ করে হয়তো বাগধারাটির উৎপত্তি।

বনের কাছাকাছি পৌঁছতেই বেশ কিছু পাখির কিচিরমিচির রব শোনা গেলো। খুশি হওয়ার পরিবর্তে মনটা বিষণ্নতায় আচ্ছাদিত হলো। কারণ, শৈশবে এই বন আরও ঘন গাছগাছালিতে পূর্ণ ছিলো, নানা প্রজাতির পাখিদের সমারোহ ছিলো আরও অনেক বেশি। মানুষ যদি জানতো, নিজের হাতে বন উজাড় করে সে মূলত নিজের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলছে!

প্রবেশমুখেই নজরে পড়লো দুটো সবুজ টিয়া। শৌখিন মানুষদের অন্যতম পছন্দ এই পাখি। মানুষের শিখিয়ে দেয়া কথা আওড়াতে পারে বলে আনন্দ দেয়ায় তার জুড়ি নেই। অনেকদিন পর এদের টুই-টুই-টুই শব্দ শুনছি। বেশ ভালোই লাগছে। আমার আবার নতুন নাম দেয়ার বাতিক আছে, যা এই গল্পের আরও কয়েক জায়গায় দেখেছো। ইচ্ছে হচ্ছে, এটাকেও একটা নাম দিয়ে দিই। লক্ষ করে দেখবে, চন্দনা টিয়ার ঠোঁটের গড়ন ও মাথার দিকে তাকালে পুরোপুরি না হোক, কিছুটা হলেও ঝুঁটিওয়ালা মোরগের চেহারা মনে পড়ে। কিন্তু নাম পরিবর্তনের ইচ্ছেটা আমি দমিয়ে রাখছি। প্রথমত, প্রাণিবিজ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসিত হওয়ার ভয়, দ্বিতীয়ত এত সুন্দর গঠন ও অনন্য আকৃতির একটা পাখিকে বদমেজাজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মোরগের সাথে কোনোদিক থেকে মেলানোর জন্যে মন সায় দিচ্ছে না।

মফস্বল শহরগুলোতে রাস্তার কিনারে অথবা গ্রাম্য হাটগুলোতে বাবলা গাছের তলায় কিছু গণককে দেখা যায় টিয়া পাখি নিয়ে বসে থাকতে। এদেরকে আগে থেকে কিছু নির্দিষ্ট কথা শিখিয়ে দেয়া হয়, সেগুলোই ঘুরেফিরে বলে থাকে। সরলমনা মানুষেরা এটাকে অলৌকিক কিছু ভেবে বসে। ভাগ্য গণনার জন্যে টিয়াওয়ালা-গণকের কাছে যায় তারা। শুধু টিয়া নয়, যেকোনো ধরনের গণকের গণনা বা জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী জানতে চাওয়া, বিশ্বাস করা আমাদের দীনে খুবই গর্হিত কাজ। এটা শির্কের অন্যতম রূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد [৭০]

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে যাবে এবং সে যা বলে তা সত্য বলে মেনে নেবে, ঐ ব্যক্তি যেন মুহাম্মাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবকে অস্বীকার করলো।"

কী ভয়াবহ ব্যাপার! এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত আমাদের। পত্রিকার পাতায় যেসব রাশিফল প্রকাশিত হয়, অনেকে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে নিয়ে দিনের কর্মসূচি বা মাসিক পরিকল্পনা ঠিক করতে দেখা যায়, যা কিনা ভয়াবহ পাপের কাজ। যেমন: কেউ রাশিফলের দিকে লক্ষ রেখে তার পূর্বনির্ধারিত যাত্রা বাতিল করলো— এটা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।[৭১]

যেকোনো মাধ্যমে গণক বা জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হওয়া কিংবা তাদের বক্তব্যে আস্থা রাখা কুফরির চিহ্ন। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহর বাণীকেই অস্বীকার করা হয়:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

"আপনি বলুন: আসমান ও জমিনের অদৃশ্যের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।"[৭২]

ভাগ্য বা অনাগত দিনের কর্মফল সবই অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ-সংক্রান্ত যেকোনো কৌতূহল মিটাতে কারও দ্বারস্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, অদৃশ্যের বিষয়ে আল্লাহর একচ্ছত্র জ্ঞানকে আমি স্বীকার করছি না। অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবহিত আছেন বা অবহিত করতে পারেন, এই ধারণা পোষণ করাটার অর্থ হলো আল্লাহর সাথে শির্ক করা। গণক বা জ্যোতিষীদের এসব ভিত্তিহীন কথা আমলে নেওয়া এতটাই গর্হিত ও নিন্দিত যে, এর জন্যে আল্লাহ কঠোর একটা বিধান দিয়েছেন। নবিজি ﷺ বলেছেন:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এলো এবং তাকে ভাগ্যসংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞাসা করলো, এরপর তার কথাকে সত্য বলে মেনে নিলো, ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোনো সালাত কবুল করা হবে না।"[৭৩]

সুতরাং, গণকের কাছে যাওয়া, রাশিফলে বিশ্বাস করা, জ্যোতিষীর পাথর আঙুলে পরা, এসবকিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা চাই। শির্কের মতো ভয়াবহ গুনাহের ব্যাপারে একটু বেশিই সতর্ক থাকতে হয়।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে পথ চলছি। বনের আরেকটু ভেতরে গিয়ে দেখি এখানে ওখানে অনেক মরা বাদুর পড়ে আছে। এরা রাতে ছাড়া কখনো বের হয় না। নিশ্চয় শিকারীরা রাতে শিকার করে চলে গেছে। হয়তো কিছুক্ষণ পর এসে বস্তা বেঁধে নিয়ে যাবে।

পল্লবনিবিড় বনের মাঝখানে একাই হাঁটছি। পাতার ফাঁক গলে সূর্যকিরণ আড়াআড়িভাবে ঢুকে মাটি ছুঁয়েছে। বাতাসের আনাগোনা খুব বেশি নেই। তাই বলে পরিবেশটা গুমোট হয়ে আছে, এমনটি নয়। একটা সুস্থির প্রকৃতি বিরাজ করছে বনজুড়ে। দুয়েকটা ময়না পাখির চাঞ্চল্য চোখে পড়েছে। খাঁটি বুনো পাখি হিসেবে এই পাখিটার রূপ-প্রকৃতি যেমন একেবারে মানানসই, পোষমানা পাখি হিসেবেও তাকে বেশ ভালোই মানায়।

মৃত বাদুর ও ময়না একইসময়ে পরিদৃষ্ট হবার পর একটা গল্প না বলে পারা যায় না। আমাদের দেশে মুন্সী মেহেরউল্লাহ নামের একজন বাগ্মী ছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে দলে দলে পাদ্রীরা আসতেন। সরলমনা মানুষদের বোকা বানানোর জন্যে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিতেন। বিভিন্ন জায়গায় উন্মুক্ত বচসার ব্যবস্থা করে সেখানে বিতর্ক করা হতো। অনেকসময় এমন শর্তও থাকতো, বিতর্কের ফলাফলের ভিত্তিতে বিজিতরা বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করে নিতে হবে। পাদ্রীদের এই তৎপরতার একটা সাফল্য, মহাকবি 'শ্রী মধুসূদন দত্ত'কে 'মাইকেল মধুসূদন' বানাতে পারা। তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়েছিলেন ঐ সময়টাতেই। তৎকালীন মুসলিম সমাজের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি 'মুন্সী মুহাম্মদ জমীরুদ্দীন' খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে হয়ে গেলেন 'জন জমীরুদ্দীন'। এভাবে যশোর অঞ্চলের আশেপাশে তাদের তৎপরতা যখন তুঙ্গে, তখন একজন স্বল্পশিক্ষিত মুসলিম দর্জি এতে ব্যথিত হন। নিজ উদ্যোগে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বীয় পড়াশোনা শুরু করে দেন তিনি। দর্জির কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাকেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় একাই শক্তিশালী তর্কবাগীশ হয়ে উদিত হলেন। একটি সমিতি করে তার উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতা নিয়ে সভা করতে লাগলেন। প্রয়োজনে কোথাও বচসার ডাক এলে মুন্সী মেহেরউল্লাহ তাদের সাথে তর্কযুদ্ধে উপনীত হতে লাগলেন। মেহেরউল্লাহর কাছে সবাই ধরাশায়ী হতে লাগলো। মুসলিমদের মধ্যে সাড়া পড়তে শুরু করলো, অনেকের ভুল ভেঙে গেলো। জন জমীরুদ্দীন পুনরায় মুহাম্মাদ জমীরুদ্দীন হয়ে মেহেরউল্লাহর সহযোদ্ধা হয়ে গেলেন। মোটামুটি এই হচ্ছে মুন্সী মেহেরউল্লাহর পরিচয়ের চুম্বকাংশ।

তো, যে গল্পটা বলতে চাচ্ছিলাম। আমাদের শৈশবে দাদুভাই ও দাদিমণিরা নাতিদের সাথে এসব গল্প হরহামেশাই করতেন। শেকড়ের ঘ্রাণ ও টান যেন মনে সবসময় জীবন্ত থাকে, সেজন্যে তাঁরা সচেতন ছিলেন। একদিন এক বচসায় খ্রিষ্টান তার্কিক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন মেহেরউল্লাহর দিকে। তিনি বললেন: ইসলাম ধর্ম হাস্যকর কথা বলে। ইসলাম মতে, পরকালে জাহান্নামের সংখ্যা সাতটি, আর জান্নাতের সংখ্যা আটটি। অথচ জাহান্নামীদের সংখ্যাই হবে বেশি। কারণ, পৃথিবীতে মুসলিমদের চেয়ে অমুসলিমদের সংখ্যা বেশি, আর ইসলাম বলে থাকে, মুসলিম না হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তদুপরি কিছু ইসলাম ধর্মাবলম্বীকেও নাকি সঠিকভাবে ধর্মপালন না করার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। এত বিশাল সংখ্যক মানুষের জন্যে জাহান্নাম রাখা হলো মাত্র সাতটি। এদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও জান্নাত রাখা হলো আটটি। এরচে' বড়ো কৌতুক আর কী হতে পারে?—এই বলে সবাই হাসাহাসি শুরু করে দিলো।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ ধীরে সুস্থে বললেন: বাদুর দেখেছেন জনাব?

: হ্যাঁ, দেখেছি।

: ময়না দেখেছেন জনাব?

: দেখেছি তো!

: দেখেন, রাতের বেলা শিকারীরা ত্রিশ-চল্লিশটা পর্যন্ত বাদুর শিকার করে। দিনের বেলা এসে একটা মাত্র বস্তায় সবগুলো বাদুরকে ঠাসাঠাসি করে ভরতি করে নিয়ে যায়। কিন্তু ময়না পাখি পোষার জন্যে আমরা একটা বিশাল খাঁচা কিনে নিয়ে আসি। পাখি মাত্র একটি, শুধু তার জন্যেই বস্তার সমান বিশাল এক খাঁচা। ঐদিকে বাদুর ত্রিশ-চল্লিশটি, কিন্তু সবকটার জন্যে মাত্র একটা বস্তা! এবার বলেন, এটা কি হাস্যকর শোনাবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সবাই চুপচাপ।

এবার মেহেরউল্লাহ বললেন: ঠিক সেটাই। যার যেমন কদর, যার যেমন মূল্য। আপনারা যারা বুক ফুলিয়ে বলেন, 'জাহান্নামে যাবো', আপনাদের মূল্য ঐ বাদুরগুলোর মতোই। আমরা যারা জান্নাতের স্বপ্ন দেখি, আল্লাহর কাছে আমাদের মূল্য ময়না পাখির মতোই। জান্নাতীদেরকে আদর-যত্ন করে প্রশস্ত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তাই তাদের জন্যে বরাদ্দ অনেক বেশি। জাহান্নামীদের ঠাসাঠাসি করে ভয়ানক শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে, এজন্যে তাদের বরাদ্দ এত অল্প।

উৎফুল্ল জনতা এরকম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ভীষণ আলোড়িত হলো। উপস্থিত পাদ্রীরা মাথা নিচু করে সভাস্থল ত্যাগ করলো।

মেহেরউল্লাহ এমনই বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন বাগ্মী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আরও জানা প্রয়োজন, তাঁর রচনাসম্ভারও পাঠ করা দরকার আমাদের। [৭৪]

'মেহেরউল্লাহ বনাম পাদ্রী' বচসার কাহিনি বলে শেষ করতে না করতেই অনতিদূরে কয়েকটা পাখির মধ্যে ঝগড়া লক্ষ করা গেলো। খেয়াল করে দেখলাম, এরা শালিক পাখি। ঝগড়া এদের নিত্যকালের অভ্যাস। এই চরিত্রের কারণে তাদেরকে পছন্দ না হলেও তাদের আরেকটা চরিত্র আমার পছন্দসই। তাদের জীবনযাপনে ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী কোনো পাখিকেই তারা ছেড়ে দেয় না। আকারে যত বড়ই হোক না কেন, তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। আকারে সামান্য বড়ো কাক, সেও শালিকের সাথে পেরে ওঠে না। তারও চেয়ে বড় আকারের চিল, সেও শালিকের কাছে ঘেঁষতে পারে না। এই তেজস্বিতা ও আত্মপ্রতিরক্ষার শিক্ষাটা মেরুদণ্ড-হারাতে-বসা উম্মাহর জন্যে খুব বেশি দরকারি।

কিছু পাতিকাকও দেখা গেলো বনের প্রান্তে। দুয়েকটা কাকের পালক উঠে গেছে। প্রকৃতিতে সবচে' নিবেদিতপ্রাণ ও স্বেচ্ছাসেবী পরিচ্ছন্নকর্মী হচ্ছে কাক। এজন্যে সাধুবাদ পাওয়ার হকদার ছিলো সে, কিন্তু বেরসিক মানুষ তাকেই যত নিন্দা করে। অবশ্য নিন্দারও একটা যৌক্তিকতা দাঁড় করানো যায়। বেলা-অবেলায় সে যেভাবে একটানা কর্কশ স্বরে ডাকে, তাতে ঘুমন্ত মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে, ধ্যানী মানুষের ধ্যানভঙ্গ হয়। স্কুলগামী ছোট ছেলেদের হাত থেকে শখের খাবার বা খেলনা ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার দুষ্কৃতিতেও সে অভিযুক্ত। কুরআনে একটা জায়গায় তার কথা এসেছে। আদম ﷺ-এর দুই সন্তান ছিলেন। তাদের নাম হাবিল ও কাবিল। তাদেরকে কেন্দ্র করেই সেই কাহিনি ঘটেছিল। কুরআনের বর্ণনা থেকেই গল্পটা জেনে নেয়া যাক:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"আদমের দুই পুত্রসন্তানের সত্যকাহিনি লোকদের জানিয়ে দিন। তারা দুজন কুরবানী দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হয়েছিল, অপরজনেরটা নয়। সেই অপরজন প্রথম জনকে বললো: আমি তোমাকে হত্যা করব। সে বললো: দেখো, আল্লাহ তো মুত্তাকী লোকদের (কুরবানীই) কবুল করে থাকেন। তা সত্ত্বেও তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে হাত বাড়িয়ে থাকো, আমি তোমাকে হত্যা করতে আমার হাত বাড়াবো না। কারণ আমি তো রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাচ্ছি, তুমি আমার ও তোমার দুজনেরই পাপ বহন করে জাহান্নামী হও। এটাই সীমালঙ্ঘনকারীদের কর্মফল। অতঃপর তার মানসিকতা উত্তেজিত হয়ে উঠল ভাইকে হত্যা করার জন্য। পরে তাকে সে হত্যা করল এবং এর ফলে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এরপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, কাকটি মাটি খুঁড়তে লাগল তার ভাইয়ের লাশ কীভাবে লুকাবে সেই পন্থা জানিয়ে দেবার জন্য। তখন সে বলে উঠল, হায়! আমি কি এই কাকটির থেকেও অক্ষম হয়ে গেছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ লুকোতেও পারছি না? ফলে আমি খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লাম।"[৭৫]

কাবিলের হাতে হাবিল নিহত হওয়ার এই ঘটনাই ছিলো পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম হত্যাকাণ্ড। পৃথিবীতে এর পর থেকে যতগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে, সেই পাপের একটি অংশ কাবিলের জন্যে বরাদ্দ। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل [৬৭]

"বিনা দোষে যে-মানুষই নিহত হবে, তার রক্ত থেকে আদমের সেই প্রথম পুত্রের ওপর একটা আবরণ বসবে। কারণ মানুষহত্যার রেওয়াজ প্রথম সে-ই চালু করেছে।"

আহারে বেচারা! এমন দুর্ভাগা কপাল তার! অন্যায় ও পাপের সূচনাকার্য যার হাতে, তার পদছাপ ধরে পরবর্তীকালে যত অন্যায়-পাপ সংঘটিত হবে সবকিছুর জন্যে তাকেও অপরাধী হতে হবে। অর্থাৎ কোনো অবৈধ কাজের সূচনা করলে সেই পাপ সহসাই তাকে ছাড়বে না, অনাদিকাল অব্দি পাপের ভাগ তাকে নিয়েই যেতে হবে! আমাদেরকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে এ ব্যাপারে। আমি যদি পাপ করি, সেটার হিসেব আল্লাহ এবং আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমার হাত ধরে যদি অন্য কেউ পাপকাজে লিপ্ত হয়, আমার দেখাদেখি কেউ গোনাহের কাজ শুরু করে, তাহলে পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণ ও ধরাছোঁয়ার বাইরে যাবে, কারণ পরবর্তী সকল পাপ আমার কাঁধে সওয়ার হতে থাকবে। অন্যকে পাপকাজে উদ্বুদ্ধ করা বা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পথ দেখানোর সময় আমাদেরকে এটা মাথায় রাখা চাই।

এই গল্প থেকে আরেকটা জিনিস আমাদের নজরে আসে। কাবিল এই যে ভয়াবহ অপরাধে জড়িয়ে পড়লো, তার পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে পরশ্রীকাতরতা। হিংসা খুবই ভয়ানক ও জঘন্য পর্যায়ের মনোবৃত্তি। এটা প্রাথমিকভাবে শুধু মনের মধ্যে পুষে রাখলেও এর তীব্রতা ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘনেও প্ররোচিত করে। যেটা আমরা হাবিল ও কাবিলের ক্ষেত্রে দেখেছি। এজন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إياكم والحسد ; فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب[৭৭]

"তোমাদের উচিত হিংসা পরিত্যাগ করা। কারণ হিংসা পুণ্যকাজকে ঠিক সেভাবেই বিনাশ করে দেয়, আগুন যেভাবে কাঠকে বিনাশ করে।"

আসমান ও জমিন উভয় স্থানে হিংসার মাধ্যমেই পাপকাজের সূচনা হয়েছে। আসমানে প্রথমবারের মতো আল্লাহর অবাধ্যতা হয়েছে ইবলীসের মাধ্যমে। এটা ছিলো আদম ﷺ-এর প্রতি তার হিংসামূলক মনোভাবের কারণে। জমিনের ওপরও আল্লাহর সীমারেখা প্রথম লঙ্ঘন করেছে কাবিল, সেটাও ছিলো ভাইয়ের প্রতি হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে।[৭৮]

সেই হিসেবে পৃথিবীর সমস্ত পাপের সূচনাস্থল হলো হিংসা; কারও প্রতি পরশ্রীকাতর হওয়ার সময় আমরা যদি এটুকুই স্মরণ রাখি, তাহলে নিজেদেরকে এই ভয়াবহ পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

এতক্ষণে নজরে পড়লো একটা লাজুক পাখি। জনসমাগমে এরা একদমই আরাম বোধ করে না। কিন্তু আড়াল থেকে নিজের কথা রাষ্ট্র করে বেড়ায়। এদের সাথে কবিদের একটা মিল আছে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ কবিই ব্যক্তিজীবনে নিভৃতচারিতা পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁর রচনা নিভৃত হয়ে থাক, এটা পছন্দ করেন না। আড়ালে জীবনযাপন করতে পছন্দ করলেও তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্ম ছড়িয়ে দিতেই ভালোবাসেন। নিজের একটা আপন জগৎ গড়ে তুলতে হয় কবিকে, যেখানে কারও সহজ প্রবেশাধিকার থাকে না, অন্যদিকে তাঁরা যা রচনা করেন, সেগুলো নিয়ে গড়ে উঠা তার সৃষ্টিজগতটাকে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখেন, সেখানে পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত আনাগোনা কামনা করেন। ফলত কবিদের যাবতীয় নৈঃশব্দ্য কবিতায় এসে শব্দ করেই কথা বলে। ব্যতিক্রম উদাহরণও টানা যাবে। তবে আমাদের গল্প সেসব নিয়ে নয়, আমরা লাজুক পাখিটাকে নিয়েই গল্প চালিয়ে যাই। এই পাখিটার নাম শ্যামা।

সুরের এত কারুকাজ, গায়কি ভঙ্গিতে এত উত্থান-পতন, গলার স্বরে এত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুমিষ্টতা কেমন একটা তন্ময়তার মধ্যে নিয়ে যায়। তবে শ্যামার গান শুনতে হলে একদম পিনপতন নীরবতা চাই। তার মিষ্টি স্বর শুনতে পেলে কাছাকাছি কোথাও থেকে শুনে যেতে হবে। কারণ, সামান্য শব্দ শুনলেই সে ঝোপের আড়াল হবে, গান থামিয়ে দেবে। তাই আমিও নিঃশব্দে বসে আছি। হঠাৎ পাখিটার ডাক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার উপভোগ্যতায় ছন্দপতন ঘটলো। একটু পরে মনে হলো, বাঁশমহালের দিক থেকে আবার তার মিষ্টি স্বর ভেসে আসছে। বাঁশমহালে পিঁপড়ার ডিম খুব সহজলভ্য, পাখিদেরও খুব প্রিয় খাবার এটি। তাই ঐদিকে গেলে নিশ্চিত পাখির ঝাঁক চোখে পড়েই। শ্যামা কি তাহলে সেদিকে উড়ে গেলো? ধীরে ধীরে সেদিকে গেলাম। পেয়েও গেলাম শ্যামাকে। আবার একমনে তার গান শুনে যাই। কেন জানি মনে হচ্ছিলো, নজরুলের কথাগুলো শ্যামার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এখন:

"আমায় নহে গো ভালোবাসো শুধু
ভালোবাসো মোর গান
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে
গান হলে অবসান?..."[৭৯]

একটু আগে শালবন থেকে বাঁশমহালে এসে আমি যে শ্যামাকে পেলাম, সেটাই কি আগের শ্যামা? এমনও তো হতে পারে, বাঁশমহালে এসে নতুন কোনো শ্যামার গান আমি শুনছি। কিন্তু আমার মনোযোগ পাখির দিকে নয়, তার গানের দিকেই। গান যখন শুনতে শুরু করেছি, তখন কোন পাখিটা গাইছে, সে-হিসেব আমি আর করিনি। কবির কথায় তাহলে যৌক্তিকতা আছে। কবির প্রশ্নটাও বাস্তব। তবে এই প্রশ্নের উত্তরও আছে। কবি বেঁচে থাকলে উত্তরটা তাঁকে সরাসরি দেয়ার চেষ্টা করতাম আমি।

গান শেষ হলে বনের পাখিকে কেউ মনে রাখে না, জীবনের খেলাঘরে বেলা পড়ে এলে মানুষকেও মানুষ মনে রাখে না। ঠিক, তবে কেউ চিনে রাখে না, এমনটি নয়। একজন ঠিকই গান মনে রাখেন, গানের পাখিকে চিনে রাখেন। গান ফুরালেও পাখিকে তিনি ফুরাতে দেন না, গানের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে তাকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করেন। আমরা যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করি, তাঁর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আমরা যারা নিঃসংশয়, আমাদেরকে একটু নিজেদের দিকে খেয়াল রাখা চাই। তাঁর প্রত্যাশিত 'পারফরমেন্স'-এর মাত্রা যাপিত জীবনে আমরা ঠিক রাখছি কি না, বারবার নজর দেয়া চাই। ডানা ভেঙে পড়ার আগে, গলার স্বরগ্রামে জরাগ্রস্ততা ভর করার আগেই আমাদেরকে ঠিক করে নিতে হবে, তাঁর বেঁধে দেওয়া সীমার মধ্যেই আমরা উড়ছি কি না, তাঁর পছন্দনীয় সুরেই গান গাইছি কি না, তাঁর নিষেধকৃত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনোকিছুতে ঠোকর দিচ্ছি কি না এবং তাঁর প্রতি ভরসা ও আস্থাকে জীবনের মূলসুর করে নিতে পারছি কি না। তাহলেই ফিরদাউসের বাগানে পাখি হয়ে ওড়ার স্বপ্ন আলোর মুখ দেখবে।

[এই প্রবন্ধগল্পে উল্লিখিত সব পাখির বর্ণনা লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে লিখিত হয়নি। পূর্ব-অচেনা বেশ কয়েকটি পাখির বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা লেখা হয়েছে সুধীন্দ্রলাল রায় রচিত 'বাঙ্গলার পরিচিত পাখী' গ্রন্থ অবলম্বনে।]

টীকা

১৬. সুনান আত-তিরমিযী: ১৯২৪

১৭. সাহীহুল বুখারী: ২৩৬৫; সহীহ মুসলিম: ৫৯৮৯

১৮. সাহীহুল বুখারী: ৬৪১৬

১৯. জীবনানন্দের কবিতায় ঘুঘু ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। একটি উদাহরণ:

"এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে
এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে.."

[রূপসী বাংলা, পৃ. ৩৩]

২০. সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৯১

২১. সূরা আন-নাহল, ১ : ৭৯

২২. কবির بال جبریل কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ابو العلا معری শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য। কবিতার চুম্বকাংশ:

افسوس، صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو
دیکھے نہ تری آنکھ نے فطرت کے اشارات
تقدیر کے قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات!

২৩. বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১

২৪. তাফসীরু জালালাঈন, পৃ. ৮২৪

২৫. সূরা আল-কাউসার, ১০ : ৩

২৬. সাহীহুল বুখারী: ৬১২৯; সহীহ মুসলিম: ৫৭৪৭

২৭. সুনান আত-তিরমিযী: ৩৬৪১

২৮. সুনান আত-তিরমিযী: ১৯৯১

২৯. সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ, ৫ : ৩৫, ৩৬

৩০. তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ১২ পৃ. ১২৪

৩১. সুনান আত-তিরমিযী: ১৯৯০

৩২. সহীহ ইবন হিব্বান: ৫৭৯০

৩৩. সহীহ মুসলিম: ৬৭০৭

৩৪. খাওওয়াত-এর ডাকনাম ছিলো আবূ আবদুল্লাহ।

৩৫. ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন, খ. ৪ পৃ. ২১৭

ইহয়া-তে উল্লিখিত হাদীসগুলোর সনদ-মান-বিশ্লেষক আল-হাফিয আল-'ইরাক্বী মন্তব্য করেছেন: এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

[তাখরীজু আহাদিসি ইহয়াই 'উলূমিদ্দীন, খ. ৪ পৃ. ১৬৮৫]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩৬. সাহীহুল বুখারী: ৬০৩২
৩৭. সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৫৯
৩৮. বাগানটি ছিলো কিটসের বন্ধু ব্রাউনের। এই গল্পটি আমরা ব্রাউনের জবানিতেই পাই।
দ্রষ্টব্য: Keats, Narrative and Audience: The Posthumous Life of Writing, P. 172.
৩৯. ইবনুল ক্বাইয়িমের মূল বক্তব্যটি এই:
القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر
[মাদারিজুস সালিকীন, খ. ১ পৃ. ৫১৭]
৪০. সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৭
৪১. সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৪৯, ৫০
৪২. মূল কবিতার নাম Life. এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। সেই কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তিকে কাব্যানুবাদ করা হয়েছে। অনূদিত অংশের মূল পাঠ:
"If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain."
[Collected Poems of Emily Dickinson, p. 6]
৪৩. সাহীহুল বুখারী: ৬৭৪৩; সহীহ মুসলিম: ২৫৮০
৪৪. সাহীহুল বুখারী: ২৪৪২; সহীহ মুসলিম: ২৫৯০
৪৫. সহীহ মুসলিম: ৭৩৪১
৪৬. শারহু মুসলিম লি-আন-নাওয়াওঈ, খ. ৯ পৃ. ১৭৯
৪৭. সাহীহুল বুখারী: ৫৬৪০; সহীহ মুসলিম: ৬৭৩০
৪৮. সহীহ মুসলিম: ৬৭৩৫
৪৯. মুসনাদ আহমাদ: ২২২২০
৫০. সহীহ বুখারী: ২৪৭২; সহীহ মুসলিম: ৬৮৩৫
৫১. সহীহ মুসলিম: ৬৮৩৭
৫২. সুনান আন-নাসায়ী: ৪৫৩৫। হাদীসটি হাসান।
৫৩. সুনান আবূ দাউদ: ৪৯৪২
৫৪. 'আওনুল মা'বূদ শারহ সুনান আবি দাউদ, খ. ১৩ পৃ. ১৯৪
৫৫. যেমন: কবুতর উড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করা, কবুতরের মাধ্যমে জুয়াখেলা। এ ধরণের কাজ যিনি করবেন, শারী'আহর বিচারালয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।
৫৬. ইমাম নাওয়াওঈর উদ্ধৃতিতে 'আওনুল মা'বূদ, খ. ১৩ পৃ. ১৯৪
৫৭. সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৩
৫৮. সহীহ মুসলিম: ৭০৮১
৫৯. সুনান আত-তিরমিযী: ২৩৪৪; সুনান ইবন মাজাহ: ৪১৬৪
৬০. সূরা আত-তালাক, ৬৫ : ২, ৩
৬১. সুনান আত-তিরমিযী: ২৫১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৬২. সূরা আল-ক্বামার, ৫৪ : ১৩
৬৩. সাহীহুল বুখারী: ১৫২৩
৬৪. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ১৯৭
৬৫. জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম, খ. ৪৯ পৃ. ১৫
৬৬. ঝরা পালক ('ডাহুক' শীর্ষক কবিতা)
৬৭. সাত সাগরের মাঝি, পৃ. ৩২ ('ডাহুক' শীর্ষক কবিতা)
৬৮. ঐ, পৃ. ৩৪
৬৯. 'সবুজ রাতের কোলাজ' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা
৭০. সুনান আবূ দাউদ: ৩৯০৬
৭১. আয-যাওয়াজির, ইবন হাজার আল-হাইতামী, পৃ. ১৯৭
৭২. সূরা আন-নামল, ২৭ : ৬৫
৭৩. সহীহ মুসলিম: ৫৯৭৫
৭৪. মুন্সী মেহেরউল্লাহ সম্পর্কে জানতে:
- কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ: শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
- সোনালী শাহজাদা: সাজ্জাদ হোসাইন খান

এছাড়াও তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'মুন্সী মেহেরউল্লাহ রচনাবলী' শিরোনামে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলাম বা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে অ্যাকাডেমিক জ্ঞান তাঁর ছিলো না, ফলে তাঁর রচনা ও বক্তব্যে এমন অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে, যে ব্যাপারে দ্বিমত, ভিন্নমত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপত্তি করার সুযোগ আছে। এতদসত্ত্বেও তরুণদের জন্যে তিনি অনুপ্রেরণার মানুষ হতে পারেন। একজন দরদি সাধারণ মুসলিমের তর্কবাগীশ হয়ে উঠা, নিজ প্রচেষ্টায় সমকালীন প্রেক্ষাপটে কলমযোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার। নিজের আচরিত দীনের পতাকা বৈরী বাতাসেও উড্ডীন রাখার জন্যে এমন আকুলতা খুব কম মানুষেরই থাকে। মেহেরউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে সমকালীন আরেক চিন্তক সাহিত্যিক ইসমাঈল হোসেন শিরাজী যে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন, তা পড়ে যে কারো চোখ সজল হতে বাধ্য। এই কবিতা থেকেও অনেকটা বোঝা সম্ভব, মেহেরউল্লাহ কেমন অমূল্য সম্পদ ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, তাঁর ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন এবং তাঁকে ফিরদাউসের আতিথেয়তায় সম্মানিত করুন।

৭৫. সরল অনুবাদ: সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ২৭-৩১
৭৬. সাহীহুল বুখারী: ৩৩৫, সহীহ মুসলিম: ৪৪৭৩
৭৭. সুনান আবূ দাউদ: ৪৯০৩
৭৮. আল-মাওয়ারদী তাঁর أدب الدنيا والدين গ্রন্থে (পৃ. ১৭৬) এই মন্তব্য করেছেন 'সালাফ (পূর্বসূরি)দের' উদ্ধৃতিতে:

الحسد أوّل ذنب عصي الله به في السماء، يعني حسد إبليس لآدم- عليه السلام- وأوّل ذنب عصي الله به في الأرض، يعني حسد ابن آدم لأخيه حتّى قتله

"হিংসাই প্রথম পাপ, যদ্বারা আসমানে আল্লাহর অবাধ্যতা হয়েছে, অর্থাৎ আদমের প্রতি ইবলিসের হিংসা। এটাই প্রথম পাপ, যদ্বারা পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়েছে, অর্থাৎ ভাইয়ের প্রতি আদমপুত্রের হিংসা ও তৎপরবর্তী হত্যাকাণ্ড।"

৭৯. বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফজরে আমি উঠতে পারি না

ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগতে পারি না আমি। মাঝেমধ্যে জেগে উঠলেও আলসেমিতে পেয়ে বসে। আড়মোড়া ভেঙে আরেকদিকে কাত হয়ে শুয়ে যাই। ফজরের জামা'আতে শামিল হতে পারি না। সুবহে সাদিকের সুনির্মল বাতাস আমার গায়ে ঝিরিঝিরি পরশ বোলানোর সুযোগ পায় না। পবিত্রতার সতেজতম আবহ আমাকে স্পর্শ করে না। বিশুদ্ধ বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার অনুভূতি থেকে আমি বঞ্চিত হই প্রতিদিন। আরেকটা চমৎকার জিনিস থেকে আমি বঞ্চিত হই। আসলে 'বঞ্চিত হই' বলাটা বাঞ্ছনীয় হবে না, আদতে আমি নিজেকে 'বঞ্চিত করি'। কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত হই, সেটা বলছি একটু পরে। তার আগে ছোট্ট একটা গল্পের কথা মনে পড়লো। সত্যি গল্প কিন্তু!

আমি খুব ভালো ছাত্র। আমাদের কলেজটাও খুব নামকরা। এই কলেজের একজন কৃতী ছাত্র হলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট। অনেক বছর পর তিনি তারুণ্যের স্মৃতিবিজড়িত এই কলেজটাতে এলেন। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা মানপত্র পাঠ করেছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে প্রেসিডেন্ট যখন প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে, তখন নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এত চমৎকার বাচনভঙ্গি আর কাব্যিক উপস্থাপনা ছেলেটার! নাম কী ওর?' প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, 'ও আমাদের একজন মেরিটরিয়াস স্টুডেন্ট।' প্রেসিডেন্ট হেসে বললেন, 'বাহ! পড়াশোনা করে কেমন?' সব স্যার একবাক্যে বললেন, 'ভেরি পাংকচুয়াল অ্যান্ড অ্যাটেন্টিভ।' ভাইস প্রিন্সিপ্যাল স্যার এই ঘটনা আমাকে পরদিন বললেন। আমি তো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না! প্রেসিডেন্ট আমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন, এ তো আমার এক জীবনের সবচে' বড়ো পাওয়া! প্রেসিডেন্টের সামনে আমার প্রশংসা করা হবে, স্বপ্নেও কি কখনো ভেবেছিলাম? রোজনামচার পাতায় সেদিনের অনুভূতি লিখে রেখেছিলাম। কালো কালির কলম ছাড়া ইতিপূর্বে অন্য কোনো রঙের কলম দিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি রোজনামচা লিখিনি। কিন্তু সেদিনের রোজনামচায় পাঁচটা রঙিন কলম ব্যবহার করেছি। বাঁধভাঙা খুশির ঢেউ হৃদয়সৈকতে উপচে পড়লে যা হয় আর কি!

এটা আমার জীবনের গল্প। আরেকটা গল্প বলি, যে গল্পটা আবূ হুরায়রা বলেছেন। তিনি আবার বানিয়ে কোনো গল্প বলতেন না! প্রিয় নবিজি ﷺ যেভাবে যা বলতেন, তা-ই ঠিক ঠিক আমাদের জন্যে মুখস্থ করে নিতেন। একদিন নবিজি ﷺ বলছিলেন:

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

"তোমাদের মধ্যে একদল ফেরেশতা রাতে এবং আরেকদল ফেরেশতা দিনে আসেন, একের পর এক। ফজর ও আসরের সালাতে তাঁরা মিলিত হন। এরপর যাঁরা তোমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁরা উঠে যান। এবার তাঁদের রব্ব তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে সবচে' বেশি জানেন, 'আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় রেখে এসেছো?' তাঁরা বলেন: আমরা তাদের কাছ থেকে যখন চলে আসছিলাম, তখন তারা সালাতে মগ্ন ছিলো। আবার যখন তাদের কাছে এলাম, তখনও তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলো।"

এই গল্পটা ইমাম বুখারী তাঁর হাদীসের গ্রন্থে এনেছেন। বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিমও। বোঝাই যায়, এই গল্পের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত!

আমি ভাবছি ভিন্ন কথা। প্রেসিডেন্টের সামনে সেই যে এক বছর আগে আমার প্রশংসা করা হয়েছিলো, তাতে আমি কেমন উদ্বেল হয়েছিলাম! আচ্ছা, সাময়িক আত্মতৃপ্তি ছাড়া সেই আনন্দানুভূতির আর কোনো আবেদন কি এখন অবশিষ্ট আছে? নেই! কিংবা প্রেসিডেন্টের কি মনে আছে আমার কথা? নেই!

অন্যদিকে...

আল্লাহ কি ভুলে যান কোনো কিছু? না।

আল্লাহর কাছে পেশ করা কোনো রিপোর্ট কি বৃথা যায়? না।

সেই মানুষগুলো কত না ভাগ্যবান, যাঁদের নামে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে প্রশংসা করেন! সেই আলোকিত মুখগুলো কত না সফল, মাসজিদের সাথে যাঁদের হৃদয় জড়িয়ে থাকে ভালোবাসার বন্ধনে! সেই বন্ধনের সুতো ফেরেশতারা টেনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিয়ে যান আরশ পর্যন্ত! কেমন সৌভাগ্যবান তাঁরা!

আমারও তো সুযোগ ছিলো, এঁদের কাতারে নিজেকে শামিল করার। আসরের সালাত তো আমিও আদায় করেছিলাম! মাগরিব সালাতটাও মিস হয়নি, যদিও তাড়াহুড়ো করে গিয়েছি। দুই রাকাত মাসবূক না হয় হলো, 'ইশা-ও তো আদায় করে এলাম। আলসেমি না করে ফজরটাও যদি আদায় করতাম, তাহলে আমিও আমার প্রিয়তম প্রভুর সামনে প্রশংসিত হতাম।

আমি আরও ভাবি... এই যে মুয়াজ্জিনের প্রাণস্পর্শী আহ্বান শেষনিশীথে আমাকে নিশিত করছে না, ফজরটা হেলায় পার করে দিচ্ছি, এর কারণে শুধু আল্লাহর সামনে প্রশংসিত হওয়া থেকেই যে বঞ্চিত হচ্ছি, তা নয়, এই অবহেলার দরুন আল্লাহর জিম্মা থেকেও আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আমার দিনগুলো যে অস্থিরতায় কাটে, সময়গুলো বিবর্ণ-ধূসর হয়ে যায় হররোজ, এর কারণ কি তাহলে এটাই? আল্লাহর তত্ত্বাবধান যদি আমার ওপর না থাকে, জীবনটা নির্ভার হবে কীভাবে? প্রিয় নবিজি ﷺ তো বহু আগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন:

من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم

"যে ফজরের সালাত আদায় করলো, সে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে চলে এলো। আল্লাহ যেন নিজ তত্ত্বাবধানের কোনো কিছু সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে বাদী না হন। কারণ, তিনি যার বিরুদ্ধে আপন তত্ত্বাবধানের কোনো কিছু সম্পর্কে বাদী হবেন, তাকে পাকড়াও করবেন, এরপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[৮০]

এই হাদীস আমার ভাবনার জগৎটাই এলোমেলো করে দিচ্ছে। কী মোহগ্রস্ততায় আমি নিজেকে নিজে ঠেলে দিচ্ছি অনিশ্চিত অন্ধকারে, জানি না। বিছানার মোলায়েম স্পর্শে সালাতকে ভুলে থেকে আগুনের নির্মম স্পর্শের জন্যে কেন নিজেকে প্রস্তুত করছি তিল তিল করে, জানি না। শুধু জানি, এই আত্মবিধ্বংসী অভ্যাস থেকে আমাকে মুক্ত হতে হবে। হতেই হবে।

এই হাদীস আমার ভেতর আরেকটা উপলব্ধির জন্ম দিয়েছে। আমার অস্থিরতাপূর্ণ আটপৌরে জীবন, বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার পর শুরু হওয়া উদয়াস্ত ব্যস্ততা, যেখানে আসমানী মদদের ছিটেফোঁটা নেই, সেই জীবনটাকে আল্লাহর কাছে সমর্পিত করতে পারলে আরেকটু কি গোছানো হতো? আরেকটু নির্ভার হতো?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মনে হয় হতো। বিশ্বাসী অন্তর আমাকে কেন জানি প্রণোদনা দিচ্ছে এদিকে। এই সমর্পণের চমৎকার একটি সিঁড়ি হলো ফজরের সালাত। তাহলে কেন এই সুযোগ হাতছাড়া করবো আমি?

আমার মানসিক যন্ত্রণা আরও বহুগুণ বেড়ে গেলো, যখন জানতে পারলাম, আমাকে প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করা হয়েছে কুরআনের পাতায়। আমি উৎসুক হয়ে আয়াতটা খুলে পড়তে লাগলাম:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [৮১]

"এদের পরে এমন সব মন্দলোক স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা সালাত নষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। এরা শিগগির 'গাই' (জাহান্নামের একটি উপত্যকা)-এর মুখোমুখি হবে।"

কারা সেই হতভাগ্য, যাদেরকে আল্লাহ নিজেই 'মন্দ' বলছেন! এরা তারাই, যারা আমার মতো সালাতে হেলা করে। বলতে দ্বিধা নেই, চিন্তাভাবনা করে দেখলাম, আমি সেই মন্দলোকদেরই একজন হয়ে যাচ্ছি।

আমি সালাত নষ্ট করছি।

নিজের খেয়াল-খুশি মতো ঘুমিয়ে থাকছি, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর চেয়ে আয়েশি ঘুমের স্বাদ আস্বাদনে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

জাহান্নামের উপত্যকাই কি তবে আমার শেষ ঠিকানা?

আমি কি এতটাই নীচ?

আমি কি এতটাই হীন?

হ্যাঁ, আমি এতটাই নীচ ও হীন যে, আমার কানে এমনকি নির্গত হয় শাইত্বানের স্রাব। খতীব সাহেবের মুখে অনেকবার এ কথাটা শুনেছি, কিন্তু কথাটা খুব হালকা বলে মনে হতো। বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ হতো। যখন আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকেই শুনলাম, তখন কি আর সংশয়ের সুযোগ থাকে?

আমাদেরকে গল্পটা শোনাচ্ছেন 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ।

ذكر عند النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجل، فقيل: ما زال نائما حتَّى أصبح، ما قام إلَى الصَّلاة، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنِه. [৮২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হলো। বলা হলো: ভোর হওয়া পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে ছিলো, সালাতে দাঁড়ায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সে এমন লোক, শাইত্বান যার কানে প্রস্রাব করেছে।"[৮৩]

এই যে শাইত্বানের প্রস্রাব করে দেয়া, এটার অর্থ হলো, শাইত্বান আমার উপর জয়ী হয়েছে। আমি যে তার অনুগত ও বশ্য, সেই সত্যের স্মারক হলো তার এই প্রস্রাব করে দেওয়া। ছোটলোকের ছোটলোকি কারবার আর কি! কিন্তু আমার সাথে কেন এই ছোটলোকির সুযোগ সে পেলো? কারণ, আমিও তার কথা মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তার মতই নীচ হয়ে গেছি।

ছিঃ।

এ কেমন আমি?

এখানেই শেষ নয়। দুনিয়ায় যতো ভর্ৎসনাপ্রকাশক শব্দ আছে, এর মধ্যে জঘন্যতম অভিব্যক্তির একটা তালিকা যদি করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে 'মুনাফিক' শব্দটা প্রথমদিকেই থাকবে। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করার চিন্তা করি, কেউ যদি আমাকে 'মুনাফিক কোথাকার!' বলে, আমার কেমন অনুভূতি হয়! অথবা আমি যদি কাউকে 'মুনাফিক' বলে সম্বোধন করি, তাহলে কী বিপুল তেজ ও ক্রোধ নিয়ে সে আমার দিকে তেড়ে আসবে? এর কারণ কী? কারণ হলো, মুনাফিকি একটি ঘৃণিত চরিত্র, গর্ব করার মতো কোনো বিষয় নয়।

কিন্তু... এই 'মুনাফিক' অভিধার তিলক যদি আমি নিজেই আমার কপালে ধারণ নেই, তাহলে কার কী করার আছে? আবারও আবূ হুরায়রার কাছে যাই। তিনি আমাদেরকে শোনাচ্ছেন আল্লাহর রাসূলের একটা উক্তি:

ليس صلاة أثقل على المنافق من الفجر والعشاء [৮৪]

"ফজর ও ইশার চেয়ে মুনাফিকের জন্যে কঠিন কোনো সালাত নেই।"

আমি মুনাফিক নই ঠিক, কিন্তু মুনাফিকের মতো কাজই তো করলাম ফজর ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে।

হায়, দিনদিন কত নিচে নেমে যাচ্ছি!

কত নীচ হয়ে যাচ্ছি!

আমি নিজেকে বলি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উপুড় হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার মতো পাপিষ্ঠ তাহলে আমি?

শাইত্বানের স্রাব প্রস্রবণের স্থান হবার মতো নীচ কি আমি?

মুনাফিকের মতো ঘৃণিত অভিধায় অভিহিত হবার মত কি অধম আমি?

আল্লাহর কাছ থেকে নিন্দিত হবার মতো হতভাগা হয়ে ওঠার কথা কি আমার ছিলো?

ছিলো না।

আমি এই নীচতা থেকে পরিত্রাণ চাই।

আমি এই হীনতা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে চাই।

শাইত্বানের অনুগামী হওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চাই।

আমি আমার প্রিয়তম প্রভুর কাছে প্রশংসিত হতে চাই।

নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকি, জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজটা আমি ঘুমের কারণে বাদ দিই? হিসেব করে দেখলাম, ঘুমের কারণে ফজরের সালাত ছাড়া আমার জীবনে তেমন কিছুই বাদ যায় না। গত সেমিস্টারে ভার্সিটির ক্লাসগুলো প্রায় প্রতিদিনই সকাল সাতটায় শুরু হতো। ক্লাস ধরার জন্যে অন্তত সাড়ে পাঁচটায় রওনা দিতে হতো আমাকে। কই, কোনোদিন তো ঘুমের অজুহাতে আমি ক্লাস বাদ দিইনি! অনেকসময় অ্যাসাইনমেন্ট করতে করতে রাত দুটো বেজে গেছে, ঘুম আসতে আসতে তিনটার কাঁটা ছুঁইছুঁই। কিন্তু আধো ঘুমে চোখ কচলাতে কচলাতে আমি ঠিকই সাড়ে পাঁচটার বাসে উঠে বসে গেছি, ক্লাস যে করতে হবে!

ম্যাথ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্যে বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছে গত বছর। সহপ্রতিযোগীদের নিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর প্র্যাকটিস চালাতে চালাতে বেজে গেলো রাত একটা। ভোর চারটায় ছিলো ফ্লাইট। একফোঁটা না ঘুমিয়েও দেড়টায় রওনা হয়ে গেছি এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। কই, আমি তো 'আরেকটু ঘুমিয়ে নিই' বলে এই কাজগুলোর কোনোটাতেই বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিনি!

ঈদের ছুটিতে বা বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য যখন বাড়ি যেতে হয়, তখন ভোরবেলার ট্রেন ধরতে হয়। কই, কোনোদিন তো এমন হয়নি, ঘুমের অপূর্ণতার অজুহাতে আমি সেই ট্রেন মিস করেছি।

কারণ, আমি জানি, একটা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে পরীক্ষায় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, সিজিপিএ কমে যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটু আরাম করতে গিয়ে ফ্লাইটটা মিস হয়ে গেলে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের গৌরবময় অর্জন থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হবে।

আজকের ট্রেন মিস করলে পরের ট্রেনে সিট পাওয়া যাবে কি না, একেবারে অনিশ্চিত, এমনকি টিকেট কাটতির এই মওসুমে কোনো সিট না পেয়ে বাড়ি যাওয়াটাই অসম্ভবপর হয়ে যেতে পারে। বাড়ি পৌঁছতে না পারলে অপেক্ষারত বাবা-মা খুব অভিমান করবেন।

তাহলে কেন আমি ভাবি না, ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকলে আমার পরকালীন জীবনের হিসেব-নিকেশের খাতায় প্রাপ্তির ঘর অপূর্ণ থেকে যাবে!

ফ্লাইট মিস হলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের সম্মান থেকে বঞ্চিত হবো, সালাত মিস হলে তারচেয়ে বহুগুণ সম্মান ও গৌরবের জান্নাতী আতিথেয়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত হচ্ছি না?

দুনিয়ার জীবনে যে-ইবাদাতগুলো আমাদের জন্যে ফরয করা হয়েছে, এগুলো তো সেই ট্রেনের মতোই, যেই ট্রেনে চড়ে পৌঁছতে হবে চূড়ান্ত গন্তব্যে। যখন সেই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে আমি স্বপ্ন দেখি, তখন এই ট্রেন মিস করার কথা কীভাবে আমার মাথায় আসে? বাড়ি পৌঁছতে না পারলে বাবা-মায়ের অভিমানের কথা আমি ভাবি। কিন্তু ইবাদাতে গাফলতির কারণে আল্লাহ যে অসন্তুষ্ট হন, সে কথা আমি ভাবি না।

সিদ্ধান্ত নেই, ফজর সালাত ত্যাগ করবো না কখনোই। ঘুমিয়ে পড়ি। আযান শুনে ঘুম ভাঙে। সালাতে যাওয়ার জন্যে মনে মনে ঠিক করি। কিন্তু আযানের পর আবারও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। নবিজি ﷺ-এর সাহাবি সামুরাহ ইবন জুনদুব ﷺ-কে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। মাথায় হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে স্বপ্নের মধ্যেই একটা স্বপ্নের গল্প বলি'। আমি তো গল্প পছন্দ করি খুব। সোৎসাহে বললাম, 'বলুন না প্লিজ!' তিনি গল্প শুরু করার আগে বললেন, 'এই যে স্বপ্নটা, এটা কিন্তু যেন তেন স্বপ্ন নয়। তোমাকে যে স্বপ্নের গল্প বলছি, এটা নবিজি ﷺ দেখেছিলেন!' আমি আরও উৎসুক হলাম। তিনি গল্পটা শোনাতে লাগলেন। যখনই বললেন:

أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة [৮৫]

"যে ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ করে দেয়া হচ্ছিলো, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে কুরআনকে গ্রহণ করে অতঃপর প্রত্যাখ্যান করে এবং ফরয সালাত রেখে ঘুমিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাকে।"

আমি প্রচণ্ডরকম ঘেমে যাচ্ছিলাম। ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। ততক্ষণে ফজরের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাড়াহুড়ো করে দুই রাকাত ফরয আদায় করে নিলাম। কিন্তু মনটা কেমন উদাস হয়ে থাকলো। কিছুতেই স্থির হতে পারছিলাম না। কীসের যেন শূন্যতাবোধ আমাকে গ্রাস করছিলো। একে তো জামা'আতের সাথে পড়িনি; আবার দুই রাকাত সুন্নাতও বাদ দিয়েছি। এই দুই রাকাত সুন্নাতের ব্যাপারে আমাদের নবিজি ﷺ বলেছিলেন:

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها [৮৬]

"পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তারচেয়ে উত্তম ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) সালাত।"

জায়নামাযে বসে বসে আরেকটা ভাবনার সৃষ্টি হলো। আচ্ছা, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের মূল্য যদি এত বেশি হয়ে থাকে, তাহলে ফরজ দুই রাকাতের মূল্য ও মর্যাদা কত বেশি হতে পারে!

আধাঘণ্টা বেশি ঘুমানোর জন্যে আমি প্রতিদিন এত বড়ো সম্মান ও মর্যাদাকর উপলক্ষ্যকে হাতছাড়া করে চলছি! কী বোকা আমি! আমাকে কি আমি ধিক্কার দেবো? না, তা দিয়ে লাভ নেই। বরং আর দেরি না করে সৌভাগ্যবানদের কাতারে নিজেকে শামিল করে ফেলতে প্রতিজ্ঞ হয়ে যাই।

এরপর থেকে আমি ফজরের সালাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করি। বিছানার পেলবতা আমাকে আর পুরোনো গর্তে ফেলতে পারে না। 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' আমার কানে অপার্থিব সুরের মূর্ছনা নিয়ে আসে। কী এক তন্ময়তার ঘোর আমাকে পেয়ে বসে! আমি ধীর পদক্ষেপে মাসজিদের দিকে পা বাড়াই।

পৃথিবীর কোল থেকে রাত্রি তখনো পুরোপুরি দূরীভূত হয়নি। আবছা অন্ধকারের বুক চিরে আমার কদম অগ্রসর হয়। মুয়াজ্জিনের হৃদয়স্পর্শী আযান এখনো শেষ হয়নি। ঝিঁঝি পোকাদের একটানা ডাক বুঝি-বা ক্লান্তিতে থেমে গেছে। দূর থেকে দুয়েকটা কাক থেমে থেমে ডাক দিয়ে যাচ্ছে। সেই অন্ধকারে যতই ধীর পদক্ষেপে আগাই না কেন, নিজের পদশব্দ নিজেই শুনতে পাই। মসজিদের সাথে লাগোয়া পুকুরের ঘাটে একটা বাল্ব জ্বলছে। পুকুরের টলটলে পানিতে সেই বাল্বের আলো নেচে যাচ্ছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে। আবছা অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে যখন সেই ঝিকমিক করা আলোর দিকে চোখ যায়, তখন এলোমেলো সুশীতল হাওয়া কানের কাছে এসে শুনিয়ে যায় প্রিয় নবিজি ﷺ-এর আশাজাগানিয়া বাণী:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة [৮৭]

"আঁধার রাতে মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিদের কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ আলোপ্রাপ্তির সুসংবাদ দাও।"

অন্ধকারে হেঁটে যাওয়াটাই আলোপ্রাপ্তির কারণ! কী চমৎকার ব্যাপার! এমন অন্ধকারে হাঁটতে কে না চাইবে!

মসজিদের কাছে পুকুরঘাটের আলো আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি, মসজিদে পৌঁছার সাথে সাথে সেই আলোর চৌহদ্দিতে আমি প্রবেশ করবো। আল্লাহর প্রতিশ্রুত 'পরিপূর্ণ আলো' আমি চর্মচোখে দেখছি না বটে, কিন্তু অন্তর্চক্ষুতে সেই আলোর ঝলক এসে আমার চোখের পলক ফেলতে দিচ্ছে না। সেই আলোর চৌহদ্দিতেও একদিন আমার জায়গা হবে, আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে এই ফরিয়াদ জানাতে জানাতে নীরবেই পথ চলতে থাকি।

আধোস্বপ্নে বিভোর আমার মনটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে চায়। টুপির ফাঁক গলে বাতাসগুলো আমার চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা তৃপ্তির রেশ আমার 'সুপ্তি-মগন'কে আলতো ছোঁয়ায় জাগাতে থাকে।

এই তৃপ্তিবোধের উৎস কোথায়? উৎস তো অনেক! তোমাকে কোনটা বলি?

একটা উৎস হতে পারে এই হাদীস:

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله [৮৮]

"জামা'আত সহকারে যে 'ইশা আদায় করলো, সে যেন অর্ধরাত্রি ধরে (নফল) সালাত আদায় করলো; এবং জামা'আত সহকারে যে ফজর আদায় করলো, সে যেন সারারাত ধরে (নফল) সালাত আদায় করলো।"

গতরাতে জামা'আতের সাথে 'ইশার সালাত আদায় করেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। ফজরটাও জামা'আতের সাথে আদায় করতে যাচ্ছি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার হিসেবের খাতায় সারারাত নফল সালাত আদায়ের সাওয়াব যোগ হতে যাচ্ছে, আমি তৃপ্ত হবো না তো কে হবে? শাইত্বান এতদিন আমার সাওয়াবের নদীতে রুক্ষ বালুচরের উন্মেষ ঘটিয়েছে, আর আজকে আমি তার বালুচরে বিশ্বাসের ঢেউ নিয়ে আসতে পেরেছি, আমি উদ্বেল হবো না তো কে হবে?

এই তৃপ্তিবোধের ঘুড়ির নাটাই আরও কয়েক জায়গায় আছে। এই যেমন:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

من صلى البردين دخل الجنة [৮৯]

এই হাদীসটা খুব চমৎকার! এটাকে যদি আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়াই এই: "যে ব্যক্তি দুইটি শীতল সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

'দুইটি শীতল সালাত' বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে, সে-ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসের ঐকমত্য আছে: আসর সালাত ও ফজর সালাত। এই দুই ওয়াক্তে প্রকৃতি তুলনামূলক স্নিগ্ধ ও শীতল থাকে, তাই এদেরকে 'শীতল সালাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এই হাদীসের স্নিগ্ধতা যখন আমাকে স্পর্শ করে, হাদীসের মর্মবাণী যখন আমার মর্মমূলে শীতলতার অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে চলে, তখন আমার মতো প্রশান্ত, আমার মতো নির্ভার আর কেউ থাকে না।

এরকম আরেকটা ছোট্ট হাদীস আছে, আমার চোখেমুখে প্রশান্তির ঝিকিমিকি এনে দেয়:

لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها [৯০]

"এমন কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না কখনো, যে সূর্য ওঠার আগে এবং সূর্য ডোবার আগে সালাত আদায় করে।"

এতদিন নিজেকে নিয়ে যে হীনম্মন্যতার ডালপালা বেরোতে শুরু করেছিলো মনের বৃক্ষে, এই হাদীসগুলো যেন সেগুলো ছেঁটে দিয়ে আবারও দৃষ্টিনন্দন একটা বৃক্ষ দাঁড় করিয়েছে আমার ভেতর, যে বৃক্ষের ছায়ায় আমার ক্লান্ত বদন দখিনা হাওয়ার পরশ মাখে, যার শাখা-প্রশাখায় ফিরদাউসের পাখিরা এসে গান ধরে। আমি শুনি আর আন্দোলিত হই। আমি দেখি আর আলোড়িত হই।

তবে এতটুকু পথ মাড়িয়ে এসে প্রশান্তির জায়গাটা নিজের করে নিতে মোটেও যে বেগ পোহাতে হয়নি, তা কিন্তু নয়। আমাকে কতকিছু পিছুটান হয়ে দমিয়ে রাখতে চেয়েছে! যখন শাইত্বান দেখলো, আমাকে কোনোভাবেই ফজর থেকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না, তখন রাতের বেলা আমার জন্যে হরেক পদের ব্যস্ততার ডালি নিয়ে এসে হাজির হলো। উদ্দেশ্য, আমি যেন অনেক রাত করে ঘুমাই, আর ফজরে কোনোরকম যদি উঠিও, পূর্ণ মনোনিবেশের সাথে যেন ফজর আদায় না করতে পারি। আমি তার এই ফন্দি প্রথমে না বুঝে অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছি। ভাবলাম, অ্যালার্ম ক্লক আছে, আমিও আল্লাহর উপর ভরসা রাখি, মাসজিদও কাছে বিধায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আযান কাছ থেকে শোনা যায়, অতএব জাগ্রত হওয়া নিয়ে আমার তো কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আসলেই জাগ্রত হওয়া নিয়ে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু ক্ষতি যে জায়গায় হয়ে গেলো, সেটা হলো, আমি পূর্ণ হক আদায় করে ফজরে শামিল হতে পারছিলাম না। সালাতে দাঁড়ালে চোখের পাতা লেগে আসতে চায়, ইমামের কিরাআত মনোযোগ দিয়ে শোনার ধৈর্য ক্রমশ কমে আসে, কোনোরকম সালাত শেষ করে বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিতে পারলেই যেন বাঁচি!

ব্যস্ততাগুলোও ছিলো নির্দোষ ধরনের। মন বলতো, তুমি তো একটা ভালো বই পড়ছো। এই বইটা শেষ করে তারপর নাহয় শুতে যেয়ো। অথবা ভালো কিছুই নোট করছো। বিষয়টা সম্পূর্ণ নোট করে ঘুমোতে গেলে দোষ কী? কিন্তু আমি জানতাম না, অনেকসময় ভালো কাজের ফলাফলও খারাপ হতে পারে, যদি সময় ও অবস্থা না বুঝে কাজ করা হয়। যেমন, আল্লাহ বলছেন:

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ [৯১]

"আমি তাদেরকে বিপন্ন করলাম সৎকর্ম ও মন্দকর্মের মাধ্যমে।"

মন্দকর্ম কারও বিপদের কারণ হতে পারে। কিন্তু সৎকর্ম কীভাবে বিপদের উপলক্ষ্য হয়? অনেকদিন ধরে প্রশ্নটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়েই আমি উত্তরটা পেয়ে যেতে শুরু করলাম। এই যে ভালো কাজের ছুতা দিয়েই রাত জাগছি, তারপর ফজরের সালাতকে হালকা করে ফেলছি, এটাই তো আমার বিপদের কারণ! শাইত্বান এভাবেই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে। অধিকরাত পর্যন্ত ফেসবুকিংয়ে মগ্ন থাকা আমাদের স্বাস্থ্য ও ইবাদাত দুয়ের জন্যেই ক্ষতিকর। কিন্তু শাইত্বান এখানে ভিন্নভাবে প্ররোচনা দেবে। সে বোঝাবে, ফেসবুকে কত দ্বীনি কন্টেন্ট আছে, কত চমৎকার দ্বীনি রিমাইন্ডার আছে, সেগুলো পড়তে বা দেখতে দোষ কী? ব্যস, ঐ ভালো কন্টেন্ট নিয়ে মগ্ন থাকা অবস্থাতেই সে আমাদেরকে আরেকটা ফরয থেকে দূরে সরিয়ে রাখার আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলে। কাজেই, ভালো কাজ মানেই ভালো ফল বয়ে আনবে, এমন নয়। ভালো কাজকে তার উপযুক্ত সময় ও অবস্থানেই সারতে হবে। অন্যথা ভালো কাজের ব্যস্ততাই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এভাবে করে রাতজাগার ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আমি নিজ থেকেই উপলব্ধ হলাম। শাইত্বান আর কতদিন পার পাবে? চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন। আমি ঠিকই হাতেনাতে ধরে ফেললাম তার ফন্দি। যত ভালো কাজই সামনে আসুক, সেটা রাতেই সেরে ফেলার জন্যে উঠেপড়ে লাগার প্রয়োজন নেই। ঠিক সময়ে ঘুমিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

তারপর কুরআন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ [২৯]

"আর তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন আলসেমির সাথে দাঁড়ায়।"

সব্বনাশ! এই রুকূর আয়াতগুলো তো মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে! তবে কি আমিও তাদের একজন হয়ে যাচ্ছি? এদ্দিন তো তাদের কাতারে ছিলাম ফজর ত্যাগ করার মাধ্যমে। এখন দেখছি ফজর আদায় করেও তাদের একজন হয়ে যাচ্ছি! কারণটা কী? কারণটা আর কিছু নয়, আমি পূর্ণ মনোনিবেশ ও যথাযথ আন্তরিকতা নিয়ে সালাতে দাঁড়াচ্ছি না।

এতৎসত্ত্বেও এই অভ্যাস ছাড়তেও দেরি হতে লাগলো। আজ নয় আগামীকাল, এই তো কালকে থেকেই ছাড়বো... এভাবে করতে করতে আমার আর রাতজাগা বন্ধ হচ্ছিলো না। এই চিন্তার আলস্যকে এক ঘা দিয়ে বিদায় না করতে পারলে সমূহ বিপদ! আল্লাহর রাসূলের সাহাবি কা'ব ইবন মালিক এভাবেই তো পিছিয়ে পড়েছিলেন একবার! তাবূক যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সাথে তিনি বের হননি। দেরি করছিলেন। এখন নয়, একটু পরে। আজকে নয়, কালকে। সৈন্যবাহিনী তো ধীরগতিতেই আগাচ্ছে, আর আমি তাগড়া যুবক, সঙ্গে আছে তেজি ঘোড়া, কাজেই, যখনই বের হই, আমি তাদের সাথে মিলিত হবো। তারপর কী হলো? একদিন গেলো, দুইদিন, তিনদিন, চারদিন... সৈন্যবাহিনী অনেক দূরে চলে গেলো, তাঁরও আর যুদ্ধে যাওয়া হলো না। ফলাফল? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি। এই ঘটনা আমাকে তাড়না দিতে লাগলো, 'যা করার আজ থেকেই শুরু করো! কাল করবো বলে দেরি করার অর্থই হচ্ছে অনিশ্চয়তার দিকে নিজেকে ঠেলে দেয়া।'

তারপর থেকে আমি ডিটারমাইন্ড। সেদিন থেকেই আর কখনো অধিকরাত পর্যন্ত জাগি না। ছোটবেলায় ইশকুলে পড়া ছড়া "Early to bed and early to rise / Makes a man healthy, wealthy and wise." খুব মনে পড়তে থাকে। পরিমিত ঘুম যাতে হয়, এমন সময় হিসেব করে ঘুমিয়ে যাই। আয়াতুল কুরসী তো মায়ের কোল থেকেই পাঠ করে আসছি, এখনো বাদ যায় না। সূরা ফালাক্ব আর নাস পড়ে, হাত দিয়ে গায়ে পরশ বুলিয়ে ডান কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি আল্লাহর নামে। মুয়াজ্জিনের আযানের সাথে সাথে আবার জেগে উঠি। ধীরে সুস্থে অযু করি। সময় থাকলে দুই রাকাত সুন্নাত বাসা থেকেই আদায় করে মাসজিদের উদ্দেশে রওনা হই। খোলা বাতাসে আমার কণ্ঠ খলখল করে ওঠে। মায়ের কাছে শেখা সূরাগুলো বিড়বিড় করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আওড়াতে থাকি। পবিত্রতার আবেশ জড়ানো অনুভূতি আর জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার আনন্দ মিলে আমার ভেতরে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। নিজের অর্জিত পাপগুলোর কথা ভেবে চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে কখনো কখনো। তবুও ভরসা পাই, এমন জায়গায় নিজেকে সমর্পণ করতে যাচ্ছি, শত অপরাধ সত্ত্বেও যিনি বান্দাকে কাছে টেনে নেন। ভোরের পাখিগুলো ঘুমের পাড়া জাগাতে শুরু করে। কখনো মনে হয়, আমার খলখল-করা কণ্ঠের সাথে ওরাও একাত্ম হতে চাইছে।

আমি পথ চলতে থাকি। মাসজিদের কাছে এসে পথ শেষ হয়। ভুল দেখছো, এই পথের শেষ এখানে নয়। এই পথ ফিরদাউসের স্বর্ণালি তোরণদ্বার পর্যন্ত প্রলম্বিত। আমি সেই পথেই হাঁটছি। তুমি যাবে আমার সাথে?

টীকা

৮০. সহীহ মুসলিম: ১৫২৬

৮১. সূরা মারয়াম, ১৯ : ৫৯

৮২. সাহীহুল বুখারী: ৩২৭০; সহীহ মুসলিম: ১৮৫৩

৮৩. লোকটি কোন ধরনের সালাত ত্যাগ করেছিলেন, সে সম্পর্কে দুইটি অভিমত আছে।

এক.

একদল মুহাদ্দিস মনে করেন, লোকটি তাহাজ্জুদ আদায় করেন নি।

ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে এই হাদীসটি সংকলন করেছেন যেই পরিচ্ছেদে, তার শিরোনাম হলো باب الترغيب في قيام الليل (রাত্রিকালীন সালাতে উৎসাহিতকরণ)।

দুই.

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হলো, লোকটি ফরয (ফজর) আদায় না করে ঘুমিয়ে ছিলেন।

ইমাম ইবন হিব্বান হাদীসটি বর্ণনার পর সুফয়ান সাওরীর উক্তি উদ্ধৃত করে এই মত উল্লেখ করেছেন। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'তেও (৩য় খণ্ড ২৮ পৃ.) ইমাম 'আসকালানী এই মত দিয়েছেন।

৮৪. সাহীহুল বুখারী: ৬৫৭

৮৫. সাহীহুল বুখারী: ১১৪৩; সহীহ ইবন হিব্বান: ৬৫৫

৮৬. সহীহ মুসলিম: ১৭২১; সুনান আত-তিরমিযী: ৪১৬

৮৭. সুনান আত-তিরমিযী: ২২৩; সুনান আবূ দাউদ: ৫৬১

৮৮. সহীহ মুসলিম: ১৫২৩; সুনান আবূ দাউদ: ৫৫৫

৮৯. সাহীহুল বুখারী: ৫৭৪; সহীহ মুসলিম: ১৪৭০; সহীহ ইবন হিব্বান: ১৭৩৯

৯০. সহীহ মুসলিম: ১৪৬৮; সহীহ ইবন হিব্বান: ১৭৪০; সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ৩১৯, ৩২০; সুনান আন-নাসাঈ: ৫৭১

৯১. সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৬৮

৯২. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে

আষাঢ়ের মাঝামাঝি সময়টা এমনই। দিন-রাতের বিরাম নেই, থেমে থেমে বৃষ্টি। কখনো মুষলধারে, কখনো ইলশেগুঁড়ি। দুপুরের পর একটু রোদের দেখা মিলেছিলো। আমার অনুভূতি রোদেলা হয়ে ওঠার আগেই সে হারিয়ে গেলো। পূর্বদিকের আকাশে ঘনকালো মেঘের ফাঁকে কয়েক টুকরো সাদা মেঘও উঁকি দিচ্ছে। চোখের পলকেই ঝুম বৃষ্টি নামলো। জানালা খোলা রেখে বৃষ্টিটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম, দমকা বাতাসের ঝাপটায় তা আর হলো কই? ব্যালকনিতে চলে এলাম। এখানে বৃষ্টির ফোঁটা বাতাসের সাথে এসে গায়ে লাগে। কদিন আগেও উঠোনে রজনিগন্ধার গাছটা কেমন ধূসর হয়ে ছিলো, মাধবীর গাছে আধফোটা ফুলগুলোকেও কেমন বিবর্ণ দেখাচ্ছিলো। নিমের ডালে সব পাতাই মনে হয় অর্ধমৃত হবার উপক্রম। কয়েক পশলা বৃষ্টিতে সবকিছু আবার সবুজ হয়ে উঠেছে। টগর ফুলগুলো একটু বেশিই ফর্সা হয়ে আছে বোধহয়। রজনিগন্ধার পাপড়িতে শিশিরফোঁটা কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে! অভিমানী বাচ্চাশিশুর তুলতুলে গালে অশ্রুর ফোঁটা যেমন অনির্বচনীয় সুন্দর হয়ে মায়ের চোখে ধরা দেয়, এই ফুলটার পাপড়িতে শিশির ফোঁটাও তেমনই দেখাচ্ছে। মাধবী ফুলগুলো সজীব হাসিতে মুখর হয়ে আছে। আকাশ কাঁদছে, পৃথিবী হাসছে। কী অদ্ভুত! 'কবি বুহতুরি'কে মনে পড়ে খুব:

إن السماء إذا لم تبك مقلتها * لم تضحك الأرض عن شيء من الخضر

والزهر لا تنجلي أحداقه أبداً * إلا إذا مرضت من كثرة المطر [৯৩]

"আকাশের চোখ থেকে যদি অশ্রু না ঝরে,
পৃথিবী সবুজ হাসিতে হাসে না কিছুতেই।
প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রুগ্‌ণ হয়ে যাওয়ার আগে
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না ফুলের পাপড়ি।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কী গভীর জীবনদর্শন এখানে লুকিয়ে আছে! অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম, যাপিত জীবনের নানা বাঁক-উপবাঁক ঘুরে কথাগুলোর সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। ভয়ানক সত্য কথা বলে গেছেন বুহতুরি!

আম্মুকে পেঁয়াজ-তেলে মুড়ি ভেজে দিতে বলেছিলাম। রান্নাঘরের চুলোয় বৃষ্টি পড়েছে, আগুন ধরানো যাচ্ছে না। ও বাড়ি থেকে চাচীআম্মা গরম তাওয়ায় ভেজে কাঁঠালের বিচি পাঠিয়েছেন। খেতে ভীষণ কুড়মুড়ে। বীজতলার দিকে চেয়ে সবার চোখেমুখে স্বপ্নের লুকোচুরি। সদ্য অঙ্কুরিত ধানের চারা দেখে বদরাগী শাব্বির চাচাও প্রশান্ত ও নির্ভার মেজাজের হয়ে গেছেন। চৌচির হয়ে যাওয়া মাঠে শাব্বির চাচার ঘর্মাক্ত চেহারায় হতাশার ছাপ দেখেছিলাম। খাঁখাঁ রোদে ডোবাটা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিলো। বর্ষাঋতু চলে এলো, অথচ বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই। সালাতুল ইসতিসকায় দাঁড়ালো সবাই। হপ্তা যেতে না যেতে বৃষ্টির দেখা পেয়ে হারূন চাচার সে কি খুশি! চৌচির-হয়ে-যাওয়া মাঠ কয়েকদিনের ব্যবধানে কেমন সবুজাভ হয়ে উঠলো! কঠিন মাটিগুলো ঝরঝরে হয়ে গেলো! শস্যহীন রুক্ষ প্রান্তর নিমেষেই সবুজ চাদরে ঢেকে গেলো। যাঁদের হৃদয় বিশ্বাসে সমর্পিত, তাঁরা এই দুটো বিপরীতমুখী দৃশ্য যখন চোখের সামনে দেখেন, তখন কুরআনের কাছে চলে যান:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ
الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي المَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে আরেকটি হচ্ছে: তুমি জমিনকে শুষ্ক দেখতে পাও; যখন আমি সেই জমিনে পানি বর্ষণ করি, তখন সেটা সতেজ ও উর্বর হয়ে ওঠে। যিনি এই মৃত জমিনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতপ্রাণগুলোকে জীবিত করবেন। তিনি তো সবকিছুই করার ক্ষমতা রাখেন।" [৪১:৩৯]

কী ভাবনাজাগানিয়া কথা!

কুরআন যেন আমার সাথে কথা বলছে!

'তুমি জমিনকে শুষ্ক দেখতে পাও।'

তাইতো, জমিনকে আমি শুষ্কই দেখেছিলাম!

তারপর?

আল্লাহ পানি বর্ষণ করেছেন, জমিন সতেজ ও উর্বর হয়েছে!

আমার রব্ব, তুমি সত্যই বলেছো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঠিক এভাবে... বৃষ্টির সঞ্জীবনী সুধা পান করে পৃথিবীর প্রাণে নতুন উদ্দীপনা দেখে একজন বিশ্বাসী মানুষের ঈমানও নান্দনিক ছন্দে দোল খায়। ভাবে, চোখের সামনেই তো মৃত জমিনটাকে প্রাণ ফিরে পেতে দেখলাম! আমাদের মৃত্যুর পরও আল্লাহ আমাদের জীবিত করতে পারেন, এটা চোখে না দেখেও নিশ্চিত সত্য বলে ধরে নেয়া যায়, সন্দেহ ছাড়াই। যে-আল্লাহ নিমেষে মৃত পৃথিবীকে নতুন জীবন দিতে পারেন, সেই আল্লাহ একদিন মৃতপ্রাণকে জীবিত করবেন, এ নিয়ে আর সংশয় থাকে? থাকে না!

এই ব্যাপারটা আল্লাহ আরও চমৎকার করে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। কোথায় বুঝিয়েছেন? সূরা ফাতিরে। দেখি তো কী বলেছেন আমাদের রব্ব!

وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

"তিনি সেই আল্লাহ, যিনি বাতাস সঞ্চালন করেন, অতঃপর সেই বাতাস মেঘ সঞ্চারণ করে। এরপর আমি মেঘকে একটি মৃতভূমির দিকে নিয়ে যাই, সেটা দিয়ে জমিনকে জীবিত করে তুলি, তার মৃত্যুর পর। এভাবেই তোমাদের পুনরুত্থান হবে।"[৯৪]

কী দারুণ তাঁর বোঝানোর পদ্ধতি!

কী অনুপম তাঁর উপমাশৈলী!

কতটা স্ফটিক-স্বচ্ছ তাঁর উদাহরণ!

আমাদের তাহলে উঠতেই হচ্ছে আল্লাহর কাছে! চুলচেরা হিসেবের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া তাহলে গত্যন্তর নেই! তাহলে এত আমুদে দিনাতিপাত, এত আহ্লাদী সময়ক্ষেপণ কীভাবে করবো আমি? আমার দিকে চেয়ে আমাকে একটু হিসেব করা কি উচিত নয়? আকাশের অশ্রু ঝরানোর মুহূর্তে আয়াতটা মনে পড়ার পর আমার পরিণতির কথা ভেবে আমারও কি অশ্রু ঝরানো উচিত নয়? উচিত বটে!

আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়াই। অনেকদিন রংধনুর দেখা পাই না। বৃষ্টিটা কখন থামবে, ফরসা আকাশে কখন রংধনু উঁকি দেবে, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আফ্রিকান কবি মায়া অ্যাঞ্জেলোর নাম তো শুনেছো। কী মুগ্ধতা নিয়ে একসময় মায়া অ্যাঞ্জেলোর কবিতার মায়ায় পড়েছিলাম! তাঁর কোনো এক কবিতায় এরকম একটা পঙ্‌ক্তি ছিলো: Try to be a rainbow in someone's cloud (চেষ্টা করো কারও মেঘে রংধনু ছড়িয়ে দিতে!) চেষ্টা আবার কি, মুমিন-হৃদয় তো সবসময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উন্মুখ হয়ে থাকে আরেকজনের দুঃখ-বেদনায় স্বস্তি ও প্রশস্তির কারণ হবার জন্যে। কারণ, মানবিকতাবোধের তাড়নায় আত্মিক প্রশান্তি অর্জনের অভিলাষ শুধু নয়, আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবার প্রণোদনাও তার ভেতরে কাজ করে। দুটো প্রেরণাবোধ একসাথে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে রিক্তপ্রাণকে সিক্ত করার কাজে এগিয়ে আসতে। একজন অবিশ্বাসী মানুষ এক্ষেত্রে শুধু একটা প্রেরণাবোধ নিয়ে বাঁচে।

গ্রিলে একটা আধভেজা পাখি বসে আছে। আমার সাথে কথা বলার সময় তার নেই। সময় নেই বললে ভুল হবে, আসলে তার কথা বলার মন নেই। বৃষ্টির ঝাপটা একটু কমলে কীভাবে নীড়ে ফিরবে—এই চিন্তায় সে মশগুল। আমার ইতিউতি চাহনিতে বিরক্ত হয়ে বেশ কয়েকবার ভেন্টিলেটরের ফাঁকে ঢুকে নিভৃতচারিতায় মগ্ন হতে চেয়েছিলো। বিধিবাম, ভেন্টিলেটরের ফাঁকাগুলো খুব আঁটোসাঁটো। ও যেহেতু আমার সাথে কথা বলবে না, অন্য কারও সাথে গল্প করা চাই। কার সাথে করা যায়? এই মুহূর্তে চোখের তারায় ভাসছে একটা দুরন্ত বালকের ছবি—নাম তাঁর আনাস। আনাসকে চিনলে না? আমার চেয়েও বয়সে ছোট, গুমাইছা বিনত মিলহান ﵁-এর নাড়িছেঁড়া ধন, প্রিয় নবিজি ﷺ-এর কাছে রাতদিন পড়ে থাকতো যে ছেলেটা! টানা দশ বছর নবিজির ﷺ সেবায় নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন যিনি, সেই আনাসের কথা বলছি। রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু। তিনি আমার সাথে গল্প করছেন। একদিন বৃষ্টি এলো। আনাস ﵁-সহ আরও কিছু সাহাবি রাসূলুল্লাহর সাথে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জামাটা খুলে দিলেন, বৃষ্টি এসে তাঁর গায়ে লাগলো। রাসূলুল্লাহর এই কাজটিতে সাহাবিরা যারপরনাই চমৎকৃত হলেন। তাঁরা সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন তিনি এমনটি করেছেন। নবিজি ﷺ কী বলেছিলেন জানো? তিনি বলেছিলেন: কারণ, এই বৃষ্টি একটু আগেই আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে! (حديث عهد بربه)

মানে বোঝোনি? এই যে বৃষ্টির পানিটা, এটা এইমাত্র আকাশ থেকে পড়লো। এই বিশুদ্ধ বৃষ্টিফোঁটা একটু আগেই আল্লাহর আদেশে সৃষ্ট হয়েছে। এই পানিটা নদীতে প্রবাহিত হবে, দিঘল দিঘিতে জমা হবে, স্বচ্ছ-নিটোল পুকুরে কিংবা কূপের পানিতে মিশে যাবে, তখনও কিন্তু আমার শরীরে স্পর্শ করাতে পারবো; কিন্তু ততক্ষণে অনেক সময় গড়িয়ে যাবে, এখনই যদি স্পর্শ করে ফেলি, তাহলে আল্লাহর আদেশে সৃষ্টি হওয়ার খুব কাছাকাছি সময়েই আমি তাকে পেয়ে যাচ্ছি। আসমানী রহমধারায় সিক্ত হওয়ার জন্যে কি দেরি করা যায়, বলো?

এই যে ব্যাখ্যাটা তোমাকে দিলাম, এটা হাদীসে উল্লিখিত মাত্র তিনটা শব্দকে ‘ইলাবোরেট’ করেছি। নবিজি ﷺ-এর প্রতিটি কথাই এরকম সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ, কিন্তু কী অপার চিন্তাবিভূতি তাতে! মাঝেমধ্যে হাদীসের পাতা উল্টিয়েই দেখো না!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শব্দচয়নের শীলনে, আলংকারিক সৌন্দর্যের জীয়নে তোমার অনুভূতিকে কীভাবে যে সজীব করে দেবে, গভীর মনোযোগ ও ভালোবাসা নিয়ে যারা নবিজি ﷺ-এর বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করে, তারা ছাড়া কেউ ঠিক বুঝে উঠবে না।

আমি যে গল্পটা তোমাদের শোনালাম, এটা চমৎকার এক হাদীসগ্রন্থ, ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল-মুফরাদ' থেকে শুনিয়েছি। বইটার নামটাই তো অন্যরকম সুন্দর! 'আল-আদাবুল মুফরাদ'। মানে 'অনুপম শিষ্টাচার'। আসলেই অনুপম! তুমি যদি প্রিয়নবিজির ﷺ অনন্য জীবনাদর্শকে জীবনের 'রোল মডেল' হিসেবে নিতে চাও, পরিশীলিত ও নন্দিত জীবনাচারে নিজেকে অলংকৃত করতে চাও, তোমার জন্যে এই বইটা শুধু উপকারীই নয়, উপাদেয়ও বটে! আরবি খুব ভালো পারো না? চিন্তা নেই, বাংলাঅনুবাদসহ পাবে। এই বইটা বইয়ের তাকে অথবা পড়ার টেবিলে রেখে দাও। একবসায় শেষ করে ফেলো, এমন পরামর্শ আমি দেবো না। তোমার যখন ইচ্ছে হয়, মাঝেমধ্যে একটা পাতা উল্টিয়ে দেখো। তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না, বদলে যাওয়ার এবং বদলে দেওয়ার গান কখন তোমার কণ্ঠে বাজতে শুরু করেছে!

ওহহো, কী থেকে কী শুরু করলাম? না না, যে গল্প করছিলাম, তাতেই ফিরে যাই। এই যে নবিজি ﷺ বৃষ্টিফোঁটার স্পর্শ নিলেন, এ কথাটা জানার পর আমি আমার ইচ্ছের কথা আম্মুকে বলেছিলাম। এরপর থেকে যখনই বৃষ্টিতে ভিজতে চাই, আম্মু আমাকে আর বকা দেন না। অনেক মুহাদ্দিস তো প্রথম বৃষ্টিতে ভেজাকে মুস্তাহাব বলে গিয়েছেন! তাই আমার মাঝেমধ্যেই শখ জাগে বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে মাখতে। হীরের কুচি বৃষ্টি যখন খালি গা স্পর্শ করে, তখনকার অনুভূতিটাই অনির্বচনীয়! তাই বলে তুমি যখন-তখন বৃষ্টিতে কাকভেজা হতে যেয়ো না। অসুখ বাঁধিয়ে ফেললে তো আসল ইবাদাতগুলোই ঠিক মত করতে পারবে না।

আচ্ছা, বৃষ্টির সময় আমাদের নবিজি ﷺ আর কী কী করতেন?

কেমন হয়, যদি উত্তরটা 'আইশা ﵂ থেকে নেওয়া যায়?

তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, বৃষ্টির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে চাইতেন, যেন এই বৃষ্টি উপকার বয়ে আনে, স্বস্তির কারণ হয়ে আসে। কী বলে দু'আ করতেন? খুব ছোট্ট একটা বাক্য: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

(আল্লাহুম্মা সাইয়িবান নাফি'আ)

"আল্লাহ, আমাদের জন্যে উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করো।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এটা বুখারীর বর্ণনা।[৯৫]

আবূ দাউদের বর্ণনায়[৯৬] আরেকটি চমৎকার দু'আ এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝেমধ্যে এটাও বলতেন: اللَّهُمَّ صيبًا هنيئًا

(আল্লাহুম্মা সাইয়িবান হানীআ)

"আল্লাহ, আমাদেরকে স্বস্তিদায়ক বৃষ্টি দাও।"

তিনটা শব্দই তো! মুখস্থ করে রাখতে তিনবারের বেশি পড়াই লাগে না।

আমি তো বসেই আছি ব্যালকনিতে, বৃষ্টিও থামার নাম নেই। আমবাগানের দিকে দুরন্ত কিশোরেরা হইহই রব তুলে ছুটে যাচ্ছে। 'ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়াতে সুখ!' খড়ের স্তূপ থেকে উপরদিকের খড়গুলো উড়ছেই। শাব্বির চাচার কপালে ভাঁজ পড়ে। প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করেন, 'কী বেহায়া বাতাস এগুলা!' চাচার বড় ছেলে মাদরাসায় পড়ে। কোমরে গামছা পেঁচিয়ে সে মাঠে দৌড়াচ্ছে ধবল গাভীটাকে গোয়ালে নিয়ে আসার জন্যে। বাবার মুখে কথাটা শুনে তার ভ্রু কুঁচকে যায়। ঠিক করে রাখে, বাড়িতে আসার পর বুঝিয়ে বলবে, বাতাসকে গালি দেওয়া আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় কাজ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা নিষেধ করেছেন।[৯৭] বাবা মেনে নেবেন বলেই তার বিশ্বাস, একটু বদরাগী হলেও অন্য আর দশ জনের মতো গোঁয়ার স্বভাবের ননতিনি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসেন, সাধ্যমতো চেষ্টাও করেন আদেশ-নিষেধের সীমারেখা লঙ্ঘন না করার জন্যে। এই তো, গেল বছর প্রচণ্ড খরার পর যখন বৃষ্টি এলো, শাব্বির চাচা খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'শনি কাইট্যা গ্যাছে গা, বিষ্টি আইছে।' আমি নিজ কানে শুনেছি, তাঁর বড় ছেলে বাবাকে বুঝিয়ে বলেছিলো, 'বাবা, কোনো গ্রহের দিকে সম্পর্কিত করে বলাটা আল্লাহ পছন্দ করেন না। শির্কের গোনাহ অনেক কঠিন! এভাবে না বলে চলো আমরা ঠিক সে ভাষাতেই খুশিটা প্রকাশ করি, যে ভাষায় নবিজি ﷺ তাঁর আনন্দকে প্রকাশ করেছেন:

مطرنا بفضل الله ورحمته [৯৮]

(মুতিরনা বিফাদ্বলিল্লাহি ওয়ারাহমাতিহী)

"আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টিস্নাত হলাম।"

চাচার খুশি তো উপচে পড়ার অবস্থা। 'ধুর ব্যাটা, আগে শিখাইবি না? কত সুন্দর কতা! শুইনলেই কইলজা ঠান্ডা হয়া যায়।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বর্ষাকাল কবিদের প্রিয় ঋতু। সৃষ্টিমুখরতাই কবিদের সুখী করে। আর বৃষ্টিমুখর দিন মানেই তো সৃষ্টিমুখর দিন। কদম-কেয়ার গাছ বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে সৌরভপ্রসূ হয়ে ওঠে। বর্ষায় নদীর মাছগুলো উজানের দিকে আসে, ডিমধারণ করে, সৃজনের গর্বে তার গর্ভ ফুলে ওঠে। বর্ষার ছোঁয়ায় গাছে গাছে নতুন পাতার সৃষ্টি হয়। মৃত আঁটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে জীবন্ত চারাগাছ। যেন-বা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ[৯৯]

"তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। পৃথিবীভূমি মরে যাওয়ার পর তাকে আবার জীবন্ত করেন। তোমাদেরকেও এভাবে (মাটি থেকে) বের করা হবে।"

বিশ্বাসী কবিদের সৃষ্টিমুখরতা নতুন মাত্রা পায় এই বৃষ্টিমুখরতায়। কারণ তারা চোখের সামনে দেখতে পায় আল্লাহর বাণীর যথার্থতা। চোখের এই দৃষ্টি তাদের অন্তর্দৃষ্টিতে রেখাঙ্কন করে। তৈরি হয় শুদ্ধতম কবিতার নতুন স্কেচ। আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টি যেন একটা সুতো নিয়ে আসে পৃথিবীর বুকে। এই সুতোয় বাঁধা পড়ে শুদ্ধাচারী হৃদয়। পতনোন্মুখ বৃষ্টিসুতোয় ঊর্ধ্বমুখ হয় তাদের বিশ্বাস। তেমনই একজন কবির মুখে শোনো তাঁর অনুভূতির কথা:

"বৃষ্টি একটা খোলস মাত্র। আসল কথা হলো খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসা অঙ্কুরের মুখই হলো কাব্যের প্রেরণা। কোনো আধার বা আধেয় নয়, উদ্ভব ও উদ্ভেদই হলো বৃষ্টির সৃজনশীলতার প্রকৃত রহস্য। এই রহস্যের স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি কাব্যরচনা করি এবং এ কথা জানি প্রতিটি রহস্যের ভেতরেই আমাকে প্রবেশ করতে হবে এবং পার্থিব প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে পৌঁছতে হবে ভাসমান মেঘের ভেতরে।"[১০০]

পার্থিব ভাবনার সুতোয় মেঘের দেশে যাওয়ার অনুভূতি শুধু কবিকে পেলেই চলবে? আমরা যাঁরা মেঘের স্রষ্টাকে বিশ্বাস করি, তাঁর অসীম শক্তি ও ক্ষমতার কাছে অবনত হই, আমাদেরও কি খেয়াল করার প্রয়োজন নেই? আছে বটে!

বাতাসের ঝাপটা বেড়ে গেছে হঠাৎ। নারকেলের দুয়েকটা শাখা ঝড়ের সাথে টাল সামলাতে পারেনি, ঝরে গেলো। কৃষ্ণচূড়ার গাছটা গোড়াসহ দুলে উঠছে। হারুন চাচার মনে শঙ্কা বেড়ে যায়। টিনের চালটা বোধহয় এক্ষুনি খুলে যাবে। মানুষ কতটা অসহায়! এই বাদলধারা, এই শক্তিশালী বাতাস আমাদের পূর্বে কত জাতির জন্যে শাস্তি হয়ে এসেছিলো! যদি কুরআনটা নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করতাম, বোঝার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জন্যে আগ্রহী হতাম, তাহলে গল্পগুলো আমার অজানা থাকতো না। হূদ ﷺ-এর জাতিকে এমন সর্বগ্রাসী বাতাস দিয়েই তো আল্লাহ শাস্তি দিয়েছিলেন! অনেকক্ষণ তো আমার কথা শুনেছো, এবার সরাসরি কুরআনের কাছ থেকে গল্পটা শোনো তাহলে। সূরা আহকাফের পাঁচটা আয়াত পড়লেই গল্পটা পরিষ্কার হয়ে যাবে:

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُوا
أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا
الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * فَلَمَّا رَأَوْهُ
عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ
فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

"স্মরণ করুন 'আদ জাতির ভাইয়ের (হূদ) কথা, যখন তিনি বালুকাময় পাহাড়ে তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছিলেন—তাঁর পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী বিগত হয়েছে—এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও 'ইবাদাত কোরো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি। তারা বললো, তুমি কি আমাদের উপাস্যগুলো থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছো? তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে যে শাস্তি নিয়ে আমাদের জন্যে আশঙ্কা করছো, তা নিয়ে এসো। তিনি বললেন, এ জ্ঞান আল্লাহর কাছেই, আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা-ই তোমাদের কাছে পৌঁছাই, আমি কিন্তু দেখছি তোমরা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত সম্প্রদায়। তারপর তারা যখন আমার আযাবকে মেঘরূপে দেখলো, যেটা তাদের উপত্যকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, তারা বললো, এটা সেই মেঘ যা আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। বরং এটা তো সেই জিনিস, যার জন্যে তোমরা অস্থির হয়ে গিয়েছিলে। এটা এমন বাতাস, যাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। বাতাস তার রব্ব-এর আদেশে সবকিছু ধ্বংস করে দিলো। তারা এমন অবস্থায় সকালে উপনীত হলো, বসতগুলো ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। আমি এভাবে অপরাধী জাতিকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"[১০১]

এরকম আয়াত কতই তো পড়ি! ইমামের পেছনে কত্তবার শুনেছি! কিন্তু আমার ভাবনার সায়রে কোনো ঢেউ ওঠে না। আমার চিন্তাকে নাড়া দেয় না। দেবে কীভাবে? আমি কি বোঝার চেষ্টা করি? করি না। আমি কি সুস্থির হয়ে একবসায় পাঁচটা, শুধু পাঁচটা আয়াত বুঝে পড়ার জন্যে ইচ্ছে রাখি? রাখি না। আমার সময় হয় না। আমার সময় হয় ঘণ্টা পাঁচেক ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ফেসবুকের নিউজফিড স্ক্রল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করার জন্যে। আর যদি আয়াতের আবেদনগুলো বোঝার মতো সামর্থ্য আমার থাকে, তাহলে হৃদয়ঙ্গম করার আন্তরিকতা আমার থাকে না। অবচেতনে পড়েই যাই, অর্থ বোঝার আনন্দে অর্থহীন আত্মতৃপ্তিতে ভুগি। সুসংবাদের আয়াত আসলে আমাদের নবিজি ﷺ-এর চোখ-মুখ ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত হতো। আমার হয়? হয় না। কুরআনের একটা আযাবের আয়াত শুনে দুইমাস ধরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন 'উমার ﷺ। সে ইতিহাস কি আমার অজানা? কুরআন পড়তে গিয়ে অত্যধিক কান্নার দরুন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ ﷺ-এর দুই কপোলে অশ্রুর দাগ বসে গিয়েছিলো, আমি কি সে কথা সীরাতের পাতায় পড়িনি? তাহলে আমি এমন নিষ্প্রাণ, নিঃসাড় ও নির্জীব হলাম কেন? আমাকে উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। কারণ আমি কুরআনকে ভালোবাসার যে দাবি করি, সে দাবিতে সত্যবাদী হতে চাই।

হূদ ﷺ-এর জাতির জন্যে বাতাস যে আযাব হয়ে এসেছিলো, সে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্মরণ করে ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। বাতাসের ঝাপটা আমাদের বোধ-চিন্তায় নাড়া না দিলেও সাইয়িদুল মুরসালিন ﷺ-এর ভাবনা তরঙ্গায়িত হতো ঠিকই। উম্মুল মুমিনীন 'আইশা ﷺ আমাদেরকে একটি সত্যগল্প শোনাচ্ছেন:

"আর যখন আকাশ মেঘে ছেয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তিনি ঘরে ঢুকতেন আর বের হতেন, সামনে-পেছনে ইতস্তত হাঁটাচলা শুরু করতেন। যখন বৃষ্টি শুরু হতো, তখন তিনি চিন্তামুক্ত হতেন। এটা তাঁর চেহারা দেখে বোঝা যেত। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: শোনো 'আইশা, এটা তো 'আদ জাতির কথার মতোও হতে পারতো! (তারপর তিনি এই আয়াতটি[১০২] পড়লেন:

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا

"তারা যখন আমার আযাবকে মেঘরূপে দেখলো, যেটা তাদের উপত্যকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, তারা বললো, এটা সেই মেঘ যা আমাদের বৃষ্টি বর্ষণ করবে।"[১০৩]

হূদ ﷺ এর জাতি 'আদ' এই মেঘকে মনে করেছিলো বৃষ্টি বয়ে আনবে, কিন্তু বয়ে নিয়ে এসেছিলো আযাব। আমরাও যে মেঘকে বৃষ্টিবহনকারী হিসেবে ধারণা করছি এই মুহূর্তে, সেটাও যে আযাব হয়ে আসবে না, তার কী নিশ্চয়তা? সেজন্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই ব্যাকুলতা। শুধু ব্যাকুল হয়ে বসে থাকতেন না তিনি, আল্লাহর কাছে হাত তুলতেও ভুলতেন না।

ঝড়োহাওয়া ও বাতাস আমাদের জন্যে কল্যাণ ও অকল্যাণ দুই-ই বয়ে নিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসতে পারে। তাই আমাদের নবিজি ﷺ বাতাসের প্রবাহ বেড়ে গেলে দু'আ করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ[১০৪]

"আল্লাহ! তোমার কাছে যাচনা করছি, বাতাসের কল্যাণকর দিক, বাতাসে নিহিত কল্যাণকর দিক এবং বাতাসের মাধ্যমে তুমি যা পাঠিয়েছো (মেঘ-বৃষ্টি), তার কল্যাণকর দিক। একইসাথে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, বাতাসের অকল্যাণকর দিক থেকে, বাতাসে নিহিত অকল্যাণকর দিক থেকে এবং বাতাসের মাধ্যমে তুমি যা পাঠিয়েছো, তার অকল্যাণকর দিক থেকে।"

যখন বাতাস বয়ে যাবে, তখন এই দু'আটি আমরাও পড়তে পারি।

একটি সুন্নাহ পালন হয়ে গেলো!

বায়ুপ্রবাহের সময় আরেকটি ছোট দু'আরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হাদীসে[১০৫]। সালামা ইবনুল আকওয়া' ﷺ বলছেন:

যখন খুব জোরে বাতাস বইতে শুরু করতো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন:

اللَّهُمَّ لَقْحًا ، لاَ عَقِيمًا

"আয় আল্লাহ! বাতাসকে বৃষ্টিমুখর করো, বৃষ্টিহীন নয়।"

বাতাস আল্লাহর অনেক সৈন্যের মধ্যে একটি। এই সৈন্যের মাধ্যমে আল্লাহ কোনো কোনো জাতিকে শাস্তি দিয়েছেন, আবার সাহায্যও করেছেন। আল্লাহর একজন নাবি সুলাইমান ﷺ। আল্লাহর আদেশে বাতাসের প্রবাহ তাঁর অনুগত হয়ে গিয়েছিলো।[১০৬] আমাদের নবিজি ﷺ-কেও আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন ঝড়োবাতাসের মাধ্যমে। এই গল্প মনে করার জন্যে আল্লাহ আদেশ করেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا [১০৭]

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের কাছে এসেছিলো, তারপর আমি তাদের ওপর ঝড়োবাতাস বইয়ে দিয়েছিলাম এবং এমন সৈন্যদের পাঠিয়েছিলাম, যাদের তোমরা দেখতে পাও নি। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে

এটা আহযাব যুদ্ধের ঘটনা। এই যুদ্ধকে 'খন্দকের যুদ্ধ'ও বলা হয়।

এই যুদ্ধের গল্পটা শোনা যাক।

পঞ্চম হিজরীর কথা। মদিনা থেকে ইয়াহূদী নেতৃবর্গ মক্কার কাফিরদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে বের হলো। উদ্দেশ্য, সবাই মিলে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করবে। খ্রিষ্টানরাও তাদের সাথে যোগ দিলো। মুশরিক, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান সবাই সম্মিলিতভাবে বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা অভিমুখে রওনা হলো। এই বাহিনীতে ছিলো প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা। মদিনার চারপাশে তারা জমায়েত হতে লাগলো। এদিকে মুসলিমদের করুণ অবস্থা। সবাই প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর, শীতের প্রকোপও ছিলো ভয়ানক, সংখ্যায়ও ছিলো শত্রুদের তুলনায় কম। কোনো কোনো কপট মুসলিম ঈমানহারাও হয়ে যাচ্ছিলো। এই সঙিন অবস্থার বর্ণনা আল্লাহ কুরআনে দিয়েছেন[১০৮]:

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

"সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিলো উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি হতে, এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিলো, তোমাদের প্রাণ হয়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে অবহিত হবার পর সাহাবিদের ﷺ সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। সাহাবি সালমান আল-ফারসী ﷺ একটা অভিনব পরামর্শ রাখলেন। পারস্যে থাকা অবস্থায় তাঁর যুদ্ধাভিজ্ঞতালব্ধ বিচক্ষণতা থেকে মনে হলো, মদিনার উত্তর পাশে প্রশস্ত পরিখা খনন করা যেতে পারে। তাহলে শত্রুবাহিনী আক্রমণের জন্যে এগোতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমানের পরামর্শ অনুমোদন করলেন এবং পরিখাখননের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পরিখাকে আরবিতে 'খন্দক' (خندق) বলা হয়।

পরিখাখননের কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অংশগ্রহণ করেছেন। নিজ হাতে তিনি মাটিবহন করেছেন। একে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা, তার ওপর আবার একদম সকালবেলা, এই অবস্থায় আনসার ও মুহাজির সবাই পরিখাখনন করছিলেন। তাদের ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কাতর চেহারার দিকে চেয়ে প্রিয় নবিজি ﷺ দুটো সুন্দর পঙ্‌ক্তি আওড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং দু'আ করেছিলেন।[১০৯] পঙ্‌ক্তি দুটো আমরা কাব্যানুবাদের চেষ্টা করেছি।[১১০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এটা আহযাব যুদ্ধের ঘটনা। এই যুদ্ধকে 'খন্দকের যুদ্ধ'ও বলা হয়।

এই যুদ্ধের গল্পটা শোনা যাক।

পঞ্চম হিজরীর কথা। মদিনা থেকে ইয়াহূদী নেতৃবর্গ মক্কার কাফিরদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে বের হলো। উদ্দেশ্য, সবাই মিলে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করবে। খ্রিষ্টানরাও তাদের সাথে যোগ দিলো। মুশরিক, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান সবাই সম্মিলিতভাবে বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা অভিমুখে রওনা হলো। এই বাহিনীতে ছিলো প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা। মদিনার চারপাশে তারা জমায়েত হতে লাগলো। এদিকে মুসলিমদের করুণ অবস্থা। সবাই প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর, শীতের প্রকোপও ছিলো ভয়ানক, সংখ্যায়ও ছিলো শত্রুদের তুলনায় কম। কোনো কোনো কপট মুসলিম ঈমানহারাও হয়ে যাচ্ছিলো। এই সঙিন অবস্থার বর্ণনা আল্লাহ কুরআনে দিয়েছেন[১০৮]:

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

"সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিলো উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি হতে, এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিলো, তোমাদের প্রাণ হয়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে অবহিত হবার পর সাহাবিদের ﷺ সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। সাহাবি সালমান আল-ফারসী ﷺ একটা অভিনব পরামর্শ রাখলেন। পারস্যে থাকা অবস্থায় তাঁর যুদ্ধাভিজ্ঞতালব্ধ বিচক্ষণতা থেকে মনে হলো, মদিনার উত্তর পাশে প্রশস্ত পরিখা খনন করা যেতে পারে। তাহলে শত্রুবাহিনী আক্রমণের জন্যে এগোতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমানের পরামর্শ অনুমোদন করলেন এবং পরিখাখননের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পরিখাকে আরবিতে 'খন্দক' (خندق) বলা হয়।

পরিখাখননের কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অংশগ্রহণ করেছেন। নিজ হাতে তিনি মাটিবহন করেছেন। একে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা, তার ওপর আবার একদম সকালবেলা, এই অবস্থায় আনসার ও মুহাজির সবাই পরিখাখনন করছিলেন। তাদের ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কাতর চেহারার দিকে চেয়ে প্রিয় নবিজি ﷺ দুটো সুন্দর পঙ্‌ক্তি আওড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং দু'আ করেছিলেন।[১০৯] পঙ্‌ক্তি দুটো আমরা কাব্যানুবাদের চেষ্টা করেছি।[১১০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

اللهم إن العيش عيش الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة

"প্রকৃত জীবন হলো অনন্ত জীবন আখিরাতের
প্রভু তুমি ক্ষমা করো আনসার-মুহাজিরদের।"

অবিচল বিশ্বাস ও অটুট আস্থার কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব সিংহহৃদয় সাহাবিগণও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এই ছান্দসিক উক্তিতে সাড়া দিয়েছেন কাব্যিক ভঙ্গিতেই। একদিকে মাটিখনন ও বহন করছিলেন, একইসাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রত্যুত্তর করার জন্যে ছন্দে ছন্দে নিজেদের দৃপ্ত মনোবলের ঘোষণাও দিচ্ছিলেন। তাঁদের উচ্চারিত পঙ্‌ক্তিগুলোকেও আমরা কাব্যানুবাদে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো। তাঁরা বলছিলেন:

نحن الذين بايعوا محمدا * على الجهاد ما بقينا أبدا

"আমরা তো তাঁরা, যাঁরা রাসূলের হাত–
ধরে নিয়েছিলো জিহাদের বায়'আত,
অটুট রবো, যদ্দিন থাকবে হায়াত।"

এভাবে তাঁদের পরিখাখননের কাজ চলছিলো। আরেক হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, পরিখাখননের কাজ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহর দেহ ধুলো ধূসরিত হয়ে পড়েছিলো। ঐ অবস্থায় প্রিয় নবিজি ﷺ নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করছিলেন[১১১] আরও কিছু ছান্দসিক উক্তি আওড়ানোর মাধ্যমে। হাদীসে বর্ণিত[১১২] সেই কাব্যিক অভিব্যক্তি আমাদের কাঁচা হাতের কাব্যানুবাদে কেমন ফুটে আসে, দেখা যাক।

والله لولا الله ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا * وثبت الأقدام إن لاقينا

إن الألى قد بغوا علينا * إذا أرادوا فتنة أبينا

"শপথ প্রভুর, তিনি আমাদের দেখালেন পথ, অন্যথা—
হতো না এই সালাত আদায়, পেতাম না এ বদান্যতা।
আমাদের 'পর নাযিল করো প্রশান্তি, দাও দৃঢ় মনোবল—
ওদের মুখোমুখি হলে আমাদেরকে রেখো অটল।
ওদের যারা আমাদেরকে দেখিয়েছে শত্রুতা, ছল;
আমাদেরকে দীনবিচ্যুত করতে চেয়ে হয়নি সফল।"

এ ধরনের পরিখাখনন করে শত্রু প্রতিহিত করার কৌশল আরবে আর কখনো যুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়নি। পারস্যে এই কৌশল ব্যবহার করা হতো। আবু সুফিয়ানের বাহিনী এই অভিনব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হতবিহ্বল হতে বাধ্য হলো। তাছাড়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দু'আ করেছেন। আল্লাহ তাদের জন্যে ঝড়োবাতাস পাঠিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অদৃশ্য ফেরেশতারাও এসে সম্মিলিত কাফির-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিলেন। আবু সুফিয়ানের বাহিনী কিছুটা মুখথুবড়ে পড়লো, আর বাকিরা প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে বাধ্য হলো।

এই হচ্ছে আহযাব তথা খন্দকের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। [১১৩]

এই গল্পের শুরুতে দেখেছো, সম্মিলিত কাফির-বাহিনীর মদিনাঘেরাও করার প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেছেন। নবিজি ﷺ-এর চমৎকার সব সুন্নাহর একটি সুন্দর দিক হলো পরামর্শ করা। শলা-পরামর্শ করা জীবনের সব ক্ষেত্রেই উপকার বই অপকার আনে না। বিজ্ঞজনদের বিজ্ঞ মতামত, প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা, সবকিছু সামনে রেখে একটি সুন্দর উপসংহারে পৌঁছা যায়। আমরা কেউ পূর্ণাঙ্গ নই, বোধবুদ্ধির সীমাবদ্ধতা আমাদের আছে, তাই আল্লাহও সব কাজে আমাদের পারস্পরিক শলা-পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে বলেছেন। কুরআন অনুযায়ী, এটি মুমিনদের একটি বিশেষ গুণ। [১১৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিন্তু যেন তেন মানুষ নন, সরাসরি আল্লাহর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহামানব তিনি। তবুও সাহাবিদের সাথে বিভিন্ন সময় পরামর্শ করেছেন তিনি। শুধু খন্দকে নয়, বদর ও উহুদেও সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেছেন। যুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে রাসূলুল্লাহর পরামর্শগ্রহণ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইফকের ঘটনায়ও তিনি পরামর্শ চেয়েছেন। [১১৫] পরিবারের সাথে পরামর্শ করারও সুন্দর দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ রেখে গিয়েছেন। হুদায়বিয়াতে এসে নবিজি ﷺ সাহাবিদেরকে পশু কুরবানি ও মাথার চুল মুণ্ডানোর আদেশ দিলেন। দেখা গেলো, কেউ কাজ শুরু করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা দেখে ব্যথিত হলেন এবং সহধর্মিণী উম্মু সালামাহ'র কাছে এলেন। তিনি খুব বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন তাঁর পশু কুরবানি করে ফেলেন এবং হালাকও (চুল মুণ্ডন) সেরে ফেলেন। এ-ও অনুরোধ করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন কাজ শেষ করার আগে কারও সাথে একটা কথাও না বলেন। নবিজি ﷺ তা-ই করলেন। বেরিয়ে এসে কারও সাথে কোনো কথা না বলে কুরবানি করলেন, হালাককারীকে ডেকে মাথার চুলও ফেলে দিলেন। সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরবানি ও হালাক করতে দেখে তাড়াতাড়ি নিজেরাও পশুকুরবানি করতে শুরু করলেন এবং একে অপরের মাথা মুণ্ডন করে দিতে লাগলেন। [১১৬] উম্মুল মুমিনীনের পরামর্শ ঠিকই ফললো।

অন্যের পরামর্শ ও মতামতকে গুরুত্ব দেয়া উদারতার পরিচায়ক এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা বিধায়ক। প্রিয় নবীজ ﷺ-এর কথাই ধরো। তিনি একজন আল্লাহর রাসূল, কিন্তু একজন সাহাবির পরামর্শকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহর নবী, কিন্তু সহধর্মিণীর পরামর্শকেও বিবেচনায় রেখেছেন। আমরা পরামর্শ করি তো? কেউ পরামর্শ দিলে তার প্রতি উষ্মা প্রকাশ করি না তো? 'আমার চেয়ে কে বেশি বুঝে?'—এমন দম্ভোক্তি আমাদের কথা বা কাজে দৃষ্ট হয় না তো?

দম্ভ বা অহংকার কখনোই ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসে না। একটু আগে আদ জাতির ওপর আযাব আসার যে গল্প আমরা শুনেছি, সেই জাতিটাও ছিলো প্রচণ্ডরকম দাম্ভিক। দম্ভ ও অহংকার তাদের ঈমানগ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিলো, এবং শেষমেশ আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন করিয়েই ছেড়েছিলো। তারা কেমন সদর্প আস্ফালনে অভ্যস্ত ছিলো, সেটা কুরআনে স্পষ্টভাবেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন। এর ফলে তাদের শোচনীয় পরিণতি তো আমরা জেনেছিই। কুরআনের আরেক জায়গায় একই গল্পটা বলা হয়েছে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে[১১৭]:

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ.

"আদ জাতি তো পৃথিবীতে অযথাই দম্ভ করেছিল আর বলেছিল: আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর আবার কে? তারা কি দেখেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর? আর তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত। তাই আমি তাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনাকর শাস্তি ভোগ করানোর জন্য কতিপয় অশুভ দিনে তাদের উপর প্রচণ্ড বাতাস পাঠিয়েছিলাম। আর আখিরাতের শাস্তি তো আরও বেশি লাঞ্ছনাকর। তারা সেখানে কোনো সাহায্য পাবে না।"

পুরোপুরি এক সপ্তাহ ধরে তাদের উপর এই বাতাস বয়ে গিয়েছিলো। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে উৎপাটিত খেজুর গাছ যেমন ভূপাতিত হয়ে পড়ে থাকে, আদ জাতির ওপর বয়ে যাওয়া অবিরত ঝঞ্ঝাবায়ু বন্ধ হবার পরও একই চিত্রই দেখা গেলো। মৃত মানুষগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিলো, ঝড়াক্রান্ত কিছু খেজুর বৃক্ষ মুখথুবড়ে পড়ে আছে। কুরআন বলছে:

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ [১১৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"যে ঝঞ্ঝাবায়ু তিনি তাদের ওপর অবিরাম প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত ও আটদিনব্যাপী। আপনি (যদি) তাদেরকে দেখতেন, (মনে হতো,) তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে।"

চিত্রটা কল্পনা করলেই তো গা শিউরে ওঠে! আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, অহংবোধ যেন কোনোভাবেই আমাদেরকে আল্লাহর হুকুমের সামনে অবনত হওয়া থেকে বিরত রাখতে না পারে। আমাদের চারপাশে অনেক অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদীকেই দেখা যায়, আল্লাহর আনুগত্য করার জন্যে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, আর এই অস্বীকারের পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে একটি দর্শন: 'সবার উপরে মানুষ সত্য / তাহার উপরে নাই'। যতদূর জানা যায়, মধ্যযুগের এক বাংলা কবি বড়ু চণ্ডীদাস উক্তিটি করেছিলেন। বুঝে না-বুঝে আমরা অনেকেই এই ধরনের উক্তি ব্যবহার করে থাকি। যখন এ উক্তিকে ব্যাখ্যা করে আল্লাহর সামনে নত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়, পৃথিবীতে উদ্ধত জীবনাচারে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তখন উক্তিটি নিঃসন্দেহেই আমাদের বিশ্বাস ও চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। আমাদের বিশ্বাসের মূল আবাহন তো এই যে, আমরা সবকিছুর উপরেই আল্লাহর হুকুমকে স্থান দেই। সুতরাং আমাদেরকে যেন এ জাতীয় দর্শন অবচেতনে আকর্ষণ না করে। আমরা যেন ভুলে না যাই দাম্ভিক ও উদ্ধত আদ জাতির সমুচিত পরিণতির কথা। তারা ছিলো আমাদের চেয়ে বহুগুণে সমৃদ্ধ। শক্তি-সাহস ও শৌর্য-বীর্যে দারুণ প্রতাপশালী এক জাতি তারা। দৈহিক গড়ন ছিলো স্তম্ভের মতো সংহত, খুঁটির মতো লম্বা। কুরআন বলছে, তাদের মতো এরকম প্রতাপশালী জাতি আল্লাহ আর সৃষ্টি করেননি।[১১৯] তারাও কিন্তু বাঁচতে পারেনি আল্লাহর পাকড়াও থেকে। তারাও কিন্তু সবার উপরে নিজেদেরকেই সত্য বলে জানতো। অহংমন্যমান হবার কারণে শেষমেশ শোচনীয় পরিণতিতে আপতিত হতে হয়েছে। কাজেই, এ ধরনের উক্তি বা এর সমার্থক যেকোনো মুখরোচক বাণীর প্রভাবে যেন আমরা নিজেদেরকে ভুলে না যাই, উদ্ধত মনোভাব যেন উদ্গত না হয় আমাদের অন্তঃকরণে। আল্লাহর কাছে সমর্পিত হতে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় কোনোপ্রকার অহমিকা বা আত্মাভিমান।

বাদলধারা অসম্ভবরকম বেড়ে গেছে। মাঠ-ঘাট থইথই। প্রায় সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির সাথে হালকা বেগে ঝড়োহাওয়াও দেখা যাচ্ছে। সূর্যটা মেঘের পর্দা সরিয়ে সারাদিনে একবার উঁকি দিতে পেরেছে কি না সন্দেহ। সম্ভবত এরকম কোনো একটা দিনেই লংফেলো'র সেই কবিতাটা লেখা হয়েছিলো:

"The day is cold, and dark, and dreary;
It rains, and the wind is never weary."[১২০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"দিনটা ভীষণ শৈত্যপূর্ণ, বিষাদ-ঢাকা, অন্ধকারে ছাওয়া
বাদলধারা ঝরছে কেবল, ক্লান্তিবিহীন বইছে ঝড়োহাওয়া।"

পুকুর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। গোলাকার পুকুর, টইটম্বুর পানি, পিতলবরন চেহারা—দোতলার ছাদ থেকে তাকালে মনে হয় পাঁচ টাকার একটা বৃহদাকার কয়েন কেউ বসিয়ে রেখেছে। আমার দৃষ্টিতে পুকুর কখনো এভাবে ধরা দেয়নি। প্রাচীন আরবকবি 'আনতারা বিন শাদ্দাদের চোখে বৃষ্টিপূর্ণ জলাশয়কে মনে হতো স্বচ্ছ রৌপ্যমুদ্রার মতো। তার দেয়া উপমাকে মিলিয়ে দেখার জন্যে একদিন ভরাবাদরের দিনে ছাদে উঠে গিয়েছিলাম। ছাদ থেকে পুকুর খুব সুন্দর দেখা যায়। দেখলাম, ঠিকই মিলেছে। 'আনতারার চোখে রৌপ্যমুদ্রা মনে হয়েছিলো। আমি তো রৌপ্যমুদ্রা দেখিনি, দেখেছি দুই টাকা বা পাঁচ টাকার রুপালি কয়েন। সেটার সাথেই মিলিয়ে নিলাম। ইচ্ছে হলে তুমিও দেখতে পারো। তবে পুকুরের পানি যদি ঘোলাটে হয়, কিংবা পুকুর যদি কানায় কানায় পূর্ণ না হয়, তাহলে দেখে লাভ নেই। ঐ যে, আমরা কথা বলতে বলতেই পুকুরের পানি এই বুঝি উপচে পড়লো! বিলের পানিতে শাপলা ভাসছে। শালুক সংগ্রহ করার জন্যে কাউকে অবশ্য বেরোতে দেখা যাচ্ছে না। প্রবল বারিবর্ষণে ধবল গরুটাও গোয়ালে আটকা পড়েছে। আর এক প্রহর এভাবে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকলে সারা গাঁ তলিয়ে যেতে পারে।

এমন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দু'আ করতেন[১২১]:

اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

"হে আল্লাহ! আমাদের চারপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়ী অঞ্চলে, মালভূমিতে, মাঠের অভ্যন্তরে ও গাছপালা গজানোর স্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করুন।"

অতিবর্ষণের সময় আমরা এই দু'আটি করতে পারি।

আমি যে বারান্দায় বসে আছি, তার অদূরেই পাশাপাশি কয়েকটা টিনের ছাউনির ঘর। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার ছন্দ যে অনুভব করেনি, সে আদতে কবি নয়। অথবা কবি হলেও তার কবিত্ব অপূর্ণতার অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। ঝুমঝুম রব তুলে একটানা বৃষ্টিপতনের শব্দ টিনের চালে যেভাবে ঝংকৃত হয়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দও এতটা ঝংকার বয়ে আনতে পারে না। নগরজীবনের ডামাডোলেও তাই একটু কান পাতলেই আমি যেন শুনতে পাই মেঘের মাদলে বেজে ওঠা ছন্দবাদল। বস্তুত গ্রামীণ জীবনটাই ছন্দের ঐন্দ্রজালিকতায় পূর্ণ। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ যেমন ছন্দের উৎস, তালে তালে উঠানামা করা পদচালিত ঢেঁকির আওয়াজও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছন্দের পাদপীঠ। কুলা দিয়ে চাল ঝাড়ার সময় কত তাল-লয় সৃষ্টি হয়, তার খোঁজ কে রাখে? দুইদুয়ারি ঘরের পিঁড়ায় বসে যখন পানদুপুনিতে সুপারি চূর্ণ করা হয়, ছন্দব্যঞ্জনার অভাব থাকে তখন?

গতকাল বিলের কোমরসমান পানিতে কলা গাছের ভেলা ভাসিয়েছিল অনেকে। শখ করে আমিও তাদের সাথে উঠেছি। কলা গাছের ভেলায় চড়ে ডুবু ডুবু গ্রাম দেখা হয়ে গেলো অনেকদিন পর। গ্রামীণ আনন্দের উপকরণে প্রমোদতরীর ভূমিকায় থাকে কলা গাছের ভেলা। যেতে যেতে বিলের ধারে কলমিলতা ফুলের সাক্ষাৎ মিলেছে অনেকবার। দোপাটি ফুলটা একবারের জন্যেও দেখতে পেলাম না। একটানা বৃষ্টি থামার পর সন্ধ্যার দিকে সমস্বরে ভেক-সংগীত শোনা হয়ে গেলো। ভেক-সংগীত মানে বুঝলে না? 'ভেক' মানে ব্যাঙ। এবার কিছু বোঝার বাকি আছে?

বর্ষাকালে এখানে-ওখানে বিপুল পরিমাণে ব্যাঙের ছাতা গজাতে দেখা যেতো। ব্যাঙ সারাবছর পানিতেই থাকে, পানিতেই ডাকে। বৃষ্টি এলে ছাতার নিচে আশ্রয় নেয়ার দরকারটা কী তার? বৃষ্টিতে ভিজলে আমাদের সর্দি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু বৃষ্টিজলেই যার আজীবন আবাস, তার সর্দি হওয়াটা একেবারে হাস্যকর ও অবাস্তব। এজন্যে অসম্ভব ও অবাস্তব কিছু বোঝাতে আমরা বলে থাকি 'ব্যাঙের সর্দি'। 'ব্যাঙের ছাতা' নামকরণটাও এক ধরনের 'ব্যাঙের সর্দি'। কে যে এই নাম দিয়েছিল!

ছোটবেলায় আমরা কখনো ব্যাঙের ছাতার ধারেকাছে ঘেঁষতাম না। বলতে গেলে এই নিরীহ উদ্ভিদটাকে একপ্রকার অবজ্ঞাই করা হতো। এখনো 'ব্যাঙের ছাতা' নামটা শুনলে অনেকের অরুচি বাঁধে, কিন্তু এটারই ইংরেজি নাম 'মাশরুম' বললে জিভে পানি চলে আসে!

মাশরুমের স্যুপ খেতে খেতে চলো আমরা নজরুলের একটা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা শুনে আসি। এই কবিতার প্রথম লাইনটি বলে ফেললে উদ্ধৃতাংশটি বোঝা সহজ হবে: 'নখ-দন্তবিহীন চাকুরি-অধীন আমরা বাঙালি বাবু।' আসল জায়গায় আসা যাক:

"হাঁচি টিকটিকি সিন্নি মানিয়া
পরান-পাখিরে রেখেছি ধরিয়া,
দেখে ব্যাঙের ছাতারে উঠি চমকিয়া
ভয় হয় বুঝি তাঁবু ॥
এগজামিনের লাঠি ধরে ধরে
দাঁড়াই আসিয়া আপিসের দোরে,
মাইনে যা পাই তাই দিয়ে খাই
কদলী আর অলাবু ॥"[১২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যা বোঝার বুঝে নাও।

মুশকিল হচ্ছে, কদলী আর অলাবু কী জিনিস, সেটা তোমাকে চিনিয়ে দিতে হবে এখন। এই দুটোই তোমার পরিচিত। কদলী মানে কলা, আর অলাবু মানে লাউ। চিনতে পারলে? কিন্তু নজরুল তাঁর অভ্যাসমত খানিকটা অপরিচিত শব্দ নিয়ে এসেছেন বলে চিনতে পারছো না।

ব্যাঙ নিয়ে একটা মজাদার কবিতা আছে আরবিতেও। এটাকে কবিতা আকারেই বাংলায়ন করা যায় কি না, দেখা যেতে পারে

قالت الضفدعة قولا * فسرته الحكماء

في فمي ماء وهل ينطق * من في فيه ماء

"ব্যাঙ যা বলে তা বোঝাতে পারেন পণ্ডিত এবং জ্ঞানী
বলতে পারে সে কোনো কথা, যার মুখে ভরা থাকে পানি?"

এই প্রবাদতুল্য পঙ্‌ক্তি দুটো তখন বলা হয়, যখন কাউকে অনেক বেশি চাপের মধ্যে রেখে কথা বলতে বারণ করা হয়, আবার তার নীরবতার জন্যেও সমালোচনা করাহয়।

ব্যাঙ নিয়ে আমরা তো এখন মজাদারসব ছন্দ সামনে আনছি, কিন্তু এই ব্যাঙ একটা জাতির জন্যে দুঃখের কারণ হয়ে এসেছিলো। মূসা ﷺ-এর জাতি, আমরা যাদের বনু ইসরাঈল নামেই বেশি চিনি, তারা আল্লাহর হুকুমের সাথে যখন অনবরত গাদ্দারি করেই চলছিলো, আল্লাহ তাদের উপর বেশ কিছু আযাব প্রেরণ করেছিলেন। ব্যাঙ ছিলো তন্মধ্যে অন্যতম।[১২৩] তাদের ঘরবাড়িতে ব্যাঙ ঢুকে যেতো। খাবারদাবার ও পানপাত্র সবকিছু ব্যাঙে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতো। বিছানায় গেলে দেখতো ব্যাঙে ভরতি হয়ে আছে, ফলে শুতে পারতো না।[১২৪] ব্যাঙের পূর্বে এবং পরে আরও অনেক শাস্তি তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। একটা আযাব যখন তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলতো, তখন তারা অনুতপ্ত হতো। মূসা ﷺ আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, আল্লাহ সেই শাস্তি উঠিয়ে নিতেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর তারা আবার অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যেতো। তাদের এই শাস্তিচক্রের মধ্যস্থিত মনস্তত্ত্ব নিয়ে আল্লাহ বলেছেন:

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن
كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا
عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"যখন তাদের উপর শাস্তি নেমে আসত তারা বলত, 'হে মূসা! তোমার প্রভু তোমার কাছে যে-ওয়াদা করেছেন, সে-অনুসারে তুমি তাঁর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। তুমি যদি আমাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করব এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দেব।' কিন্তু যখন আমি তাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি সরিয়ে নিতাম সে-পর্যন্ত পৌঁছামাত্রই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।"[১২৫]

আমরা বনু ইসরাঈলের গল্পগুলো যখন পড়ি বা শুনি, তখন তাদেরকে নকড়াছকড়া করতে ভুলি না। কিন্তু আমরাও যে অবচেতনে তাদের মতো হয়ে পড়েছি, কখনো কখনো তাদের চে' একধাপ এগিয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছি, সে-কথা কিন্তু মনে রাখি না। খুব বেশিদূর যেতে হবে না, আবহাওয়া যখন খুব খারাপ থাকে, তখনকার পূর্বাপর সময়ে রেডিও/টিভি'র অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, আমরাও বনু ইসরাঈলের চরিত্র ধারণ করি। বড় আকারে কোনো ঘূর্ণিঝড় শুরু হওয়ার আশঙ্কা দেখা গেলেই রেডিও-টিভিতে অনবরত কুরআন তিলাওয়াত প্রচার করা হয়। কিছুক্ষণ পরপর শোনা যায় কায়মনোবাক্যে দু'আ-মুনাজাত। হারাম কোনো কন্টেন্ট একেবারেই নাই হয়ে যায়। যেই-না বাতাসের বেগ কমে আসে, অথবা আমাদের দেশ অতিক্রম করে চলে যায়, অথবা এখানেই তার তাণ্ডব শেষ করে ফেলে, অমনি আবার হারাম কন্টেন্ট প্রচার শুরু হয়ে যায়। এই পটপরিবর্তনে এক মুহূর্তও দেরি করা হয় না। শুধু বনু ইসরাঈলকে তিরস্কার করে জুগুপ্সা সেরে নিলে আখেরে কোনো লাভ নেই। আমরা নিজেদেরকেই যদি বিচার করতে না শিখি, নিজেদের দ্বৈতচরিত্র পরিবর্তনে উদ্যোগী না হই, তাহলে কুরআনের এই গল্প অধ্যয়নের হক তো আমরা আদায় করতে পারলাম না!

বর্ষার সুপরিচিত দৃশ্যগুলোর মধ্যে আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক বাদ পড়ে গেছে। গোচারণভূমি থেকে রুদ্ধশ্বাসে রাখালদের ছুটে আসা, সঙ্গে থাকা গরু-ছাগলগুলোর গোয়ালে ফেলার তাড়া, বিকট স্বরে হাম্বা হাম্বা ও ম্যা ম্যা চিৎকারের এজমালি বাতাবরণ এখনো কানে আসছে, চোখে ভাসছে।

হাদীসের ভাষায় আমরা সকলেই যার যার কর্মক্ষেত্রে একেকজন রাখাল। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته [১২৬]

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান/অভিভাবক, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা এখানে যে-শব্দটার (راع) অনুবাদ করেছি 'দায়িত্ববান/অভিভাবক', এটার মূল অর্থ কিন্তু 'রাখাল'। দুই থেকে তিনটা ছাগল একসাথে চরানো কতটা কঠিন কাজ, প্রত্যক্ষদর্শীমাত্রই তা জানে। সামনের দুপায়ের বল দিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ছাগলছানার গোঁ ধরে থাকা আর তার সুমতি ফিরিয়ে আনার জন্যে ক্রুদ্ধ রাখাল ছেলের যুদ্ধ এই কদিন আগেও দৃশ্যমান ছিলো। কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা ব্যতিরেকে এই কঠিন কাজ আঞ্জাম দেয়া যায় না। এজন্যেই আল্লাহ তাঁর সকল নবী ও রাসূলকেই ছাগল চরানোর কাজ দিয়েছিলেন।

হাদীসের সাক্ষ্য:

ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠান নি, যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবিগণ বললেন: আপনিও? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হ্যাঁ, আমি মক্কার কারারীত[১২৭] নামক জায়গায় ছাগল চরিয়েছি।"[১২৮]

প্রথম হাদীসটির শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও খোলামেলা ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের উপর কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, পরিবারের কর্তাব্যক্তি তাঁর পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, একজন রমণী জিজ্ঞাসিত হবেন বরের ঘর ও সন্তানসন্ততি সম্পর্কে, একজন দাসকেও জিজ্ঞাসিত হতে হবে তাঁর মালিকের সম্পদের ব্যাপারে। [১২৯]

আমরা যে যেখানে কর্তৃত্বশীল, সে-ব্যাপারে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। একজন রাখাল প্রচুর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা লালন করেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লেগে থেকে পুরো পশুপালকে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসেন। যেকোনো বিষয় বা পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকেও সেরকম দায়বদ্ধ হতে হবে, সহনশীলতা ও বিচক্ষণতার মাত্রাকে পৌঁছাতে হবে শিখরদেশে। রাখালকে তাঁর পশুর ঝাঁকের দিকে সতর্ক ও তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হয়, যেন কোনোভাবেই বেহাত না হয় বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে না পড়ে। পরিবারের কর্তাকেও সেরকম সজাগ থাকা চাই, যেন তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য শাইত্বানের চাঁদমারিতে ঢুকে না পড়ে। রাখাল খোঁজ রাখেন, কোথায় গেলে সবুজ তৃণভূমির দেখা মিলবে, সেখানেই তার পশুপাল নিয়ে চলে। একজন আদর্শ রমণীও তাঁর সংসারকে গড়ে তুলবেন সবুজ ফুলবাগিচারূপে। তাঁর সন্তানরা সেই ফুলবাগিচায় একেকটা ফুল হয়ে সৌরভ ছড়াবে, আর এ লক্ষ্যে একজন দক্ষ ও দরদী মালীর ভূমিকাতেও তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁদের যুগপৎ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভূমিকা হবে আল্লাহর সেই আদেশের আজ্ঞানুবর্তী:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [১৩০]

"মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"

চলো তবে, রাখাল হই!

গল্প করতে করতে লক্ষ করলাম, শিলাখণ্ডগুলো আকারে ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। দুয়েকটা অদম্য সাহসী কিশোর এসবের কোনো পরোয়া না করে ছুটেই যাচ্ছে। এমন মুহূর্তেও বিলের হাঁটুপানিতে মাছশিকারীদের উৎসব চলছে। জাল হাতে ছুটছে হারুন চাচার মেঝ ছেলে। পশ্চিমের ছোট নদী থেকে কিছু খেয়া বিলে নিয়ে আসা হচ্ছে। বৃষ্টির মাত্রা যত বাড়বে, বিলের পানি তত উপরের দিকে উঠবে। নদীর মত এখানেও খেয়াপারাপারের চাহিদা বেড়ে যাবে। চৌধুরিপাড়ায় তালগাছের নৌকার ভালো চাহিদা। এই গ্রামে তালগাছও নেই তেমন, মাঝিরাও তালের নৌকা বানানোয় অভ্যস্ত নয়। সগির ভাইয়ের ইচ্ছা আছে, বর্ষা নামলেই মাল্লাপাড়ায় কোনো কারিগরের শিষ্য হয়ে যাবে।

এই যে বৃষ্টির সাথে শিলা পড়তে দেখছো, এটা দেখেও আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, জানো? সূরা শু'আরার পাতায় আঁকা লূত ﷺ-এর জাতিকে মনে পড়ে আমার। কামনা চরিতার্থ করার জন্যে আল্লাহপ্রদত্ত বৈধ নিয়ম না মেনে তারা সমলৈঙ্গিক সম্পর্ক স্থাপন করতো। ফলে আল্লাহ তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন। এই নোংরা কাজ আল্লাহর কাছে এতটাই অপছন্দনীয় যে, শাস্তি দিয়ে তাদের তো ধ্বংস করেছেনই, তাদের জনপদকে একেবারেই উল্টে দিয়েছেন, পৃথিবীর বুকে তাদের ধ্বংসাবশেষকেও জায়গা দেননি। তৎপূর্ব শাস্তিটাও যেন তেন ছিলো না। স্বাভাবিক ঝড়োবাতাস বা অন্যকোনো পরিচিত দুর্যোগে তাদের মৃত্যু ঘটেনি। আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি এসে তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিলো। আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন[১৩১]:

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

"তারপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।"

লূত ﷺ-এর জাতির উত্তরসূরি, তাদের অপকর্মের চৈন্তিক উত্তরাধিকারীরা আমাদের চারপাশে হঠাৎ করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, খেয়াল করছো তো? পাথরের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বৃষ্টি কি আমাদের জন্যেও তবে অবধারিত হবার সময় চলে আসছে? এসো, সবাই মিলে নিজেদের প্রশ্ন করি।

তোমার খুব ইচ্ছে করছে শিলা কুড়াতে? ঠিক আছে, বাকি গল্প নাহয় শিলা কুড়ানোর পরেই হবে।

তুমি শিলা কুড়াচ্ছো। আমবাগানে দুরন্ত শিশুগুলো প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শিলা কুড়ানোর সাহস তাদের হচ্ছে না। থেমে থেমে বজ্রপাতের আওয়াজ ওদেরকে কিছুটা ভীত করে তুলছে। হাদীস অনুযায়ী, অত্যধিক বজ্রপাত কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার একটি লক্ষণ।[১৩২] বজ্রপাতের পূর্বাপর সময়ে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আল্লাহর ভয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে এটি একটি মাধ্যম।[১৩৩]

কদমের ডালে পাতার ফাঁকে উঁকি দেয় সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ ফুলগুলো। পাতা চুইয়ে ঝরেপড়া বৃষ্টিকণা ফুলের গায়ে বোধহয় কিছুক্ষণ উম নিচ্ছে। আমার হাতে কয়েকটা কদম। ব্যালকনিতে অলস বসে থাকা অবস্থায় ফুলের উপরদিক থেকে পরাগকেশ একটা একটা ছিঁড়ে ফেলেছি। এখন ফুলটাকে একটা ন্যাড়া মাথার মতো লাগছে। আলসেমি জিনিসটা আসলেই খুব খারাপ। অকর্মণ্যতা সকল অকর্মের মূল। অলস বসে থেকে আমি ফুলের পরাগকেশ ছিঁড়ে ন্যাড়া করে দিয়েছি। আমার হাতে, কিন্তু আমার অজান্তে। অলস বসে থেকে দুনিয়া ও আখিরাতও কিন্তু শ্রীহীন হয় আমাদের হাতেই, এবং সেটাও আমাদের অগোচরে।

থাকগে, একটা ন্যাড়া ফুলের দিকে চেয়ে তত্ত্বকথা কপচানোর কী দরকার? ভালো কয়েকটা ফুল নিলেই তো হয়!

বৃষ্টির ঝাপটা কমে আসার পর কদম গাছের দিকে আগাতে থাকি। কে যেন ডেকে যায়:

"এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।"[১৩৪]

(কদমের আরেক নাম নীপ।)

কদম তো চোখ জুড়ালো, মন জুড়াবে কে?

অনতিদূরেই কেয়া ফুল ফুটে আছে। কেয়ার ঘ্রাণে মনও জুড়িয়ে যাচ্ছে।

কেয়া ফলকে দূর থেকে দেখেছে, আর প্রথম দেখায় তাকে আনারস ভেবে ভুল করেনি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেয়া পাতা যেমন দীর্ঘকায় দেহ একেবারে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রাখে, ফুলটাও পেয়েছে সেই একই চরিত্র। একেবারে হাত-পা এলিয়ে পড়ে থাকা মানুষের মতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের ছোটবেলায় মিছামিছি ঘরকন্না খেলা হতো। চট্টগ্রামে এটাকে বলা হয় 'খেশম-মেশম' খেলা। নারকেলের মালা দিয়ে বানানো হতো হাঁড়ি-পাতিল। মালায় বালু ভরে ভাত রাঁধা হতো। কলাপাতা ছিঁড়ে বানানো হতো প্লেট। মেহমান আপ্যায়নের ধরন ছিলো খুব অদ্ভুত। মেহমানকে শরবত দিতে হবে। কিন্তু চিনি পাবে কই? শরবতের বিকল্প আবিষ্কার করা হলো। প্রথমে মেহমানকে একটা আমলকি খাইয়ে দেয়া হতো। তারপর এক গ্লাস পানি দেয়া হতো। আমলকি খাওয়ার পর পানি জিবে লাগলে তো মিষ্টি লাগবেই! ব্যস, হয়ে গেল শরবত দিয়ে আপ্যায়ন। নানা ধরনের গাছের পাতা দিয়ে রাঁধা হতো হরেক পদের তরকারি। ছাল-উঠে-যাওয়া গাছ থেকে বাকল নিয়ে এসে মশলার জোগান দেয়া হতো। তারমধ্যে আবার শুঁটকি মাছ না থাকলে কেমনে হয়? চট্টগ্রামের মানুষ বলে কথা! আমপাতা দিয়ে চ্যাপা শুঁটকির অভাব পূরণ করা হলো। শুধু চ্যাপা শুঁটকি হলে চলবে না, ছুরি শুটকিঁও তো চাই। বাজার করার দায়িত্বে থাকা পিচ্চিটা কী করবে এখন? মাথায় এলো, অদূরেই কেয়া পাতা আছে! ব্যস, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো চাকুর সাহায্যে কেটে নিয়ে এলো কয়েকটা কেয়া পাতা। হয়ে গেলো ছুরি শুঁটকি মাছ। গোড়া থেকে পাতা কাটতে দিয়ে দুয়েকটা কাঁটা কিন্তু বিঁধে গেছে ইতোমধ্যে। এই খেলার দৃশ্য, এই পাতা কাটার চিত্র সবকিছু কালো অক্ষরের ছাপাতেই টিকে থাকবে; কখনো বাস্তবে ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ছোটবেলায় আমরা অবশ্য কেয়া ফুল খুব বেশি ফুটতে দেখিনি। মাঝেমধ্যে দুয়েকটা লক্ষ করেছি। ঘ্রাণটা তীব্র। কেয়ার ঝোপ কাঁটায় ভরা থাকতো বলেই হয়তো ফুলটার কাছাকাছি যাওয়া হতো না। কেয়াফোটার দৃশ্য বাস্তবে কম দেখা হলেও বাংলা কবিতায় মুহুর্মুহু কেয়া ফুল ফুটতে দেখেছি। দুয়েকটা উদাহরণ দেয়া যাক।

- নজরুলের সুরে:

"রিমি ঝিম রিমি ঝিম ওই নামিল দেয়া!
শুনি শিহরে কদম, বিদরে কেয়া ॥
ঝিলে শাপলা কমল
ওই মেলিল দল,
মেঘ-অন্ধ গগন, বন্ধ খেয়া ॥"

[রিমি ঝিম রিমি ঝিম, *গুল-বাগিচা*]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

- ফররুখের ছড়ায়:

"নদীতে নাই খেয়া যে
ডাকল দূরে দেয়া যে
কোন সে বনের আড়ালে
ফুটল আবার কেয়া যে!"

- রবীন্দ্রনাথের কবিতায়:

"পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।"

[৬, ছড়া]

নজরুল ও ফররুখ দুজনের কবিতাতেই একটা শব্দ এসেছে: 'দেয়া'। এমন অদ্ভুত জায়গায় ক্রিয়াবাচক শব্দ বসতে দেখে অবাক লাগছে, তাই না? আসলে এটা আমাদের পরিচিত ক্রিয়া 'দেওয়া' বা 'দেয়া' নয়। এটা একটা বিশেষ্য, সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ: মেঘ। এবার যেখানে খটকা লেগেছিল, সেখানে মেঘ বসিয়ে দিয়ে অর্থ মিলিয়ে নাও।

এই দুজনের কবিতায় একটা শব্দ মিল পাওয়া গেছে। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার মিল আছে তিনজনের কবিতাতেই। 'কেয়া' ও 'খেয়া'। খেয়াল করে দেখো, সবার কবিতাতেই 'কেয়া' ও 'খেয়া' দুটোরই উল্লেখ আছে। শুধু এই তিনজন নয়, বাংলা ভাষাভাষী কবিদের সান্ত্যমিল কবিতায় যেখানেই 'কেয়া' এসেছে, সেখানেই অবধারিতভাবে 'খেয়া'র উল্লেখ আছে। দুয়েকটা হয়তো ব্যতিক্রম থাকবে। একটা কারণ এই যে, কেয়া ও খেয়া দুটোই বর্ষাঋতুর অংশ। বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখতে গেলে তাদেরকে বাদ দেয়া যায় না। তার চেয়েও জোরালো কারণ সম্ভবত এই যে, অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে কেয়া ও খেয়া উভয়েই একে অপরের জন্যে জমজ ভাইয়ের মতো।

সান্ত্যমিল ছড়া-কবিতায় আরেকটা সুপরিচিত মিল দেখা যায় 'কেউ' এবং 'ঢেউ'-এর মধ্যে। এ-যাবৎ যত ছড়া বা কবিতায় কোনো পঙ্‌ক্তির শেষে 'ঢেউ' আসতে দেখেছি, পরবর্তী পঙ্‌ক্তির শেষে অতি অবশ্যই 'কেউ' এসেছেই। অথবা প্রথমে 'কেউ' আসলে পরেরটাতে 'ঢেউ' না এসে থাকেনি। এরা শুধু জমজ ভাই-ই নয়, জমজ চাঁপাকলার মতো অঙ্গাঙ্গিভাবেই থাকে সবখানে। এখানেও কয়েকটা উদাহরণ দেয়ার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। শুধু এক রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই দেখা যাক:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(ক) তখন যদি রে এই কাঠখানা মনে একটুকু তোলে ঢেউ–
একবার যদি মনে পড়ে তোর 'বুজি' বলে বুঝি ছিল কেউ!
[জন্মতিথির উপহার, *কড়ি ও কোমল*]

(খ) সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে ওঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্মরিত–তমাল–ছায়ে ভিজে চিকুর শুকায় বায়ে—
তাদের চেনে, চেনে না বা কেউ।
[৩৫, *উৎসর্গ*]

(গ) সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
'দিব না দিব না যেতে'—নাহি শুনে কেউ।
[যেতে নাহি দিব, *সোনার তরী*]

কী দেখতে পেলে? 'ঢেউ' আর 'কেউ'-এর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তাই না? খাসা অন্ত্যমিলের আরেক বরপুত্র নজরুলের কাছে আসা যাক এবার:

(ক) চারিদিক হতে ঘিরিয়া আসিছে হেরো অগ্নির ঢেউ,
যারা তাঁর পথে রহিবে, তাঁদের মারিবে না কভু কেউ!
[এ কি আল্লাহর কৃপা নয়?, *শেষ সওগাত*]

(খ) আমরা জানি না, জানে না কেউ,
কূলে বসে কত গুনিবো ঢেউ।
[গঙ্গা সিন্ধু নর্বদা কাবেরী যমুনা ওই, *গুল-বাগিচা*]

(গ) ওরা মাকড়সা, ওদের ঘরের ঘেরোয়াতে কভু যেয়ো না কেউ,
পোড়ো ঘরে থাকে জাল পেতে, ওরা দেখেনি প্রাণের সাগর-ঢেউ।
[এক আল্লাহ জিন্দাবাদ, *শেষ সওগাত*]

(ঘ) উঠিছে পড়িছে ভাঙিছে জানার ঢেউ,
হেরিতেছে ঢেউ সাগর হেরে না কেউ!
[অতল পথের যাত্রী, *সিন্ধু হিল্লোল*]

এখানেও একই অবস্থা, তাই না? 'ঢেউ' এলেই 'কেউ' আসে, 'কেউ' এলেই 'ঢেউ' আসে!

আচ্ছা, আমরা এই যে অন্ত্যমিলগুলো শখের বশে ডায়েরিতে টুকে রেখেছি, কেন রেখেছি? দুয়েকটা শব্দের মধ্যে মিল পেয়ে আমরা কতটাই না আনন্দিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়েছি! ভীষণ মজা পেয়েছি, উপভোগ করেছি। এমনকি সময় লাগিয়ে পড়ার সময় ডায়েরিতেও টুকে রেখেছি। সময়ে-অসময়ে ডায়েরিটা খুলে যখন এগুলো পড়ি, নিজের বিচিত্র শখ আর বিচিত্র পড়াপড়ি মনে করে হাসি আসে। এই একটা অকৃত্রিম হাসি 'অনেক মন খারাপ'কেই নাই করে দেয়।

কবিতাকে যখন ভালো লাগে, তখন কবিতার ভেতরে অন্ত্যমিলের অন্তঃমিল ও বিষয়ের আন্তঃমিল আমাদেরকে খুবই চমৎকৃত করে। তোমার কিছু বন্ধুকে দেখবে, কুরআন পড়ার সময়ও তারা এই কাজটা করে। কারণ, তাদের কাছে কুরআন ভীষণ ভালো লাগে। কুরআন তো আর কবিতার বই নয় যে, এখান থেকে অন্ত্যমিলের মিলগুলো সাজিয়ে লিখবে! তারা কী করে জানো? একটা বিষয়ের ওপর কুরআনে কোন জায়গায় আল্লাহ কী বলেছেন, সেগুলো টুকে রাখে। যার যেমন শখ আর কি! এতে লাভ কী হয়? কবিতার অন্ত্যমিল টুকে রাখলে সাময়িকভাবে আমরা আনন্দ পাই, চমৎকৃত হই, এইটুকুতেই শেষ। কিন্তু কুরআনের পাঠ থেকে যা কিছু টুকে রাখা হয়, সেগুলো জীবনকেই চমৎকৃত করে রাখে। আবার কিছু বন্ধুকে দেখবে, আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহর হাদীস থেকে নানা বিষয়ে আন্তঃমিল ও আন্তঃসংযোগ বের করে খুব আনন্দ পাচ্ছে! উপরে যতগুলো কবিতার পঙ্‌ক্তি দেখেছো, সবগুলোতে একই বিষয় বা একই শব্দের যোগসাজেশ দেখার পর তুমি নিশ্চয়ই বলে উঠেছো: 'ওয়াও, কী দারুণ!' এরাও তেমনই। তবে মিল খুঁজে বের করার পর কিংবা আন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কার করার পর তারা 'ওয়াও' বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। তারা মুগ্ধতাকে প্রকাশ করে থাকে 'সুবহানাল্লাহ!' বলে।

এই টুকে রাখার অভ্যাস জ্ঞানচর্চার জন্যে খুবই উপকারী, অর্জিত জ্ঞানকে জীবনে প্রতিফলিত করার কাজে খুবই সহায়ক। তুমিও শুরু করতে পারো। খুব গভীর কিছু নিয়ে ভাবার দরকার নেই। অথবা সূক্ষ্ম কোনো মিল-অমিল না পেলেও অসুবিধে নেই। সূচনাটা হোক বিষয়গত অন্তঃমিল ধরা থেকেই। ধরো, তুমি একজন তরুণ। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনাকে তুমি 'অরুণ' বলে বিশ্বাস করো। অরুণরাঙা তরুণ হতে চাও তুমি। এবার কী করবে? প্রত্যেক জুমাবার তুমি যখন সূরা কাহফ পাঠ করে থাকো[১৩৫], তখন সেখানে কয়েকজন তরুণের (আসহাবুল কাহফ) গল্প খুঁজে পাও, তাই না? তুমি এই তরুণদের গল্প ডায়েরিতে লিখে নাও। তোমার মনের মতোই সাজিয়ে লিখো। তাদের গল্প থেকে কী শিখতে পারছো, তুমি তাদের কাছ থেকে কী অনুপ্রেরণা পেয়েছো, লিখে ফেলো। এই বইয়ের 'রৌদ্রমুখর' প্রবন্ধগল্পের শেষ দিকে একটা সুন্দর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানেও অরুণরাঙা তরুণ হবার প্রবর্তনা আছে। আসহাবুল কাহফের গল্প ডায়েরির যে পাতায় শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই শুরু করো এই হাদীস নিয়ে তোমার অনুভূতি লেখার কাজ। তারপর যখনই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যেখানে এরকম অনুপ্রেরণামূলক আয়াত বা হাদীস পাবে, তারুণ্যকে অরুণরাঙা করার মন্ত্রণা পাবে, সবকিছুই সেখানে টুকে নেবে। সময়ে-অসময়ে ডায়েরিটা উলটে-পালটে দেখবে, পড়বে। ডায়েরির লেখার সাথে কথাবার্তা বলবে, মুচকি হাসি বিনিময় করবে। সময়গুলো কত সুন্দরভাবে কাটবে, হয়তো এখনই তা বুঝতে পারবে না। বোঝার জন্যে কাজটা শুরু করা চাই! করবো তো?

এবার এসো সেরকমই একটা আন্তঃমিলের গল্প শোনাই। এই গল্পও কিন্তু বর্ষাকে অবলম্বন করেই। বর্ষার দুটো চিত্র তোমাকে দেখাবো। একটি চিত্র কুরআনের পটে আঁকা, অন্যটি হাদীসের পটে। আল্লাহর বাণী ও তাঁর রাসূলের কথায় কী চমৎকার সাযুজ্য, সেটা দেখার চেষ্টা করবো। বৃষ্টিধারায় সিক্ত হতে হতেই এই গল্প শোনো।

আল্লাহর বাণীটা প্রথমে লক্ষ করি:

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

"তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর প্রতিটি স্রোতধারায় (নদীনালা) তা পরিমাণ মতো প্রবাহিত হয়। তারপর স্রোত অনেক ফেনা ভাসিয়ে আনে। তাছাড়া মানুষেরা গহনা বা তৈজসপত্র বানানোর জন্যে যে বস্তু আগুনে জ্বাল দেয় তা থেকেও অনুরূপ এক প্রকার ফেনা তৈরি হয়। এভাবেই আল্লাহ হক ও বাতিলের উপমা পেশ করেন। ফেনাগুলো স্রোতবাহিত আবর্জনার মত উধাও হয়ে যায়। আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা ভূমিতে থেকে যায়। আল্লাহ এভাবেই উপমাগুলো পেশ করেন।"[১৩৬]

উপমাটা কি খুব কঠিন লাগছে? না, একদমই সহজ। দেখো, বৃষ্টির পানি যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন স্রোতের সাথে অনেকগুলো ফেনাও তৈরি হয়, তাই না? কিন্তু এই ফেনাগুলো বেশিক্ষণ দৃশ্যমান থাকে না। আর যে পানিটা বয়ে আসে? জমিন সেটা পরিমাণমতোই শুষে নেয়। জমিনের উর্বরা শক্তি বাড়িয়ে দেয়। কিংবা নদীর কথাই ধরো। সেখানেও পানিপ্রবাহের সময় অনেক ফেনা উৎপন্ন হয়। পানির অন্যান্য আবর্জনার মতোই ফেনাগুলো উধাও হয়ে যায়। কিন্তু পানির প্রভাব ঠিকই থেকে যায়। পানির সাথে ভেসে আসা পলিগুলোও থেকে যায় নদীর দুপাশের ভূমিতে। এই পানি ও পলিকে আল্লাহ তুলনা করেছেন হকের সাথে। আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাতিলের উপমা হিসেবে এনেছেন ফেনারাশিকে। ফেনা যেমন মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়, মিথ্যাও তেমনি একেবারেই ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য। পানি ও পলি যেমন জমিনের ঊষরতা কাটিয়ে উষসী করে দেয়, সত্য জিনিসটাও মানুষের জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ এখানে আরও একটা উদাহরণ এনেছেন। অলংকার তৈরির প্রক্রিয়াতেও কিন্তু ফেনা সৃষ্টি হয়। তবে সেই ফেনা কানাকড়ি পরিমাণ মূল্যও রাখে না। প্রক্রিয়া শেষে তৈরিকৃত অলংকার কিন্তু বহুমূল্য, অনেক দামি! হক হচ্ছে অলংকারের মতো, আর বাতিল হলো সেই ফেনার মতো!

কত সুন্দর তাঁর উপমা!

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী!

এবার এসো, প্রায় একই রকম চিত্রসংবলিত একটি হাদীসের দিকে তাকাই:

إن مثل ما بعثني اللَّه به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع اللَّه بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين اللَّه ونفعه بما بعثني اللَّه به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى اللَّه الذي أرسلت به.[১৩৭]

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও 'ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন; তার দৃষ্টান্ত সেই বৃষ্টির ন্যায়, যা কোনো জমিনে বর্ষিত হয়, আর সে-ভূমির উৎকৃষ্ট কতকাংশ পানি গ্রহণ করে এবং প্রচুর তরতাজা ঘাস-পাতা উৎপন্ন করে।

আর কতকাংশ হল অনুর্বর মাটি, যা পানি আটকিয়ে রাখে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার পৌঁছান এবং মানুষেরা তা থেকে পান করে, পান করায় ও পশু চরায়।

এই বৃষ্টি জমিনের আরও কিছু অংশে বর্ষিত হয়। এই অংশগুলো টিলাময়। কোনো পানিও ধারণ করে না, কোনো লতাপাতাও উৎপন্ন করে না।

এই উপমা সেইসব লোকের, যারা আল্লাহর দীনের জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এবং আল্লাহ তাদেরকে সেই হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে অলংকৃত করেন, যা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। তারা জ্ঞান অর্জন করে এবং জ্ঞান শিক্ষা দেয়। আর (তৃতীয়) উপমাটি সেইসব লোকের, যারা তার প্রতি মাথা তুলেও তাকায় না এবং আল্লাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হিদায়াতকে গ্রহণ করে না, যদ্বারা আমি প্রেরিত হয়েছি।"

এই হাদীসটাতে হিদায়াত ও 'ইলমকে তুলনা করা হয়েছে বৃষ্টির সাথে। এই হিদায়াত ও 'ইলম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণিবিন্যাসকে বোঝানো হয়েছে বৃষ্টিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভূমির পার্থক্যকে সামনে এনে।

১.ক) বৃষ্টি এলো, জমিন সে পানি তার গর্ভে সঞ্চারণ করলো, প্রচুর গুল্মতরু জন্ম নিলো।

১.খ) লোকটি জ্ঞান অর্জন করলো, তার জীবনে জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটালো, অন্যরাও সেই জ্ঞান থেকে উপকৃত হলো।

২.ক) বৃষ্টি এলো, জমিন সে পানি নিজের গর্ভে সঞ্চারণ করেনি, তবে ধরে রেখেছে। সেখান থেকে পানি নিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারছে।

২.খ) লোকটি জ্ঞান অর্জন করেছে, নিজের জীবনে খুব বেশি প্রতিফলন করতে পারেনি, তবে জ্ঞান তার মধ্যে মওজুদ আছে। তার জ্ঞান থেকে অন্যরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে।

৩.ক) বৃষ্টি এলো, উঁচু পাথুরে জমিন সে পানি ধরেও রাখতে পারেনি, কোনো উদ্ভিদও জন্মাতে পারেনি।

৩.খ) আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত ও 'ইলম এসেছে, কিন্তু হতভাগা লোকটি সেখান থেকে কিছুই গ্রহণ করেনি, তার জীবনে কোনো প্রভাবও রাখেনি, অন্যরাও তার মাধ্যমে কোনো উপকার পায়নি।

কী! মিলিয়ে নিতে পেরেছো?

খেয়াল করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, দীনের জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব মানুষই এই তিন শ্রেণির কোনো-না-কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত! স্বাভাবিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস না করে আল্লাহর রাসূল ﷺ চমৎকার কিছু বোধগম্য উপমার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আগের আয়াতটিতেও আমরা দেখেছি, আল্লাহ তা'আলা প্রায় কাছাকাছি একটি উদাহরণ পেশ করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়েছেন। নবিজি ﷺ পৃথিবীর কোনো শিক্ষকের ছাত্রত্ব বা কোনো গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি, আল্লাহই ছিলেন তাঁর শিক্ষাদাতা। আল্লাহই যাঁর শিক্ষাদাতা, তাঁর উপমাশৈলী এমন বাস্তবানুগ ও চমৎকার না হয়ে কি পারে, বলো? আবার নবিজি ﷺ কিন্তু আমাদের জন্যে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছেন। একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্যে অনুসরণীয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ও অনুকরণীয় সব অনুষঙ্গই রাসূলুল্লাহর জীবনে ছিলো, পঠন-পাঠনের অনুপম ও অভিনব সব পদ্ধতি ও উপকরণও রাসূলুল্লাহর সীরাত আমাদের সামনে তুলে ধরে। বোধগম্য উদাহরণ পেশ করার মাধ্যমে কোনোকিছু বুঝিয়ে দেওয়া তো সার্থক শিক্ষকেরই বৈশিষ্ট্য।

এবার গল্পের কথাতেই আসা যাক। যে তিন ধরনের ব্যক্তির উদাহরণ হাদীসে এসেছে, তুমি কোনটা হতে চাও? নিশ্চয়ই প্রথমটা! বৃষ্টিমুখরতায় সৃষ্টিমুখর হবার জন্যে, নিষ্ফলা মাঠে সবুজ হাসি ফোটাবার জন্যে, নিজেকে সার্থক করতে এবং নিজের পরিমণ্ডলকে সার্থকতায় শামিল করার জন্যে প্রথম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবার বিকল্প নেই! এই জীবন এবং এই জীবনের পরে অপেক্ষমাণ অনন্ত জীবন —দুটোকেই শস্য-শ্যামল করে তোলার জন্যে চলো আমরা বৃষ্টিসিক্ত উর্বর জমিন হয়ে যাই!

আকাশ থেকে গুড়ুম গুড়ুম শব্দ ভেসে আসছে। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলক আরও ঘন হয়ে আসছে। ঘন অন্ধকার, ঘরদোরে বন্ধ দ্বার। হঠাৎ কোথাও কড়াৎ করে বাজ পড়ে। আমরা শুধু শব্দই শুনি, কিন্তু এই বজ্রগুলোও যে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, সেটা কিন্তু শুনি না। শ্রবণেন্দ্রিয়ে শুনতে না পেলেও আমাদের বিশ্বাসে তা ঠিকই অনুরণিত হয়। কারণ, কথাটি আল্লাহই বলেছেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ [১৩৮]

"তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেশতা, তাঁর ভয়ে। তিনি বজ্রপাত ঘটান। অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে বজ্র দিয়ে আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিমান।"

তারা কীভাবে আল্লাহর প্রশংসা করে, আমরা শুনি না। আমরা তা দেখতেও পাই না। কিন্তু আয়াতের পরবর্তী অংশে বজ্রপাতের মাধ্যমে শাস্তির যে কথা আল্লাহ বলেছেন, তা কিন্তু আমরা দেখতে পাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা সুসংহত জাতি ছিলো, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভয়ানক বজ্রপাতের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কুরআনের আয়নায় সে চিত্রটি কীভাবে বিম্বিত হয়েছে, দেখা যাক।

আমরা যাদের গল্প বলবো, তাদেরকে বলা হতো 'সামূদ' (ثَمُود) জাতি। এই জাতির পূর্বপুরুষের নাম সামূদ, তাই তাদেরকে এ নামে ডাকা হতো। হিজায ও তাবূকের মাঝামাঝি একটা জায়গা ছিলো হিজর। জাতিটা এখানেই বসবাস করতো। সেজন্যে কুরআনে তাদের আরেকটা পরিচয় এসেছে: আসহাবুল হিজর[১৩৯] (হিজরের অধিবাসী)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই জাতির জন্যে আল্লাহ একজন নবি পাঠিয়েছিলেন, তাঁর নাম সালিহ ﷺ।

সামূদ জাতি ছিলো অভাবনীয় সমৃদ্ধির অধিকারী। কী ছিলো না তাদের? সুগঠিত সভ্যতার অধিকারী ছিলো তারা। স্থাপত্যশৈলীতে তারা অতুলনীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছিল।[১৪০] সামরিক প্রতিরক্ষায়[১৪১], অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সমুন্নত জীবনমান অর্জনে[১৪২] তাদের ঈর্ষণীয় সাফল্য ছিলো চোখে পড়ার মতো। মোটাদাগে তাদের এই পরিচয়গুলো কোনো ঐতিহাসিকের গবেষণা ও কল্পনা মিশ্রিত কথার ভিত্তিতে নয়, কুরআনই এভাবে তাদের পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পরিচয়ের ভিত্তিস্বরূপ কুরআনের যে আয়াতগুলো আমরা পাদটীকায় সংযুক্ত করেছি, সেগুলো খুলে দেখলেই বুঝতে পারবে।

আল্লাহর নবি সালিহ ﷺ তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। আল্লাহকে ভয় করার জন্যে আহ্বান জানালেন।[১৪৩] আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উপাস্যকে বর্জন করার জন্যে[১৪৪], আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার জন্যে[১৪৫] সালিহ ﷺ তাঁর জাতির প্রতি অনুরোধ রাখলেন। তাদের ওপর আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার আহ্বানও জানালেন তিনি[১৪৬]। কিন্তু তারা তা মান্য করলো না। উলটো সালিহ ﷺ-কে যাদুগ্রস্ত, জ্বীনের আছরপ্রাপ্ত ইত্যাদি বলে উপহাস করতে লাগলো।[১৪৭] একপর্যায়ে তারা সালিহ ﷺ-কে বললো, তিনি যেন এমন কোনো মু'জিযা দেখান, যাতে তারা তাঁর নবিত্ব নিয়ে নিঃসংশয় হতে পারে:

فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ [১৪৮]

"তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে কোনো নিদর্শন উপস্থিত করো।"

ইমাম ইবন কাসীর জানাচ্ছেন,

তারা সবাই একত্রিত হয়ে সালিহ ﷺ-কে বললো: এই মরুভূমি থেকেই আপনি একটা উটনী বের করে আনেন। উটনীটা কেমন হবে, তার কিছু বৈশিষ্ট্যও তারা বললো। সালিহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, তাঁর জাতির আকাঙ্ক্ষিত বিষয় যেন তিনি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা মরুভূমিকে আদেশ করলেন, মরুর বুক চিরে বিশালকায় এক উটনী বেরিয়ে এলো। এটা দেখে তৎক্ষণাৎ বেশ কিছু লোক ঈমান আনলেও তাদের বেশিরভাগই ঈমান গ্রহণ করলো না।[১৪৯]

আল্লাহ এই উটনীটাকে তাদের জন্যে পরীক্ষা হিসেবে পাঠালেন। তাদের কূপ থেকে উটনী একদিন পান করতো, তারা করতো অন্যদিন। উটনীকে কোনোরূপ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কষ্ট না দেয়ার জন্যে আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করলেন[১৫০]। কিছুদিন এভাবে চলার পর শাইত্বান তাদেরকে বোঝালো, উটনীটা না থাকলে প্রতিদিনই তারা কূপের পানি পান করতে পারবে[১৫১]। তারপর উটনীকে হত্যা করা হলো। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, দম্ভোক্তি সহকারেই সালিহ ﷺ-কে বললো: يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ। "হে সালিহ! তুমি যদি সত্যিই রাসূল হয়ে থাকো, তাহলে সেই শাস্তি নিয়ে এসো, যার কথা বলে আমাদেরকে ভয় দেখাতে।"[১৫২]

কী ঔদ্ধত্য!

তারপর কী হলো?

কুরআন থেকেই শোনো:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [১৫৩]

"আর সামূদ জাতিকে তো আমি সৎপথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথে চলার পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করেছিল। তাই তাদেরই কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তির বজ্রাঘাত পাকড়াও করেছিল।"

খুব বেশি নয়, মাত্র একটি বজ্রপাত ভয়াবহ আওয়াজ ও বিকট গর্জন নিয়ে হাজির হয়েছিল আল্লাহর আদেশে। তারপর তাদেরকে ধ্বংস করে দলিত-মথিত খড়ের মতো করে দিয়েছিলো। সেটাও আল্লাহই বলছেন:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ [১৫৪]

"তাদেরকে আমি একটিমাত্র বিকট নিনাদ পাঠিয়েছিলাম, তাতেই তারা খোয়াড় নির্মাতার খড়ের মতো দলিত-মথিত হয়ে গিয়েছিল।"

সামূদ জাতি নিজেদের এই ভয়াবহ পরিণতির দিকে কীভাবে ঠেলে দিলো? এর পেছনে কয়েকটা দর্শন কাজ করেছে। কুরআন বলছে, তারা অপকর্মের শাস্তিকে মোটেও পরোয়া করতো না [১৫৫](وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا)। এটা খুব ভয়াবহ মানসিকতা। অপরাধকে যখন অপরাধ বলে মনে করা হয়, তখন অপরাধী একটা পর্যায়ে নিবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু অপরাধকে যখন সিদ্ধ বলে মনে করা হয়, তখন সেই অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাওয়া বৈ কমে না।

পাপ কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার অন্যতম হাতিয়ার হলো, পাপের প্রতিফল হিসেবে পেতে যাওয়া শাস্তির কথা স্মরণ করা। এছাড়াও পূর্ববর্তী যেসব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জাতি আল্লাহর অবাধ্যতার দরুন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, তাদেরও অধ্যয়ন করা জরুরি। ক্বিয়ামাতের সুকঠিন পরিস্থিতির কথা, সেদিন পাপীদের অসহায় অবস্থার বর্ণনা কুরআনে যেভাবে এসেছে, সেগুলোও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আমরা তো এসব বিষয়ে পাঠ করতে অবহেলা করি, পাঠ করলেও সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। কিন্তু এই জাতিগুলোর অবস্থা কুরআনে যেখানে এসেছে, সেগুলো পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাকুলতা কত বেশি ছিল, কল্পনাও করা যায় না। আখিরাতের জীবনে মুখোমুখি হতে যাওয়া বিপন্ন মুহূর্তগুলোর কথা তাঁকে কত বেশি চিন্তামগ্ন করতো, সে কথা ভাবতে গেলে নিজেকে লজ্জিত হতে হয়। আমরা কত বেশি গাফেল!

এক্ষণে হাদীস থেকে একটা গল্প শোনা যাক।

আবু বাকর ﷺ একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চুল তো সাদা হয়ে গিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সূরা হূদ, সূরা ওয়াক্বি'আহ, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা ও সূরা তাকওয়ীর আমার চুল সাদা করে দিয়েছে। [১৫৬]

এই সূরাগুলোতে ক্বিয়ামাতের কঠিন অবস্থা এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মর্মন্তুদ পরিণতির কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাগুলো অনুধাবন করে তাঁর উম্মাতের পরিণতি নিয়ে অধিক চিন্তায় মশগুল ছিলেন। তাঁর অত্যধিক ভাবনার দরুন স্বাভাবিক সময়ের আগেই চুল সাদা হতে শুরু করে। [১৫৭]

আমরা তাহলে কোথায়? কুরআনের আবেদন আমাদের ওপর প্রভাব ফেলে তো? আল্লাহর বাণীর মর্মতূণ আমাদের মর্মমূলে এসে বিঁধে যায় তো?

আমরা এই সূরাগুলো অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবো। আল্লাহর বাণীর কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে দেখবো। অবাধ্যদের কর্মফল কুরআনের আয়নায় দেখে নিজেকে সাবধান করবো। দাম্ভিকদের শোচনীয় পরিণতি যেন নিজেকে বরণ না করতে হয়, তজ্জন্য সতর্ক থাকবো। কিয়ামাতের বিভীষিকা থেকে যেন বাঁচতে পারি, সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। আল্লাহর কাছে হাত পেতে চাইবো। আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিন। তোমাকেও!

বিদ্যুৎ আর বজ্রের মিলিত সন্তাপ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় কুরআনের আরেকটা বাণীর কথা, যেখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও সত্যবিমুখ ব্যক্তিদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন[১৫৮]:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ
مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

"অথবা তাদের উপমা যেন আকাশের বৃষ্টিবাহী মেঘ, যার মধ্যে রয়েছে অন্ধকার, বজ্র-গর্জন ও বিদ্যুৎ-চমক; তারা মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙুল দিয়ে রক্ষা পেতে চাইছে। কিন্তু আল্লাহ তো কাফিরদের ঘেরাও করে রেখেছেন!"

আয়াতে বৃষ্টিবাহী মেঘ বলতে কুরআন উদ্দেশ্য। এখানে অন্ধকার থেকে আলোতে আসার পথনির্দেশনা যেমন আছে, আল্লাহর হুকুম না মানলে শাস্তি ও আযাবের ভয়প্রদর্শনও আছে। মুনাফিকরা এই কুরআন অবতীর্ণ হলে না শোনার ভান করে থাকতো। পাছে এমন কোনো নির্দেশ তাদের কাছে চলে আসে, যা পালন করা তাদের জন্যে কঠিন হয়ে যায়![১৫৯]

বজ্র যদি কারও মৃত্যুর কারণ হয়ে আসে, তাহলে কানে আঙুল ঢুকিয়ে কি রক্ষা পাওয়া যাবে? ঐ যে, কবি বলেছেন না—"অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?" না, বন্ধ থাকে না। এই সমস্ত লোক সেই বোকামোটাই করে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে কিছুক্ষণ হালকা আবরণ তোলার চেষ্টা করে নিজেকে বোঝাতে চায়, নাহ্ কোনো বজ্র পড়েনি। নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি, অথচ নিজের করুণ পরিণতির ব্যাপারে তার ভাবান্তর নেই। কানে আঙুল ঢুকিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার কোশেশ নয়, কিছুক্ষণ বজ্রধ্বনি শোনা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করতে পারে শুধু, কিন্তু শেষমেশ বজ্রাহত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করাটাই তার শেষ পরিণতি। কারণ, আল্লাহর আযাব তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। পালিয়ে কোথায় যাবে সে?[১৬০]

তারপর আল্লাহ বলছেন[১৬১]:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বিদ্যুতের ঝলকানি তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেবার উপক্রম করে। যখনই তা তাদের জন্য আলোর বিকিরণ ঘটায় তখনই তারা তাতে পথ চলে; আবার যখন তাদের ওপর অন্ধকার নেমে আসে তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ তো ইচ্ছে করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি একেবারে নিয়ে নিতে পারতেন। আল্লাহ তো সবকিছুই করার ক্ষমতা রাখেন।"

এই আয়াতে আরেক শ্রেণির কপট ব্যক্তিদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এদের সামনে এই বুঝি সত্য উদ্ভাসিত হয়, এই বুঝি সেই সত্যে সংশয় আসে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই বিজলি, এই আবার অন্ধকার। সন্দেহ-সংশয়ের দোলাচলে দুলতে থাকা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবেই ফুটেছে এখানে।[১৬২]

আয়াতের উপমা থেকে আরেকটা দিক প্রতিভাত হয়। তারা যখন চলার পথ মসৃণ ও নিষ্কণ্টক দেখে, তখন ঈমানের ওপর স্থির থাকে। যখনই পথটা বন্ধুর ও দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়, তখন ঈমানহারা হয়ে যায়। যখন সুসময় আসে, তখন মুসলমানিত্বে সে অটল। দুঃসময় যখন আসে, বিশ্বাসের কড়িকাঠ ঘুণে খেতে শুরু করে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ যখন বিরাজ করে, তখন তার উৎসাহে কোনো ভাটা পড়ে না। কিন্তু যখনই কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তখন তার ধাতে আর ধার থাকে না।

এ কথাটা ইমাম তাবারীও বলেছেন। মুনাফিকরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সামনে এলে বিপুল বিক্রমে সামনে এগোয়, দীনের ওপর অবিচল থাকার জন্যে প্রতিজ্ঞ হয়। যখনই তার নিজের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দীনদারিতার কারণে কোনো বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন ইসলাম ছেড়ে দেয়।[১৬৩]

এই যে তারা আযাবাশঙ্কাপূর্ণ ধ্বনি শুনেও না শোনার ভান করে, পেল্লয় প্রলয়ের এক ঝলক সামনে আসার পরও ভ্রুক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে, তারা এতটাই নাদান যে, আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি বধির ও অন্ধ বানিয়ে দিতে পারেন—এ কথাটাও মাথায় থাকে না। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিশালত্ব নিয়ে তার ধারণা নেই, কিংবা থাকলেও তাতে বিশ্বাস নেই, এজন্যেই তো খাল কেটে কুমির নিয়ে আসে, নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে নিজ হাতে ধ্বংস করে।

আমরা বজ্রপাতের শব্দ শুনে এতক্ষণ গল্পগুলো করেছি, তাই না?

এবার জেনে নিই, বজ্রধ্বনি শোনার পর আমাদের নবিজি ﷺ কী বলতেন।

সাহাবি 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর বলছেন: যখন বজ্র শোনা যেত, আল্লাহর রাসূল ﷺ কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। তারপর বলতেন[১৬৪]:

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

(সুবহানাল্লাযী য়ুসাব্বিহুর-রা'দু বিহামদিহী ওয়াল-মালাইকাতু মিন খীফাতিহী)

"সেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, বজ্র যার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে, ফেরেশতাগণ যাঁর ভয়ে তাসবীহ পাঠ করেন।"

তাহলে আরও একটা সুন্নাহর সাথে আমরা পরিচিত হয়ে গেলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তোমার দেখি শিলা কুড়ানো শেষ! এসো তবে শেষ গল্পটা শুনিয়েই ফেলি। বৃষ্টি দিয়ে আরও একটা সম্প্রদায়কে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছিলেন। এটাও সরাসরি কুরআন থেকেই শোনো। তবে আমি গল্পটা তোমাকে তুলে দিচ্ছি না। যদি কখনো সুযোগ হয়, কোনো এক বৃষ্টিস্নাত দিনে কুরআনটা খুলে দেখো। সূরা আল-ক্বামারের নবম আয়াত থেকে পড়া শুরু করো। সম্ভব হলে একটা তাফসিরগ্রন্থের সাহায্য নাও। দ্যাখো, আকাশের প্রবল বর্ষণ কীভাবে তাদের জন্যে মহাপ্রলয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সকরুণ পরিণতিটা তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে। আল্লাহর অবাধ্যতা সাময়িকভাজে উপভোগ্যতার কারণ হলেও কীভাবে চিরস্থায়ী হতভাগ্যতার উপলক্ষ্য হয়ে যায়; এই গল্প অনুধাবন করলে আমরা হয়তো বুঝতে পারবো।

অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, বৃষ্টির সময়টা দু'আ কবুলের একটা মুহূর্ত। খুশি লাগছে না শুনে? তোমার খুশির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সরাসরি হাদীসটা শুনিয়ে দিই[১৬৫]:

ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر

"দুইটি সময় আছে, যখন দু'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: আযানের সময় এবং বৃষ্টিবর্ষণের সময়।"

ওপাশের বাড়ি থেকে আতিক স্যারের বেসুরো গলায় বর্ষণগীতি ভেসে আসে:

"আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে
জানি নে, জানি নে
কিছুতে কেন যে মন ভালো লাগে না..."

স্যার না জানলেও আমি জানি, কেন তাঁর মন ভালো লাগে না। মন যিনি ভালো করে দিতে পারেন, তাঁর প্রতি স্যার আস্থা রাখেন না। মনের যিনি কারিগর, তাঁর সাথে স্যার যোগাযোগ রাখেন না। মনের সাগরে জোয়ার-ভাটা যিনি আনেন, তাঁকে মন খুলে হৃদয়ের কথা বলার সৌভাগ্য তাঁর হয়ে ওঠে না।

আমার মনেও মন খারাপের বাঁশি বেজেছিলো। আর্দ্র জলজ আবহাওয়ায়, এই গুমোট পরিবেশে কেমন যেন বিষণ্নতার আনাগোনা। কিন্তু আমার মন খারাপ বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি, কারণ মন ভালো করে দেয়া প্রিয়তম মালিকের কাছে আমি সব বেদনা সমর্পণ করে দিয়েছি।

এই বৃষ্টিস্নাত মুহূর্তে স্যারকে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, স্যার, জীবনের শেষদিন পর্যন্তও যদি এই গান গেয়ে যান, উত্তর খুঁজে পাবেন না। বিষণ্নতার প্রহরগুলো বিষণ্নতর হয়েই যাবে। 'জানি নে, জানি নে...' বলেই যেতে হবে আপনাকে। আমিও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একসময় গেয়েছিঃ 'জানি নে, জানি নে...'। কিন্তু এখন আর গাইতে হয় না। কারণ, মন খারাপের কারণ যেমন আমার জানা হয়ে গেছে, মন ভালো করার উপায়টাও আমার জানা। চলুন, তাঁর প্রতি সমর্পিত হই, তাঁর প্রতি বিনীত হই, তাঁর জন্যে নিবেদিত হই; দেখবেন মন খারাপের বাঁশিটা আপনার অন্তরে আর শোনা যাবে না।

বৃষ্টি থামলে না হয় স্যারকে গিয়ে বলা যাবে। আপাতত দু'আ কবুলের মুহূর্তটাকেই এখন কাজে লাগাই। আম্মু কদিন ধরে অসুস্থ; তাঁর সুস্থতার জন্যে আল্লাহকে বলি। ছোট ভাইটা সালাতে অমনোযোগী; তাঁর হৃদয়ের নিবিষ্টতার জন্যে আল্লাহর কাছে চাই। আমার খুব ইচ্ছে বায়তুল্লাহ যিয়ারাতের স্বপ্নটা তাড়াতাড়ি পূরণ হোক; এই ইচ্ছার প্রতিবিধানের জন্যে আল্লাহর নিকট ধরনা দিই। এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ের পাটাতনে দাঁড়িয়ে, উচ্ছল তারুণ্যের পাল যেন জান্নাতের বন্দরে গিয়ে ভিড়তে পারে, সেজন্যে আল্লাহর কাছে মনোবল প্রার্থনা করি, আত্মিক দৃঢ়তা ভিক্ষা চাই। আমার রব্ব ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আমার রব্ব বান্দার আকুতি শোনেন, বান্দার হৃদয়াবেগ তাঁর দুয়ারে কখনো আহত হয় না, কেবলই আদৃত হয়। তোমারও কি নেই কিছু চাওয়ার? আছে তো! চলো তাহলে, দুহাত তুলি তাঁর কাছে!

টীকা

৯৩. দাওয়াওঈন আশ-শি'র আল-'আরাবী 'আলা মাররিল 'উসূর, খ. ৩৩ পৃ. ৪১২
৯৪. সূরা ফাতির, ৩৫ : ৯
৯৫. সাহীহুল বুখারী: ৯৮৫
৯৬. সুনান আবূ দাউদ: ৫১০১
৯৭. উবাই ইবন কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ "তোমরা বাতাসকে গালমন্দ কোর না" [সুনান আত-তিরমিযী: ২২৫২]
৯৮. সাহীহুল বুখারী: ৮১০; সহীহ মুসলিম: ২৪০
৯৯. সূরা আর-রূম, ৩০ : ১৯
১০০. আল মাহমুদ, কবির সৃজন বেদনা, পৃ. ৮৮
১০১. সূরা আল-আহক্বাফ, ৪৬ : ২১–২৫
১০২. সূরা আল-আহক্বাফ, ৪৬ : ২৪
১০৩. সহীহ মুসলিম: ২১২২
১০৪. প্রাগুক্ত
১০৫. মুস্তাদরাক হাকিম: ৭৭৭০
১০৬. কুরআনের সাক্ষ্য: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ "অতঃপর আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার আদেশে অবাধে প্রবাহিত হতো, যেখানে সে পৌঁছাতে চাইতো।" [সূরা সাদ, ৩৮ : ৩৬]
১০৭. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৯
১০৮. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ১০
১০৯. সাহীহুল বুখারী: ৬৭৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১১০. এই বইয়ে যত কবিতা বা কবিতাংশের কাব্যানুবাদ করা হয়েছে, সব কটিই মাত্রাবৃত্তে অথবা স্বরবৃত্তে। শুধু এই পঙ্‌ক্তি দুটো অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনূদিত হয়েছে।
১১১. একটি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধের প্রাক্কালেও এই পঙ্‌ক্তিগুলো বলেছেন। [সহীহ মুসলিম: ১৮০৭]
১১২. সাহীহুল বুখারী: ৪১০৪।
মূল হাদীস:
عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا
১১৩. ফাতহুল বারী ও সীরাত ইবন কাসীর থেকে সংক্ষেপিত।
১১৪. আল্লাহর বাণী:
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
"আর যারা তাদের রবের আদেশ মান্য করে, সালাত কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।" [সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ৩৮]
১১৫. সাহীহুল বুখারী: ৬৯৩৫; সহীহ মুসলিম: ২৭৭৯
১১৬. সাহীহুল বুখারী: ২৫৮১
১১৭. সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৫, ১৬
১১৮. সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ৭
১১৯. সূরা আল-ফাজর, ৮৯ : ৬-৮
১২০. Ballads and other poems, p. 111.
১২১. সহীহ মুসলিম: ৭৯৭
১২২. গীতি-শতদল, পৃ. ৯৯. ('বাঙালি বাবু')
১২৩. আল্লাহ বলেছেন:
﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾
"সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুত তারা ছিল অপরাধপ্রবণ।" [সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৩৩]
১২৪. আত-তাফসীর আল-মুনীর, খ. ৯ পৃ. ৬২
১২৫. সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৩৪, ১৩৫
১২৬. সাহীহুল বুখারী: ৭১৩৮; সহীহ মুসলিম: ৪৮২৮
১২৭. কারারীত একটি জায়গার নাম; এটি ইবরাহীম হারবী ও ইবনুল জুযী'র মত।
অন্য একটি মতানুসারে, কারারীত কোনো জায়গার নাম নয়, এটি ক্বীরাত্ব (قيراط) এর বহুবচন। ক্বীরাত্ব হলো স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রার অংশবিশেষ। সেক্ষেত্রে হাদীসের অর্থ হবে: আমি ক্বীরাত-এর বিনিময়ে ছাগল চরাতাম।
[দ্রষ্টব্য: ফাতহুল বারী, খ. ১৬ পৃ. ২২৪]
১২৮. সাহীহুল বুখারী: ২২৬২
১২৯. সাহীহুল বুখারী: ৭১৩৮; সহীহ মুসলিম: ৪৮২৮
১৩০. সূরা আত-তাহরীম, ৬৬ : ৬
১৩১. সূরা আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৭৩
১৩২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة "কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বজ্রপাত বেড়ে যাবে।" [মুসনাদ আহমাদ: ১১৬৩৮]
১৩৩. কুরআনের ভাষায়: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ "তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান (কখনো) ভয়ের জন্যে, (কখনো) আশার জন্যে। এবং তিনিই ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।" [সূরা আর-রা'দ, ১৩ : ১২]
১৩৪. শ্রাবণগাথা (রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃ. ৩৯৪
১৩৫. জুমাবার সূরা কাহফ পাঠ করা সুন্নাহ। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين "জুমার দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্যে দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়টিকে আলোকিত করে দেয়া হবে।" [বায়হাক্বী কুবরা: ৫৭৯২; মুস্তাদরাক হাকিম: ৩৩৯২। صححه الحاكم]
এছাড়াও সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করার ব্যাপারেও হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ، عصم من الدجال "যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে।" [সহীহ মুসলিম: ১৯১৯]
অন্য হাদীসে শেষ দশ আয়াতের কথা এসেছে। [সহীহ মুসলিম: ১৯২০]
১৩৬. সূরা আর-রা'দ, ১৩ : ১৭
১৩৭. সাহীহুল বুখারী: ৭৯; সহীহ মুসলিম: ২২৮২ [واللفظ لمسلم]
১৩৮. সূরা আর-রা'দ, ১৩ : ১৩
১৩৯. সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৮০
১৪০. সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৭৪
১৪১. সূরা আল-ফাজর, ৮৯ : ৯
১৪২. সূরা আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৪৬. – ১৪৮
১৪৩. সূরা আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৪২
১৪৪. সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৭৩
১৪৫. সূরা আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৫১
১৪৬. সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৭৪
১৪৭. সূরা আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৫৩
১৪৮. সূরা আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৫৪
১৪৯. ইবন কাসীরের কাসাসুল আম্বিয়া (খ. ১. পৃ. ১৫৩) থেকে সংক্ষেপিত।
১৫০. সূরা আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৫৫-১৫৭
১৫১. কাসাসুল আম্বিয়া, খ. ১ পৃ. ১৫৩
১৫২. সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৭৭
১৫৩. সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৭
১৫৪. সূরা আল-ক্বামার, ৫৪ : ৩১
১৫৫. সূরা আশ-শামস, ৯১ : ১৫
১৫৬. সুনান আত-তিরমিযী: ৩২৯৭
১৫৭. তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৯ পৃ. ১৩১
১৫৮. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ১৯
১৫৯. আত-তাফসীর আল-মুনীর, খ. ১ পৃ. ৯২
১৬০. আইসারুত তাফাসীরের (খ. ১ পৃ. ১৩) ভাষ্য অবলম্বনে
১৬১. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ২০
১৬২. তাফসীর ইবন কাসীরের (খ. ১ পৃ. ১৮৯) ভাষ্য অবলম্বনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১৬৩. তাফসীর আত-তাবারী, খ. ১ পৃ. ১১৯

১৬৪. আল-আদাব আল-মুফরাদঃ ৭২৩

১৬৫. মুস্তাদরাক হাকিমঃ ২৫৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রৌদ্রমুখর

গরমের তীব্রতায় নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে সর্বত্রই এখন গ্রীষ্মের রুদ্ররূপ। মাথার উপর ঘুরতে থাকা তিন পাখার ফ্যানটাকেও অসহ্য লাগছে। মনে হচ্ছে পুরো রুমের মধ্যে গরম জিইয়ে রেখেছে এই হতচ্ছাড়া ফ্যানটাই। ক্যান বাবা, ফ্যান ছাড়লে একটু ঠান্ডা লাগবে দূরের কথা, বাতাস আরও গরম হয়ে যাবে ক্যান? বন্ধ করে দিবো নাকি? বন্ধ করেই-বা লাভ কী? জানালা দিয়ে একছটাক বাতাস তো এদিকে আসতে পারে না। দক্ষিণের বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তরটা এখন গগনচুম্বী অট্টালিকায় ঠাসা। বাতাসের স্রোতে যেন বাঁধ দিয়ে আছে এই ভবনগুলো। অথচ বছর চারেক আগেও এই রুমেই জানালার শিক ধরে দাঁড়াতাম আমি, মাতাল হাওয়ায় আমার এলো চুল কাশবনের মতো দুলতে থাকতো। ভাবতাম, মাথার চুলগুলো যখন একে একে সাদা হয়ে যাবে, তখন সত্যি সত্যি কাশফুলের মতো দেখাবে। যেই-না আমার মাথায় কাশফুলেরা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করলো, অমনি ধীরে ধীরে বাতাসের গতি আটকে দেওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হতে লাগলো। আমি রবি ঠাকুরের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে যতই বলি- 'দাও ফিরে সে অরণ্য / লও এ নগর' [১৬৬]; আমার চিৎকার প্রতিধ্বনি হয়ে আমার কাছেই ফিরে আসে। অগত্যা সান্ত্বনা নিতে কাজী নজরুলের দ্বারস্থ হই, তিনি আমাকে শোনান: '....ভ্রমর কাঁদিয়া ভাঙিতে পারে না কুসুমের নীরবতা....'[১৬৭]। আসলেই তো, এই কুসুমকাননে আমি একটা ক্রন্দনরত ভ্রমরের চেয়ে বেশি কিছু নই।

আম্মা একটা অদ্ভুত কাজ করা শুরু করেছেন। গতকাল আমাকে দিয়ে ছোটো ছোটো দশ-বারোটা বাটি আনিয়েছেন। আজকে দেখলাম, বাটিগুলো পানিতে ভরতি করে কিছু ব্যালকনিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, আর কিছু ছাদের সীমানাপ্রাচীরে তুলে রেখেছেন। কেন এমনটি করলেন? আম্মা জানালেন, গ্রীষ্মের সময় অধিক সূর্যোত্তাপে পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলো কিছুটা দুষ্প্রাপ্য হতে শুরু করে, অনেকসময়ই উড়ন্ত পাখিগুলো তৃষিত হয়ে তৎক্ষণাৎ পানি খুঁজে পেতে বেগ পোহায়। আমাদের বাড়ির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুইদিক মোটামুটি গাছে ছাওয়া, ফলে কিছু পাখির আনাগোনা আছে। তৃষিত কোনো পাখি যদি উড়ে এসে আমাদের ব্যালকনিতে বসে, অথবা ছাদের সীমানাপ্রাচীরে বসে জিরোয়, তাহলে পানিভরতি বাটিগুলো হবে তাদের তৃষ্ণা নিবারণের উৎস। আম্মার এই চমৎকার কাজটির উদ্দীপন ছিলো রাসূলুল্লাহর একটি হাদীস:

من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرّى من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة.

"যে ব্যক্তি একটি পানির কূপ খনন করে, সেখান থেকে পানি পান করে কোনো জ্বীন, মানুষ অথবা কোনো পাখির তৃষ্ণার্ত কলিজা সিক্ত হয়, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে তার প্রতিদান দেবেন।"[১৬৮]

আম্মা আমাকে আরও একটা গল্প বলেছিলেন। সত্যগল্প। আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে বলেছেন সেই গল্প। নানাজানের কাছে আম্মা যখন সাহীহুল বুখারী পড়তেন, তখন এই গল্প জেনেছিলেন। গল্পটা সহীহ মুসলিমেও আছে।

তাহলে শুনে ফেলা যাক। আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন সাহাবিদের গল্প শোনাচ্ছিলেন:

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. [১৬৯]

"একবার এক লোক কোনো এক পথ ধরে হাঁটছিলো। তার খুব পিপাসা পেলো। এরপর একটা কূপ (দেখতে) পেল এবং তাতে নেমে পানি পান করলো। কূপ থেকে যখন বের হলো, তখন দেখতে পেলো, একটি কুকুর তীব্র পিপাসায় জিহ্বা বের করে দিয়ে হাঁপাচ্ছে এবং মাটি লেহন করছে। লোকটি বললো: আমার যেমন সুতীব্র পিপাসা পেয়ে বসেছিলো, কুকুরটিও তেমনই পিপাসায় কাতর হয়েছে। এরপর লোকটি কূপে নামলো, পানি দিয়ে তার মোজা ভরতি করলো এবং মুখে নিয়ে তুলে ধরলো। একপর্যায়ে উপরে উঠে গেলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।"

সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً؟

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! চতুষ্পদ প্রাণীর প্রতি দয়া দেখালেও আমাদের সাওয়াব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হবে?”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: فى كل كبد رطبة أجر

“(হ্যাঁ,) প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে সাওয়াব রয়েছে।”

আম্মার প্রভাবেই বোধ করি আমাদের পরিবারে প্রত্যেক সদস্যই যেকোনো গৃহপালিত প্রাণীর প্রতি দুর্বল ও দয়ার্দ্র। ছোট বোনের খরগোশপালন, ছোট ভাইয়ের বিড়ালপ্রীতিতে আমি জিনগত প্রভাবের কথা বললে আব্বা-আম্মা কেউ আপত্তি করেন না, সম্ভবত এই কারণেই।

কলেজ থেকে ফেরার পর দেখলাম, আমাদের বাসার সামনে একটা পানির ট্যাংক, রশিতে ঝোলানো তিনটা গ্লাস। গেইটের দারোয়ান রফিক আঙ্কেলকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ এই কাণ্ডকারখানার হেতু কী? তিনি জানালেন, এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তৃষ্ণার্ত পথচারীরা যাতে পানি পান করতে পারে, তার জন্যে এই সুপেয় ও বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা। আজকে সকালবেলা আব্বা কি তাহলে ট্যাংক কিনে আনার জন্যে বেরিয়েছিলেন? আম্মার এই একটা গুণ, বেশিরভাগ পুণ্যকাজই তিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে করেন। তবে যে কাজ আমাদেরও করা উচিত, বা যে কাজ থেকে আমরা সন্তানরাও অনুপ্রাণিত হতে পারি, সেটা তিনি আমাদের সাথেও শেয়ার করেন। যা-ই হোক, আমি দৌড়ে বাসায় উঠেই আম্মাকে একটা ধন্যবাদ দিলাম। আম্মা মুচকি হেসে বললেন, ‘দেখলি না! একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েই একজন লোক আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে গেলো! তাহলে একজন তৃষ্ণার্ত মানুষকে পান করানোর সাওয়াব নিশ্চয় আরও বেশি!’

এই ফাঁকে আব্বা এসে আরও একটা ছোট্ট হাদীস শুনিয়ে দিলেন:

ليس صدقة أعظم أجرا من ماء

“পানি পান করানোর চেয়ে বড়ো কোনো পুরস্কারযোগ্য পুণ্যকর্ম নেই।”[১৭০]

আম্মা আমাকে কাছে ডেকে বললেন, ‘শোন বাবা, তুই যে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিস, এটা আমার পছন্দ নয়।’

আমি তো বিস্ময়ে বিমূঢ়।

আমার বিস্ময় আম্মা আঁচ করতে পারলেন।

‘কেন নয়, সেটা যদি বলি, তোর কাছেও ধন্যবাদ নেওয়া অপছন্দনীয় হবে। কুরআনের আয়াতটা দ্যাখ্ তো:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا [১৭১]

"আমরা তো তোমাদের খাবার খাওয়াই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই। আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। চাই না কোনো কৃতজ্ঞতাও।"

কী গভীর চিন্তা! আসলেই তো, আমরা কাউকে সাহায্য করি, খাদ্য দেই কিংবা পানির পাত্র এগিয়ে দেই, এসবকিছুই তো নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। কাজেই নিখাদ ও নিঃস্বার্থ একজন মুমিন তাঁর সামান্য অনুগ্রহের বিপরীতে কোনো প্রশংসাসূচক বাক্য শুনলে অপ্রস্তুত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

শুধু তা-ই নয়, আম্মা জানালেন, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ইবন তাইমিয়া মন্তব্য করেছেন, কাউকে দান করার পর কোনো বিনিময়ের আশা তো দূরের কথা, দানগ্রহীতাকে 'আমার জন্যে দুআ করবেন'—এই কথা বলাটাও অনুচিত।[১৭২] কারণটা খুব স্পষ্ট। আমি যে তার কাছে দু'আ চাচ্ছি, এটা দান করার পরপরই চাওয়া হচ্ছে। তার মানে, দানের বিপরীতেই দু'আটা চাচ্ছি। অন্যসময় এই একই ব্যক্তির কাছে দু'আ চাওয়া হলে সেটা নিছক দু'আ-কামনা-ই হবে, কিন্তু কিছু একটা দান করার পর দু'আ চাইলে বুঝি-বা সেটা 'প্রতিদানমূলক দু'আ' হয়ে যায়। তা-ও না হলে অন্তত 'কৃতজ্ঞতা'র ব্যাপারটা চলে আসে। আর, আয়াতে তো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা উভয়টির প্রতিই দানশীল মুমিনদের বিরাগভাজন হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এই আয়াতটি কোন সূরার, লক্ষ করেছো? সূরার নাম আল-ইনসান। আল-ইনসান অর্থ: 'মানুষ'। মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করার জন্যে, মানুষের মানসিকতায় মানুষিকতার উন্মেষ ঘটানোর জন্যে কুরআন যে বাস্তবধর্মী রূপরেখা পৃথিবীর সামনে পেশ করেছে, এই সূরার সামগ্রিক আহ্বান ও নামকরণ সেই রূপরেখার সার্থকতাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আরেকবার।

আচ্ছা, আম্মা এত্তো গল্প কীভাবে জানেন? একদিন জানতে চেয়েছিলাম। মৃদু অভিমানের সুরে আমাকে বললেন, 'তোদের বলে আর লাভ আছে? আমার তো একদিন তাফসিরের পাতা না উল্টালে ঘুম আসে না, একটা হাদীস না পড়লে ভাত হজম হয় না।'

আম্মাকে মলিন চেহারায় একেবারেই মানায় না। আমি তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলাম, 'লাভ নেই বলছো কেন মা? পড়াশোনার চাপে বা অলসতায় মাঝেমধ্যে ভুলে যাই ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তাগাদা দিলে আমি কিন্তু ঠিকই কুরআন নিয়ে বসে পড়ি। আর এই যে দেখো, 'রিয়াদুস সালিহীন' আমার তো অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আম্মার হাসির রেখা স্পষ্ট হতে শুরু করে। 'কিন্তু বাবা, তুই বড়ো হয়েছিস, এখনো যদি বাবার বকা আর মায়ের তাগাদার জন্যে অপেক্ষা করিস, তোকে মানায়? নিজের সঞ্জীবনী নিজের ভেতর থেকেই সঞ্চয়নের বয়স তোর হয়ে গেছে না?'

আম্মা কথাটা মন্দ বলেননি। পড়ায় বসার জন্যে আমাকে কেউ পীড়াপীড়ি করে না এখন, আমি নিজেই নিজের তাগিদে টেবিলে বসে যাই। ভিডিও গেইমের সাথে আঠা হয়ে লেগে থাকা এই আমাকে ছোটানোর জন্যে বাবাকে একেবারেই দুশ্চিন্তা করতে হয় না এখন, নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভেবে নিজেই সময়সচেতন হয়ে গেছি। তাহলে সালাতের জন্যে কেন বাবার তাগাদা শোনার অপেক্ষায় থাকি? মায়ের বকা না শুনলে কুরআন অধ্যয়নে কেন নিয়মিত হই না? বৈষয়িক জীবনটাকে সাজানোর জন্যে নিজের আত্মোপলব্ধি নিজের জন্যে যথেষ্ট করে নিয়েছি, অনন্ত জীবনের জন্যে কেন আত্মনির্ভরশীল হবো না আমি? সমকালের বর্শায় তো নিত্যকালের আমি বিদ্ধ হতে পারি না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আম্মার এহেন কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাশের বাসার আন্টিও দেখি আরেকটা চমৎকার কাজ করে বসে আছেন। তিনি আঙ্কেলকে বুঝিয়েসুঝিয়ে মাসজিদের মুসল্লিদের জন্যে পুরোদস্তুর একটা ফিল্টারের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। শুধু তা-ই না, ফিল্টারের জন্যে প্রতিদিন ওয়াটারজার আনা হবে, তার খরচও নাকি আঙ্কেলই দেবেন। কী আনন্দ! নবিজি ﷺ বলেছেন: সৎকাজের প্রতি প্রণোদনা দানকারী ব্যক্তিরা সৎকাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির মতোই সাওয়াবের অংশীদার হবে![১৭৩](من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله) ভাবতেই ভালো লাগছে, আঙ্কেল-আন্টির মহৎ উদ্যোগের যে সাওয়াব, তার সমপরিমাণ অংশ আমাদের পরিবারও পেতে যাচ্ছে ইন শা-আল্লাহ!

বিদ্যুৎ আসার কোনো নাম নেই। ঘেমেই যাচ্ছি। ছোট ভাই এরকম তপ্ত দুপুরেও আয়েশি ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে যাচ্ছে সুকুমার রায়ের ছড়া:

'সর্বনেশে
গ্রীষ্ম এসে
বর্ষ শেষে
রুদ্র বেশে
আপন ঝোঁকে
বিষম রোখে
আগুন ফোঁকে
ধরার চোখে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসলেই মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আগুন ফুঁকে দিচ্ছে। সুকুমার রায়ের বাহারি অন্ত্যমিল আর অনুপ্রাসমণ্ডিত ধ্বনিব্যঞ্জনায় একসময় আমিও বুঁদ হয়ে থাকতাম। এখন সেসবে বিস্ময় জাগে না, কিংবা খুব একটা চমৎকৃত করে না, যখন থেকে কুরআনের ভাষাশৈলীর সাথে পরিচয় ঘটেছে। জাহিলি যুগের নামকরা এক কবি ছিলেন লাবীদ ইবন রাবী'আ। শব্দচয়নের চমৎকারিত্বে, অর্থালংকার ও বাজ্ময়তার অপূর্ব সমন্বয়ে তাঁর প্রতিটা পঙ্‌ক্তি ছিলো নান্দনিকতার সাক্ষ্য, শিল্পচেতনার প্রবাদপ্রতিম আলেখ্য। সেই মানুষটা যখন ইসলামের ছায়াতলে এলেন, কুরআনের গভীরে ডুব দিলেন, তখন কবিতার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। এই ইতিহাস যখন আমি পড়েছি, তখন খুব হাসি পেয়েছিলো! মানুষ এমনও বোকা হয় নাকি! কী এমন আছে এই কুরআনে, যেটার প্রভাবে তিনি কাব্যের সম্মোহনকে গা করছেন না? তারপর নিজের ইচ্ছায় আব্বার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম। ছোটোবেলায় শেখা আরবির প্রাথমিক পাঠকে কুরআন বোঝার মতো স্তরে নিয়ে আসার জন্যে লেগে থাকলাম। একসময় 'ইলমুল বালাগাহ'র পাঠ নিলাম। কুরআন পাঠের সময় সেই পাঠগুলো মিলিয়ে নিতে শুরু করলাম। নিখুঁত ও পরিমিত শব্দচয়ন, ভাষালংকারের সৌকর্য আমাকে শুধুই বিমোহিত করেছে। কবি সাহাবি লাবীদ ﵁ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সেটা খুব কাছ থেকেই অনুভব করতে পারলাম।

কাব্যচর্চায় কোনো আনন্দ নেই, তা আমি বলবো না। পৃথিবীতে এ-যাবৎ যত সাহিত্যকর্ম ও চিন্তাবিভূতি বিভিন্ন লেখক রেখে গিয়েছেন, সবকিছুই অর্থহীন নয়। এগুলো মানবমনে প্রভাবসম্পাতী, মানবাত্মায় স্বপ্নসঞ্চারী। কিন্তু মানবজীবনকে শিকড় থেকে শিখর পর্যন্ত পরিশুদ্ধ ও পরিশোধিত করার জন্যে সেসবের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভূমিকা নেই। জীবনের সত্যিকার শিলান্যাস কুরআনীয় দর্পণে যেভাবে বিম্বিত হয়, অন্য কোথাও সেই প্রতিবিম্ব এতটা জীবন্তরূপে মূর্ত হয় না। কুরআন এখানেই অনন্য।

আসলে সূর্যের আলোটাও আলো, মোমের আলোটাও আলো। কিন্তু সূর্যের আলোর সামনে মোমের আলোর কোনো মূল্য নেই। লাবীদ সেই সূর্যকিরণ হাতের মুঠোয় পেয়ে এতকালের সঞ্চিত মোমের আলোকে নস্যি ভেবেছেন, বোধহয় এ কারণেই।

সে যা-ই হোক, এই কবিতায় ব্যবহৃত 'সর্বনেশে' শব্দটার আক্ষরিক আবেদন যেন তার শিশুমনে কোনো নেতিবাচক ছাপ না ফেলে, তজ্জন্যে আমি সতর্ক আছি। কারণ, 'সময়'কে মন্দ বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুসলিম উভয় হাদীসগ্রন্থে 'সময়' বা 'যুগ'কে মন্দ না বলা সংক্রান্ত দুটো স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদই আছে।[১৭৪]

এখানে একটা মজার বিষয়ও আছে।

সময়ের পটপরিবর্তন ও পালাবাদলের ইতিবাচকতা কিংবা নেতিবাচকতা দুটোকেই সামগ্রিকভাবে ইতিবাচকায়নের জন্যে ইসলামের নির্দেশনা কিন্তু খুব সুন্দর। শুধু সময় নয়, যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতেই ভেঙে না পড়ার জন্যে এই নির্দেশনা খুবই কার্যকর। আল্লাহর রাসূলের একটা চমৎকার হাদীস আছে, যেকোনো মুমিনের জীবনেই এটা সর্বক্ষেত্রে অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করতে পারে, যদি হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়! কী সেই হাদীস, পড়ে ফেলি তাহলে:

عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له [৫৭১]

"মুমিনের ব্যাপারটা বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর! এটা কিন্তু মুমিন ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। যদি মুমিনের জীবনে সুখ-প্রাচুর্য আসে, সে শুকরিয়া আদায় করে, ফলে এটা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আবার, যদি তাকে কঠিন সময় পেয়ে বসে, তখন সে সবর করে, ফলে এটাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়।"

কী চমৎকার জীবনদর্শন! এমন প্রশান্তিদায়ক প্রতিপাদক কোথায় পাবে আর, আল্লাহর দীন ছাড়া?

একজন মুমিন কখনোই অস্থির হওয়ার সুযোগ পায় না। সুখের অতি মিষ্টতা কিংবা দুঃখের অতি তিক্ততা—কোনোটাই তার জীবনকে পানসে করে তুলতে পারে না। স্বাদ আর বিস্বাদের মাঝখানে যে বিন্দুটি স্থির হয়ে আছে, তাকে খুঁজে পায় শুধু মুমিনরাই। এই স্থির বিন্দু মুমিনকে অস্থির হতে দেয় না। সেটা কীভাবে? এই হাদীসটাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ!

জীবনের ইতিবাচক মুহূর্তগুলো রব্ব-এর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে তোলে সে। প্রিয়তম রব্ব-এর প্রতিশ্রুতি তার জীবনকে স্বস্তিতে টইটম্বুর করে দেয়: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (যদি আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদেরক বাড়িয়েই দেবো।)[১৭৬] তারপর তার জীবনের খেরো খাতায় প্রাপ্তির অঙ্কটা যেমন পৌনঃপুনিক হতে থাকে, হৃদয়ে প্রশান্তির পারদও কেবল ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে।

যখন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি চলে আসে, তখন সে ধৈর্যধারণ করে। হতাশা ও অস্থিরতার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পরিবর্তে মস্তকাবনত হয় উত্তম ফায়সালার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মালিকের কাছে। আল্লাহর নবি ইয়াকুব ﷺ-এর মতো তাঁর কণ্ঠেও অনুরণিত হয় বিশ্বাসী সুর: إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ (আমি আমার অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তাকে শুধু আল্লাহর কাছেই পেশ করছি।)[১৭৭] সাবরের দুর্গম উপত্যকা পাড়ি দিয়ে, ধৈর্যের দুর্লঙ্ঘ্য সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে একসময় আল্লাহর ইচ্ছায় দুঃসময়ের পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করে ফেলে সে, আর বিজয়ীর হাসিতে যেন ঠিকরে পড়ে আরেক নবি যাকারিয়া ﷺ-এর কণ্ঠনিঃসৃত আস্থা ও নির্ভরতার সরল সাক্ষ্য: وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (আমার রব্ব! আমি তো তোমাকে ডেকে কখনো হতাশ হইনি!)[১৭৮]

কী দেখলাম আমরা?

আকাঙ্ক্ষিত ও আরাধ্য জীবনপালায় মুমিনের হৃদয় ভরে যায় শোকরের ফলবান ডালপালায়।

অনাকাঙ্ক্ষিত ও আরব্ধ জীবনপালায় মুমিন নিজের হৃদয় তুলে রাখে আসমানী ফায়সালার ডালায়।

অস্থির হওয়ার সুযোগ কোথায় তার? হতাশ হওয়ার ফুরসত কোথায় পাবে সে, বলো?

সুসময়ে সে কৃতজ্ঞতায় তৃপ্ত, দুঃসময়ে নির্ভরতায় সিক্ত।

জীবনকে জীবনের মতো করে উপভোগ করার এমন উৎকৃষ্ট জীবনদর্শন শুধু তিনিই দিতে পারেন, যিনি জীবনের স্রষ্টা।

এ তো গেলো জীবনের বৃহৎ আঙিনায় মুখোমুখি হওয়া সঙিন মুহূর্তগুলোর কথা। সেই তুলনায় সামান্য রৌদ্রতাপ তো কিছুই নয়। এখানেও একই দর্শন প্রয়োগ করে আমি প্রশান্ত থাকতে পারছি। গ্রীষ্মের দাবদাহ আমার মুখ থেকে বিরক্তি-উদ্রেককারী কোনো শব্দ বের করতে পারে না, গ্রীষ্মের মালিকের অবাধ্যতা-প্রকাশকারী কোনো উক্তিও আমি করতে পারি না। এই সাধারণ উপলব্ধিটা ছোট ভাইয়ের মধ্যেও জাগ্রত করে দেওয়ার জন্যে আমি সুযোগ খুঁজছি। সঙ্গে রাখছি এই কটা পঙ্‌ক্তিও:

"বিশ্বাসী মন কত প্রশান্ত
ওরা তা কীভাবে করবে আঁচ?
অবিশ্বাসের ছানিপড়া চোখ
হীরে তো দেখেনি, দেখেছে কাচ!" [১৭৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জ্যৈষ্ঠ আসার সাথে সাথে হরেক রকম পাকা ফল খাওয়ার ধুম পড়েছে। কিছু নিজেদের বাগানের, কিছু আত্মীয়দের পাঠানো। গতকাল গ্রাম থেকে বড় চাচা দুইঝুড়ি আম পাঠিয়েছেন। অথচ আমাদের বাগানে আমের অভাব নেই। আব্বার এক ছাত্র ঝাঁকিভরতি লিচু নিয়ে এসেছে কয়েকদিন আগে।

এই গ্রীষ্মে এখনো কাঁঠাল খেতে পারিনি। আমরা যখন গ্রামে ছিলাম, গ্রীষ্মকালে কয়েকদিন পরপরই কাঁঠাল খাওয়া হতো। কাঁঠাল খেয়ে আঠালো-হয়ে-যাওয়া হাতে সরিষার তেল মাখামাখি, কাঁঠালের বিচি দিয়ে ভাত খাওয়ার পর তৃপ্তির ঢেকুর তোলা কতদিন হয় না! লবণ-মরিচ দিয়ে কাঁঠালের মুচি খেতে গিয়ে গলায় আটকে যেতো সবার। গলায়-আটকে-যাওয়া ব্যক্তির কাশাকাশি আর বাকিদের হাসাহাসি মিলে অম্লমধুর পরিস্থিতি।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে: 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া'। এই প্রবাদের অর্থ সবারই জানা আছে। এরপরেও অভ্যাস মতো এই প্রবাদ নিয়ে দুয়েক লাইন সরস লেখা চাগানোর ইচ্ছে হয়েছিলো। কিন্তু নজরুলের কয়েকটা পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে গেছে। আপাতত সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েই দায় সারছি:

ওরে তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু-ডাকাত লুটছে ধান।
তাই গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ানা॥
ছিলি সিংহ ব্যাঘ্র, হিংসা-যুদ্ধে আজকে এমনি ক্ষিণ্নপ্রাণ।
তোদের মুখের গ্রাস ঐ গিলছে শিয়াল তোমরা শুয়ে নিচ্ছ ঘ্রাণ॥[১৮০]

শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লেখা হলেও এই পঙ্‌ক্তি দুটো চিন্তার জগতে তোলপাড় করে দেয়ার মতো। আমাদের হয়তো তোলপাড় করে না। কারণ এই পঙ্‌ক্তিগুলোর অর্থ আমরা জানি না, জানে শুধু কুদসের জমিন।

কাঁঠাল নিয়ে বাংলায় আরও প্রবাদ-প্রবচন আছে!

'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো' লোকমুখে বহুল শ্রুত বাগধারা। গায়ের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করা বোঝাতে এটা বলা হয়। অসম্ভব কোনো কিছুকে বোঝাতে অনেকসময় বলা হয় 'কাঁঠালের আমসত্ব'। আরেকটা বিখ্যাত প্রবাদ হলো 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'। শোনা যায়, যাদের গোঁফ অনেক বড়ো, তারা কাঁঠাল খাওয়ার আগে গোঁফে তেল দিয়ে নিতো, যাতে খাওয়ার সময় কাঁঠালের আঠা গোঁফে লেগে জট পাকিয়ে না যায়। কিন্তু গাছে কাঁঠাল থাকা অবস্থায়ই যদি কেউ গোঁফে তেল দিয়ে রাখে, তাহলে তো মুশকিল! কোনো কিছু পাওয়ার আগেই উল্লসিত হয়ে যাওয়া, কিংবা অর্জনের আগেই আয়োজন করে ফেলা বোঝানোর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জন্যে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। আরও একটা প্রবচন আছে: 'আনারস বলে, কাঁঠাল ভাই তুমি বড় খসখসে'। আনারস নিজেই কিন্তু খসখসে। কাঁঠালের দেহটাও মসৃণ নয়। অমসৃণ হওয়ার দিক থেকে দুজনেই একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও একজন আরেকজনকে হেয় করছে। যে দোষ নিজের মধ্যেও আছে, সেই দোষের কথা বলে অন্যকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে এই প্রবচনটা সামনে আনা হয়।

এক কাঁঠাল দিয়েই কতগুলো প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত! কাঁঠাল যেহেতু আমাদের দেশে সবখানেই সহজলভ্য, সবার কাছেই প্রিয়, সেজন্যে একে অবলম্বন করে বাগধারা ও প্রবাদের সংখ্যা বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। একইভাবে ইংরেজি ভাষার প্রবাদ-প্রবচনে আপেলের জয়জয়কার। কারণ পশ্চিমে এই ফলটা সহজলভ্য ও সমাদৃত। এবার তাহলে আপেল নিয়ে কয়েকটা মজার প্রবাদের সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

'কাঁঠালের আমসত্ত্ব'র কাছাকাছি একটা প্রবাদ ইংরেজিতে আছে: A pear tree cannot bear an apple. (নাশপাতি গাছে আপেল ধরে না।) ইংরেজি সাহিত্যে নাশপাতির সাথে আপেলের ঝগড়া লেগেই থাকে। এই প্রবাদটা তার একটা উদাহরণ। একই রকম আরও একটা প্রবাদ: You can't compare apples with pears.

আপেল যেহেতু সবার কাছেই প্রিয় ফল, দেখতেও চোখজুড়ানো, স্বাদে-গন্ধেও অতুলনীয়, সেহেতু প্রিয় বস্তু বা প্রিয় ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্যেও আপেলকেই বেছে নেয়া হয়েছে। যেমন: You are the apple of my eye. যাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, যার দর্শন অনেক বেশি প্রতীক্ষিত, তার ক্ষেত্রেই এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুশীতলকারী উপাদান ছিলো সালাত। তিনি বলেছেন: جعلت قرة عيني في الصلاة "আমার চক্ষুর শীতলতা সালাতেই নিহিত।"[১৮১] সালাতেই তাঁর হৃদয় জুড়িয়ে যেতো, চোখ শীতল হতো, দেহ-মন পরিতৃপ্ত হতো। আমাদের মন কীসে পরিতৃপ্ত হয়? আমাদের চোখ কীসে জুড়ায়? সালাতের সাথে আমাদের হৃদয়ের বন্ধন ও ভালোবাসা কি অতটুকু হতে পেরেছে, যতটুকু হলে তাকে 'চক্ষুশীতলকারী' ভাবা যায়? আমরা সালাতকে নিজেদের apple of eye করে নিতে পেরেছি তো? চলো, নিজেকে প্রশ্ন করি।

আপেল নিয়ে আরেকটা সুন্দর প্রবাদ আছে।

"Anyone can count the seeds in an apple, but only God can count the apples in a seed." (একটা আপেলে কতটা বীজ আছে, যেকেউ গুণতে পারে। কিন্তু একটা বীজে কতটা আপেল আছে, তা শুধু আল্লাহই গুণতে পারেন।)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শুধু আপেল কেন, বীজযুক্ত যেকোনো ফলের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। মাত্র একটা বীজ, সেটা থেকে একটা বৃক্ষ হবে, সেই বৃক্ষে অসংখ্য ফল ধরবে। সেই ফলগুলো থেকে আরও কত শত বৃক্ষ জন্ম নেবে! একটা বীজ থেকেই কতটা ফল হতে পারে, আমরা কেউ-ই তা গুণতে পারি না। এরকম একটা ফল আমরা বানাতে পারবো? ছোট একটা বীজ থেকেই অতিকায় একটা বৃক্ষে রূপান্তরিত করা আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব? না! আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আল্লাহর নেয়ামতরাজিও আমাদের গণনার ঊর্ধ্বে। কুরআন বলছে: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا "আর যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না।"[১৮২]

আরেকটা প্রবাদের কথা বলেই শেষ করি। আপেল নিয়ে বিখ্যাত আরেকটি ইংরেজি প্রবাদ হলো: Your neighbor's apples are the sweetest. (প্রতিবেশীর গাছের আপেলটাকে বেশি মিষ্টি মনে হয়।)

মানবীয় মনস্তত্ত্বে এটা অনেকাংশেই সত্য, তবে এই মনোভাব খুবই নিন্দনীয়। অনুমতি ব্যতীত অন্যের ফল ছোঁয়ার তো সুযোগই নেই। শুধু ফল কেন, প্রতিবেশীর সবকিছুই আরেক প্রতিবেশীর জন্যে আমানতের মতো। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده [১৮৩]

"মুসলিম তো সে-ই, যার রসনা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।"

প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম অনেক বেশি কঠোর। আল্লাহ এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন[১৮৪], রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও প্রতিবেশীর সাথে মুয়ামালাতের নির্দেশনা দিয়েছেন অনুপুঙ্খভাবে। ইসলাম এ ব্যাপারে কতটা সতর্ক, সেটা রাসূলুল্লাহর অনুভূতি থেকেই বোঝা যায়: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه "প্রতিবেশীর ব্যাপারে জিবরীল আমাকে উপদেশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। এত বেশি উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, আমি তো ভেবে বসেছিলাম, প্রতিবেশীকে আমার সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিচ্ছেন কিনা আবার!" [১৮৫]

প্রতিবেশীর সাথে সুসসম্পর্ক স্থাপনের পথও রাসূলুল্লাহ ﷺ বাতলে দিয়েছেন। তাদেরকে খাবারদাবারে শামিল করাতে বলেছেন, তাদের সাথে উপহার বিনিময় করতে বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة [১৮৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"হে মুসলিম রমণীগণ! এক প্রতিবেশিনী অন্য প্রতিবেশিনীকে অল্প পরিমাণ উপঢৌকন দেয়াকেও যেন তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা বকরীর পায়ের হাড়ের সামান্য গোশতও হয়।"

বকরীর হাড়ের সামান্য গোশতের মাধ্যমে হলেও যেন উপঢৌকন প্রদানের চর্চা অব্যাহত রাখেন তাঁরা, এজন্যে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাধ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী এই উপঢৌকন অন্য কিছু বা আরও মূল্যবান কিছুও হতে পারে। পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টির জন্যে উপহার আদান-প্রদানের জুড়ি নেই। এই বাস্তব সত্যটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নজর এড়ায়নি। এক হাদীসে আরও সুন্দরভাবে বলা হয়েছে: تهادوا تحابوا "উপহার দাও, উপহার নাও, পরস্পরের ভালোবাসা বাড়াও।"[১৮৭]

প্রতিবেশীর সাথে হার্দিক সম্পর্কের পরিচর্যার জন্যে শুধু কি নারীদেরই বলা হয়েছে? পুরুষদেরও বলা হয়েছে। আবূ যার গিফারী ﷺ-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك

"আবূ যার! যখন তুমি চামড়া-ছিলানো গোশত রান্না করবে, তখন ঝোলটা একটু বাড়িয়ে দেবে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করবে।"[১৮৮]

সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ'র প্রতি পরতেই কী সুন্দর একটা জীবনদর্শন লুকিয়ে আছে, টের পাও? বোঝার চেষ্টা করো তো? বোঝার পরে প্রয়োগ করার জন্যে এগিয়ে আসো তো?

টক-মিষ্টির সমন্বিত স্বাদ আনারসের মতো অন্য কোনো ফলেই বোধহয় এত অনন্য হয় না। দাদাজানের কাছে জেনেছিলাম, যে আনারসের চোখ যত সুঁচালো, সেটা তত মিষ্টি। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান কোনো মন্তব্য করেছে কি না, কী জানি!

তালশাঁস খাই না কত দিন! ফলের স্বাদ তো পাওয়াই যেত, তৃষ্ণাটাও মিটে যেত। বলতে পারো, এই গুণ তো নারকেলেরও আছে; নারকেল খেয়ে তৃষ্ণা পেলো, তারপর নারকেলের পানি পান করে সেই তৃষ্ণা নিবারণ করা গেলো। উঁহু, বুঝলে না! তালশাঁসে আলাদা কোনো পানি নেই। ওটা নিজেই ফল আর পানি দুই গুণ একসাথে নিয়ে বসে আছে।

জামও খাওয়া হচ্ছে না অনেক বছর ধরে। ভাগ্নে যখন পাঠ্যবইয়ে জসীম উদ্দীনের ছড়া পড়ে, 'পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ', তখন স্বভাবসুলভ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্মৃতিকাতরতায় আমার দুঃখ পাওয়ার কথা, কিন্তু মোটেও পায় না। কারণ, জাম নিয়ে আমার সুখস্মৃতি খুব একটা নেই। কতবার এই জাম খেতে গিয়ে স্কুলের সাদা ইউনিফর্ম নষ্ট করে ফেলেছি আর পিটি প্যারেডে কানমলা খেয়েছি, হিসেব নেই। আম্মুর বকুনি হজম করতে করতে জাম হজম করাটাই ভুলে যেতাম। তাই জাম খাওয়ার জন্যে বিশেষ কোনো আগ্রহ জন্ম নিচ্ছে না এখন। তবে কেউ নিয়ে এলে খেতে আপত্তি নেই। হাজার হোক, শৈশবের স্মৃতি তো!

শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভ্যানগাড়িতে করে কতবেল বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাচারি ঘরের দক্ষিণে কয়েকটা বেলের গাছ ছিলো। পাকা হতে শুরু করা বেল কিন্তু বেশ শক্ত। হঠাৎ কারও মাথায় পড়লে দফারফা। এজন্যে বলা হয় 'ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়'। কথা সত্য। বেল এমনিতেই শক্তপোক্ত, তার উপর আবার মাথায় যদি চুল না থাকে, সেই মাথায় যদি বেল পড়ে, তাহলে একবারেই শিক্ষা হয়ে যাওয়ার কথা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين "মুমিন একই গর্তে দুইবার আহত হয় না।"[১৮৯] তাহলে আমি যে শাইত্বানের পাতানো ফাঁদে বারবার পা দিয়ে যাচ্ছি? একই ভুল যে আমি বারবার করে যাচ্ছি! সম্ভবত আমার মুমিন হয়ে ওঠা এখনো পূর্ণতা পায়নি! সত্যিকার মুমিন হবার শর্তে উত্তীর্ণ হবার জন্যে, ভুলের ওপর জীবন পার করা থেকে বাঁচার জন্যে আমাকে একটু সতর্ক থাকলেই হবে। যে গর্তে কাল পড়েছিলাম, অনুশোচনায় পুড়েছিলাম, সে গর্তে আজকে যেন না পড়ি। যে ভুল আজ করলাম, প্রায়শ্চিত্তানলে দগ্ধ হলাম, সে ভুল যেন কালকে না হয়। নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছো না? ব্যস, এই নাও, এক গ্লাস বেলের শরবত খেয়ে ফেলো! বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যেয়ো না আবার। তিন ঢোকে খাওয়ার কথা তো মনে করিয়ে দিতে হবে না। তুমি তো এই সুন্নাহ সম্পর্কে জানোই। কিন্তু এই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিবে মনে হচ্ছে! বসেই খাও, হ্যাঁ? দাঁড়িয়ে খাওয়া বা পান করা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। তবে হ্যাঁ, একটা জায়গায় ব্যতিক্রম আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জমজমের পানি পান করেছিলেন দাঁড়ানো অবস্থায়।[১৯০]

আরেকটা ফলের কথা খুব মনে পড়ছে। ছোট অথচ কী দারুণ স্বাদ! আমরা এটাকে বলি বরই। অনেকে আবার কুল বলে। বরই খাওয়ার পর বিচিগুলো জমা করে শুকাতাম। তারপর একদিন মহাসমারোহে বিচি ভাঙা হতো। কখনো দুই ইটের মাঝখানে দিয়ে, কখনো আবার পাটাপুতার সাহায্য নিয়ে। বিচি ভাঙার পর বেরিয়ে আসতো পাতলা আবরণের এবং লাল বরনের শাঁসজাতীয় বস্তু। চট্টগ্রামে এটাকে 'পাক্কন' বলা হয়। প্রমিত বাংলায় কী বলা হয়, এখনো জানতে পারিনি। এই পাক্কন কেউ কাঁচা খেতো, আবার কেউ কেউ অনেকগুলো পাক্কন একসাথে বড় কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চামচে নিয়ে সরিষার তেল মেখে নাড়ার আগুনে গরম করে খেতো। সে এক দারুণ স্বাদ!

পেঁপের কথা আলাদা করে আর কী বলবো? পুকুরের পূর্বপাড়ের পেয়ারাগুলো ছিলো ভীষণ মিষ্টি। কাঁচা পেঁপে তরকারি হিসেবে খেয়েছি, পাকা পেঁপে খেয়েছি ফল হিসেবে। ছোটবেলায় একজন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জ করার একটা হাতিয়ার ছিলো পেঁপে নিয়ে একটা বাক্য: 'পাখি পাকা পেঁপে খায়'। কে কতক্ষণ পর্যন্ত একনাগাড়ে বাক্যটা সঠিক উচ্চারণে বলে যেতে পারে, এটার জন্যে প্রতিযোগিতা হতো। স্বাভাবিক গতিতে কিছুটা দ্রুত উচ্চারণে যদি এটা পরপর কয়েকবার বলা হয়, তাহলে কথা জড়িয়ে যায়, একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দ গুলিয়ে যায়। বিশ্বাস না হলে তুমি নিজেই বাক্যটা কয়েকবার অনর্গল বলতে থাকো, তারপর দেখো কী অবস্থা! ইংরেজি ভাষার শিশুসাহিত্যগুলোতেও এ ধরনের বাক্যের দেখা পেয়েছি। এগুলোকে 'tongue twister' বলা হয়। এরকম একটি বাক্য হলো: Crisp crusts crackle and crunch.

আরবিতেও এর অস্তিত্ব আছে। তবে শিশুসাহিত্যের অংশ হিসেবে নয়, উচ্চতর ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হিসেবে। আরবি অলংকার শাস্ত্রে 'ফাসাহাত' একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে 'তানাফুর' (تنافر) বলে একটি পরিভাষা আছে, যেটার অধীনে এ ধরনের উক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। কাছাকাছি সিলেবলের একাধিক বর্ণ শব্দ পাশাপাশি বসে যখন জট ও জড়তা তৈরি করে, 'ফাসাহাত'-এর মানদণ্ডে সেটা অনুত্তীর্ণ বলেই গণ্য হয়। বর্ণ বা শব্দ যেখানেই এটা ঘটুক না কেন, অলংকারশাস্ত্র একে দূষণীয় মনে করে। বালাগাতের গ্রন্থগুলোতে অনেক বেশি আলোচিত হয়, এরকম একটি 'tongue twister' পঙ্‌ক্তি হলো:

وقرب حرب بمكان قفرٍ * وليس قرب قبر حرب قبرٌ

আগে তো ছিলই, এখনো অনেক বেশি প্রিয় একটা ফল, নাম তার আতা। চট্টগ্রামে এটাকে 'শরিফা' ফল বলা হয়। কী দারুণ স্বাদ! তবে ঢাকায় ঝাঁকিভরে বিক্রি হওয়া আতা ফল খাওয়ার জন্যে ভরসা পাই না। কে জানে কী বিষ মিশিয়ে রেখেছে তাতে! কাওরান বাজারে একবার এক বিক্রেতাকে বলতে শুনলাম, এটা বেহেশতি ফল। অনেকে এ কথা শুনে খুব উৎসাহী হয়ে ফল কিনছিলো। জান্নাতে সব ধরনের ফলই থাকবে। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে আতা ফলের নাম কুরআন বা হাদীসে এসেছে বলে আমাদের জানা নেই। বাণিজ্যিক স্বার্থে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। হাদীসের নাম দিয়ে অসংখ্য বানোয়াট কাহিনি এভাবে তৈরি হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বসরার এক বেগুনবিক্রেতা দেখলো, তার ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে। ব্যস, সে বানিয়ে ফেললো একটা জাল হাদীস: "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেগুন সর্বরোগের মহৌষধ।" এটি হাদীস নাম দিয়ে প্রচার করতে লাগলো। তার পর লোকেরা বেগুন কিনতে শুরু করলো। রাসূলুল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে এরকম মিথ্যা ও জাল হাদীস তৈরি করা ভয়াবহ অপরাধ ও পাপের কাজ। তিনি ﷺ বলেছেন: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলবে, সে জাহান্নামেই তার জায়গা করে নেবে।"[১৯১]

গ্রামে থাকা অবস্থায় করমচা ফলটাকে খুব বেশি ভালো লাগেনি কখনো। অদ্ভুতরকম টক। ফলটার আসল নাম যখন জানতাম না, তখন এটাকে 'লাল আমলকি' বলতাম। খাওয়ার রুচি কমে গেলে দাদা এই ফল খেতে বলতেন। কাজে দিতো। তবে স্বাদটা খুব বেশি টানতো না। তখন খুব একটা খাতির না করলেও এই ফলের দৃশ্য কল্পনা করলে এখনও আমার জিভে পানি চলে আসে। মানুষের এই এক মনোবৃত্তি, কাছে থাকা অবস্থায় কাছের ভাবতে পারে না, দূরে চলে যাবার পর দূরত্ব মানতে পারে না। দূরে গেলে বোঝা যায়, হৃদয়ের টান কতটা শক্তিশালী বা দুর্বল। বোধ করি এজন্যেই একজন কবি বলেছিলেন: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا "তোমাদের আরও কাছাকাছি হবার জন্যেই আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই।"[১৯২]

খুব বেশি মন টানতো না, এরকম আরেকটা ফল ছিলো জামরুল। অনেকের কাছে অবশ্য ফলটা খুব উপাদেয়। দেখতে খুব সুন্দর বটে, কিন্তু স্বাদটা কেন জানি আমার ভালো লাগেনি। জামরুলের কাছাকাছি আকৃতির একটা ফল কিন্তু ভীষণ মজাদার, নাম তার নাশপাতি। মনে হচ্ছে, এখনো জিহ্বায় তার স্বাদ লেগে আছে।

আচ্ছা, তরমুজের কথা কি বলতেই ভুলে গেলাম? গ্রীষ্মের ফলফলাদির কথা বলার সময় তরমুজের প্রসঙ্গ এত পরে আসবে, এ নেহাত অন্যায়। থাকগে, এসেছে যখন, বরণ করেই নিই। নির্দিষ্ট সময়ে মেজবান প্রস্তুত না থাকাটা দোষের, মেহমান না আসা দোষের নয়।

তরমুজকে আর কী বরণ করবো, তরমুজ দিয়েই তো আমরা মেহমান বরণ করি! তবে খুব আয়েশ করে তরমুজ খাওয়ার সময় বেরসিক বিচি যখন কামড় লেগে মুখের ভেতর ভেঙে যায়, তখন কেমন যে লাগে! ভুনা গোশত খাওয়ার সময় মাঝখানে এলাচি বা দারুচিনি পড়ে গেলে যেমন লাগে আর কি! বিড়ালছানার দাঁতের মতো একেকটা বিচি। আম্মা আমাদেরকে তরমুজের জুস বানিয়েও খাওয়াতেন। আমার অবশ্য জুসের চেয়ে বেশি পছন্দ ফল হিসেবেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শুনেছি ঢাকা শহরে এখন তরমুজ খাওয়াও নিরাপদ নয়। এই তিলোত্তমা শহরে একেকজন ফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন নীরব ঘাতক। দৈনিক পত্রিকার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে আসছে ভয়ানক সব তথ্য। আম থেকে শুরু করে গ্রীষ্মের যে ফলের কথাই বলি না কেন, নানা রকম বিষাক্ত কেমিক্যাল, কার্বাইড ইত্যাদি ব্যবহার করে ফলগুলোকে মৃত্যুবড়ি বানিয়ে রেখেছে। একেকটা ফল এখন মৃত্যুবড়ি, একেকটা ফলের আড়ত যেন মৃত্যুবাড়ি।

আল্লাহর ভয় অন্তরে না থাকলে মানুষ এমনই হয়। মিথ্যা কথা বলে এবং কদাচিৎ শপথ করে বেশি মূল্য নেয়া, প্রতারণা করে ভেজাল বা মানহীন পণ্য বিক্রয় করা, ক্রেতাকে ঠকানো—এসবকিছুই খুব স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আমাদের চারপাশে।

প্রসঙ্গ যেহেতু এসেছেই, এখানে একটা গল্প বলি। সাহাবি রিফা'আহ ইবন রাফি' ﵁ বলছেন:

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদের উদ্দেশে বেরোলেন। পথিমধ্যে মানুষজনকে বেচাকেনা করতে দেখলেন। তাদেরকে লক্ষ করে বললেন: يا معشر التجار "এই যে ব্যবসায়ীরা!"

তারা সবাই রাসূলুল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন। ঘাড় উঁচু করে এবং তাঁর ﷺ দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁরা কথা শুনছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে বললেন:

إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق

"সকল ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন পাপাচারী হয়েই পুনরুত্থিত হবে। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে, দান করে এবং সত্য কথা বলে।"[১৯৩]

এবার একজন সত্যবাদী ব্যবসায়ীর গল্প শোনাই। আমাদের সালাফ (পূর্বসূরি) গণ আল্লাহর ভয় অন্তরে কতটা লালন করতেন, উপার্জনকে শতভাগ হালাল রাখার জন্যে কত বেশি সচেতন ও সতর্ক ছিলেন, এই সত্যগল্প শোনার আগে সেটা তোমার কাছেও হয়তো কল্পনাতীত মনে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ﵀ কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর একজন ব্যবসায়িক পার্টনার ছিলেন হাফস ইবন 'আবদুর রহমান। একদিন তিনি হাফসকে কিছু কাপড় বিক্রি করতে পাঠালেন এবং বললেন, এখানে একটা কাপড়ে খুঁত আছে। তিনি জোর দিয়ে বললেন, কাপড়টা বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে যেন সেই খুঁত সম্পর্কে বলে দেয়া হয়। তাঁর অংশীদার কাপড়টি বিক্রয় করার সময় ত্রুটির কথা বলে দিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভুলে গেলেন। যখন কথাটা মনে পড়লো, তখন কাকে বিক্রয় করেছেন, সেটাও আর মনে করতে পারছিলেন না। ইমাম আবূ হানীফা ﵀ এ ব্যাপারটি জানার পর ঐ কাপড়ের বান্ডিলের মূল্য পুরোটাই নিজের কাছে আর রাখলেন না, সাথে সাথে সাদাকাহ করে দিলেন।[১৯৪]

ব্যবসায়িক সততায় শতভাগ উত্তীর্ণ তো বটেই, ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা অকাতরে ব্যয় করার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য। প্রতি বছর তিনি মুনাফা জমা করতেন, আর সেগুলো বয়োবৃদ্ধ মুহাদ্দিস ও দরিদ্র ছাত্রদের খোরাকি, বসন-পরিচ্ছদ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য খরচ নির্বাহের জন্যে দান করে দিতেন।[১৯৫]

আমাদের ব্যবসায়ীগণ যদি এখান থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারতেন!

আল্লাহকে ভয় করার শিক্ষাটা যদি গ্রহণ করতে পারতেন!

ব্যবসা-বাণিজ্যে সৎ, আল্লাহর হুকুম পালনেও তৎপর ব্যক্তিদের সম্পর্কে কুরআন কী বলেছে, সেটা যদি তাঁরা দেখতেন!

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ . لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم
مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"এরা এমন লোক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা যাদের ভুলিয়ে রাখতে পারে না আল্লাহর স্মরণ, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে। তারা এমন দিনকে ভয় করে, যেদিন মানুষের অন্তর ও দৃষ্টি সব উলটপালট হয়ে যাবে। যাতে আল্লাহ তাদের কাজের সেরা প্রতিদান দেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে আরও বেশি দান করেন। আল্লাহ যাকে চান, তাকে কোনো হিসেব ছাড়াই রুজি-জীবিকা দান করেন।" [সূরা নূর, ২৪:৩৭]

আমরা যাঁরা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে হালাল ব্যবসায় জড়িত, কিংবা আল্লাহর ইচ্ছায় কখনো জড়িত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, তাঁরা যেন এ কথাগুলো মনে রাখি।

একইসাথে রাসূলুল্লাহর এই হাদীসটাও যেন আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

["সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী থাকবে নাবি, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথেই"[১৯৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তরমুজের ভাই খরমুজের কথাও বলতে হবে। তরমুজের ভাই বলেছি এ জন্যে যে, গ্রামে যখন কোনো আত্মীয় অপর আত্মীয়ের বাড়িতে গ্রীষ্মকালীন ফল নিয়ে বেড়াতে যান, তখন তরমুজের সাথে খরমুজ অবশ্যই সাথে থাকে। তো, এই ফলটাও আমার ভীষণ প্রিয়। শুধু আমার কেন, যে-ই এটা খেয়েছে, সে-ই ফলটাকে প্রিয়'র তালিকায় রাখতে বাধ্য। আমাদের এলাকায় এটাকে 'বাঙ্গি' বলে।

তরমুজ থেকে খরমুজ পর্যন্ত আসার পর আমার ইচ্ছা হচ্ছে হরমুজ প্রণালীতে যেতে। কেন যেতে ইচ্ছে হচ্ছে একটু পরে বলছি। তার আগে হরমুজ নিয়ে কথা বলি। পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে মোটামুটি ধারণা আছে, এমন যে-কেউ প্রণালীটাকে চেনার কথা। জাযিরাতুল আরব ও ইরানকে পৃথক করেছে এই প্রণালীটি। আবার পারস্য উপসাগরকে আরব সাগরের সাথে যুক্তও করে দিয়েছে এই প্রণালী। ফার্সিতে 'হরমুগ' মানে খেজুর। সম্ভবত উভয় ভূখণ্ডেই ব্যাপকভাবে খেজুর সুলভ থাকার দরুন এই নামটি দেয়া হয়েছে। এটি অনুমাননির্ভর একটি ধারণা মাত্র। ইতিহাস বা ভূগোলের কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য এই ধারণাকে ভুলও প্রমাণ করতে পারে।

এবার বলি কেন আমার ইচ্ছে হয়েছিল হরমুজ প্রণালীতে যেতে। আসলে খরমুজ থেকে কীভাবে আরেকটা ফলের গল্পে চলে যাবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই তরমুজ ও খরমুজের অনুপ্রাসে আরেকটা শব্দ 'হরমুজ' যখন মাথায় এলো, তখন ভাবলাম একে অবলম্বন করে আরেকটা ফলের কাছে আসা যায়। এসেও তো গেলাম! এবার তাহলে খেজুর নিয়েই গল্প হোক।

'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ﵄ সেসময় কিশোর সাহাবিদের একজন। ছিলেন লাজুক প্রকৃতির। তবে ভীষণ বুদ্ধিমান! একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে এক মজলিসে বসা ছিলেন। আরও অনেক সাহাবিও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তারপর কী হলো? 'আব্দুল্লাহ বলছেন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة [৭৯১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "গাছের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একটা গাছ আছে, যেটার পাতা ঝরে পড়ে না। এই গাছটাই মুসলমানদের উপমা। তোমরা বলো তো, কোন সে গাছ।" লোকজন বিভিন্ন মরুবৃক্ষ নিয়ে ভাবতে লাগলো। আমার মনে হলো, এটা খেজুর গাছই হবে। কিন্তু আমার বলতে লজ্জা করছিলো। সাহাবিগণ বললেন: "ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন গাছ বলে দিন না!" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "এটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"ঋজু হয়ে তুমি দাঁড়িয়েই থাকো খেজুর গাছের মতো অবিকল
কুচুটে লোকেরা ঢিল ছুড়ে যাক, তুমি ছুড়ে দাও সুমিষ্ট ফল।"

হাদীসের শব্দচয়ন থেকে আমরা আরেকটা সূক্ষ্ম জিনিস লক্ষ করতে পারি। খেজুর গাছে যখন কোনো পাতা শুকিয়ে যায়, তখন কিন্তু সাথে সাথে ঝরে পড়ে না। একটা দুইটা করে একসময় সব পাতাই শুকিয়ে যায় এবং ঐ কাণ্ডটাও আর সতেজ থাকে না। সব পাতা একসাথে নিয়ে পুরো কাণ্ডটাই ঝরে পড়ে। পাতায় পাতায় এই ভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের জন্যেও অনুকরণীয় বটে! রাসূলুল্লাহ ﷺ আরেক হাদীসে[২০২] মুসলমানদের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, তারা একটি দেহের মতোই। যখন শরীরের কোনো একটা অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ আহত হয়, তখন ব্যথায় পুরো শরীরটাই কাতর হয়ে পড়ে। একজন মুসলিমও পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, তাঁর কোনো ভাই আক্রান্ত হলে সে ব্যথিত হয়, কাতর হয়ে পড়ে।

ব্যথিত হওয়া আর বেদনাহত হওয়া একই কথা, তাই না? বেদনাহত মন নিয়ে এবার বেদানা ফলের গল্প শোনা যাক।

বেদানাকে আমাদের অঞ্চলে আনার বলে। উর্দুতেও একে 'আনার' বলা হয়। 'বেদানা' নাম নিয়ে আমার অনেকদিন পর্যন্ত খটকা লেগেই ছিলো। বেদানা মানে আমরা বুঝি 'দানাহীন'। উর্দুতে 'বে' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় বিয়োজন অর্থে। অন্যদিকে 'বা' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় সংযুক্তি অর্থে। যেমন: 'বাগুন্নাহ' মানে গুন্নাহসহ, 'বেগুন্নাহ' মানে গুন্নাহবিহীন। এমনিভাবে 'বাআদব' মানে শিষ্টাচারী, 'বেআদব' মানে অশিষ্টাচারী। সেই হিসেবে 'বেদানা'র অর্থ দাঁড়াচ্ছে দানাবিহীন ফল। অথচ বেদানায় যত দানা আছে, অন্য কোনো ফলে তত আছে কি না সন্দেহ। সম্পূর্ণ উলটো হয়ে গেল না? নামটা হওয়া উচিত ছিলো 'বাদানা' (দানাযুক্ত ফল)।

'বাংলা একাডেমি অভিধান' খুললাম। সেখানে দেখাচ্ছে, শব্দটা মূলত ফার্সি। ফার্সি হলেও তো 'বে' ও 'বা' প্রত্যয়ের অর্থপার্থক্য ঘুচে যায় না। শরণাপন্ন হলাম একজন বন্ধুর[২০৩] কাছে, যে কিনা ফার্সি ভাষায় দখল রাখে। সে জানালো, ফার্সিতেও ফলটাকে 'আনার'ই বলা হয়। তবে অপ্রচলিত প্রতিশব্দ হিসেবে 'বেদানা'র ব্যবহারও আছে। আমাদের পূর্বানুমান এক্ষেত্রে ঠিক আছে। প্রমিত ফার্সিতে একে 'বাদানা'ই বলা হয়। 'বাদানা'র বিকৃত উচ্চারণ হলো 'বেদানা'। এক ঝটকায় খটকা দূর হয়ে গেলো। একটা জটিলতারও অবসান হলো।

অনেক অঞ্চলে ফলটাকে 'ডালিম'ও বলা হয়। ঐ যে, ছড়া শুনেছো:

"আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ
এত ডাকি তবু কথা কও না কেন বউ?"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জেনে রাখা ভালো, এখানে 'বউ' মানে কারও অর্ধাঙ্গীকে বোঝানো হয়নি। আতা গাছে তোতা পাখি বসতে পারে, ডালিম গাছে মৌমাছিও থাকতে পারে, তবে কোনো গাছে একজন মানুষ উঠে বসে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। এই 'বউ' বলতে আসলে একটা পাখিকে বোঝানো হয়েছে, যার নাম 'বউ-কথা-কও'। নজরুলের কবিতাতেও [২০৪] পাখিটার উল্লেখ এভাবেই আছে: "আগের মতো আমের ডালে/ বোল ধরেছে বউ.."। এরকম অদ্ভুত নাম দেয়া হয়েছে আরও একটা পাখিকে। তার নাম 'খোকা-হোক পাখি'। পাখিটা যখন একটানা ডাকতে থাকে, তখন "খোকা-হোক খোকা-হোক"—এরকম উচ্চারণের কাছাকাছি একটা আওয়াজ করে যায়। তাই এই নাম দেওয়া। এই নামকরণ অবশ্য সার্থক, কারণ নিজ কানেই পাখিটার ডাক শুনেছি।

ডালিম গাছের ফুলটাও কিন্তু অসাধারণ! দেখতে অনেকটা জবা ফুলের মতো। ডালিম ফুলের এই সৌন্দর্য নজরুলের লেখায় আরও চমৎকার হয়ে ওঠে:

"...দোয়েলা দোল দিয়ে যায়
ডালিম ফুলের নব কোরকে..."

কখনো নিজ চোখে না দেখলেও এটা পড়তে গিয়ে মনে হয়, চোখের সামনেই যেন দেখতে পাচ্ছি একটা ডালিম ফুলের নতুন কুঁড়িতে দোয়েলছানার নাচন।

জান্নাত কি আমরা দেখেছি? দেখিনি। তবে কুরআন ও হাদীসের পাতায় অঙ্কিত জান্নাতের খণ্ডচিত্রগুলো আমরা কল্পনা করতে পারি। এই কল্পচিত্রেও ডালিম প্রাসঙ্গিক! কারণ, এতক্ষণ ধরে খেজুর আর ডালিমের গল্প করে গেলেও যে কথাটা বলিনি, সেটা হলো, খেজুর আর ডালিম (বেদানা) জান্নাতের ফল! কুরআন থেকেই শোনো: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

"সেখানে আছে ফলমূল, খেজুর ও বেদানা।"[২০৫]

একটু আগে আমরা যে বরই গাছের গল্প করেছি, সেটাও জান্নাতে থাকবে। তবে আমাদের বরই গাছ তো কাঁটায় ভরতি, কিন্তু জান্নাতের বরই গাছে কোনো কাঁটাই থাকবে না। থাকবে বিভিন্ন স্বাদের কলা। সেটাও কুরআনই বলছে:

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ. وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ .
وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ . وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ.

"ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তরা কত সৌভাগ্যবান! তারা যে উদ্যানে থাকবে, সেখানে আছে কাঁটাবিহীন কুলগাছ, সারিবদ্ধ কাঁদি কাঁদি কলা, প্রসারিত ছায়া,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রবহমান পানি, এবং আরও অনেক ফলমূল।"[২০৬]

খেজুর, ডালিম, বরই, কলা।

শুধু এই কয়টা ফলই থাকবে?

আমার যদি নাশপাতি খেতে ইচ্ছে হয়?

বাঙ্গি ভেঙে খাওয়ার শখ হয় যদি?

কিংবা কখনো যদি তালশাঁসের স্বাদ নেওয়ার সাধ জাগে?

তখন কী হবে?

উঁহু! আল্লাহ তো তোমার পরিচিত কয়েকটা ফলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাত্র। জান্নাতের ফলমূল এগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়। তোমার যে ফলটাই খেতে ইচ্ছে হবে, সেটাই পেয়ে যাবে। আল্লাহ নিজেই বলছেন:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِما يَشْتَهُونَ

"আল্লাহভীরু ব্যক্তিরা থাকবে ছায়াবীথি, ঝরনাধারা এবং ফলমূলের মধ্যে, যে ফলই তারা ইচ্ছে করে।"[২০৭]

আরেকটা আয়াতে আল্লাহ বলছেন:

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ

"তারা সেখানে প্রশান্তচিত্তে যেকোনো ধরনের ফল আনতে বলবে।"[২০৮]

যদি গাছ থেকে ছিঁড়ে ফল খেতে ইচ্ছে হয়?

সেই ব্যবস্থাও কিন্তু আল্লাহ রেখেছেন! তবে কোনো কষ্ট ছাড়াই ফল পাড়া যাবে সেখানে। গাছে উঠতে হবে না, কিংবা ফলের ডাল কিছুটা উঁচুতে হলে কোনো কিছুর সাহায্যে পেড়ে আনার বিড়ম্বনাও সামনে আসবে না। হাতের কাছেই ঝুলতে থাকবে ফলভরতি গাছের ডাল।

আমার বানানো কথা?

নাহ, আল্লাহর কথা![২০৯]

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ . إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ
حِسَابِيَهْ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ . فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে (অন্যদের) বলবে, 'এই নাও আমার আমলনামা, পড়ে দেখো। আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' অতএব সে সুখী জীবনযাপন করবে উঁচু মর্যাদাপূর্ণ জান্নাতে, যেখানকার ফলগুলো থাকবে তার হাতের কাছেই।"

আমাকে সর্বোচ্চ সম্মান ও অভ্যর্থনা সহকারে বরণ করার জন্যে জান্নাতের সব আয়োজন অপেক্ষমাণ। এই সম্মান ও অভ্যর্থনা পাওয়ার মতো উপযুক্ত হওয়ার জন্যে আমি কি চেষ্টা করি?

গনগনে সূর্যোত্তাপ ক্রমশ বেড়ে চলছে। মেহগনি গাছের মগডাল থেকে শুরু করে সবগুলো শাখা-প্রশাখা ফুলে ভরতি। শৈশবে যখন গ্রামে ছিলাম, তখন গ্রীষ্মকালে কয়েকটা ফুলের প্রতি আমার আলাদা দুর্বলতা ছিলো: মেহগনির ফুল, সোনালু ফুল আর হাসনাহেনা ফুল। শহরে বাড়ি করার পর আব্বা অনেকগুলো গাছের সাথে মেহগনিও লাগিয়েছেন। কয়েক বছর ধরে হাসনাহেনাও ফুটছে। কিন্তু সোনালু ফুল আর দেখা হলো না। এই ফুল দিয়ে শেকলের মতো মালা গেঁথে আমরা কত ছুটোছুটি করেছি! গাছজুড়ে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা সোনালু ফুলগুলোকে দেখে মনে হতো একগুচ্ছ হলুদ ঝাড়বাতি। নাগরিক জীবনের ডামাডোলে সেই স্মৃতিগুলো একপ্রকার বিস্মৃত হতে চললেও আমার স্মৃতিকারতাকে এখনো পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে যেতে শিখিনি।

এরই মধ্যে যোহরের আযান হয়ে গেছে। জামা'আতের সময় প্রায় আসন্ন, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে না মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে। পত্রিকায় দেখলাম, আজকের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি হবে। ভাবতেই গা শিউরে উঠছে। এই গরমে রাস্তায় যদি বেরোই, মাথার চাঁদি অক্ষত থাকবে কি না সন্দেহ। তাছাড়া মাসজিদের জানালাগুলো এত্তো ছোটো, বাতাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। সালাতের মাঝখানে বিদ্যুৎ চলে গেলে মনে হয় একটা রুটি বানানোর তন্দুরে আটকা পড়েছি। সালাতে মনোযোগটা ছুটে যায়, পুরো শরীর ঘেমে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে যায়। এইসব ভাবতে ভাবতে আমি পিছুটান অনুভব করলাম, মাসজিদের দিকে যাবো কি যাবো না, এমন ইতস্তত ভাব চলে আসছিলো। আম্মা আমার অবস্থা আন্দাজ করে কিচ্ছুটি না বলে কুরআনের একটা আয়াত শুনিয়ে দিলেন!

আয়াতটা বলার আগে আয়াতের প্রেক্ষাপট শুনে নিতে পারো। নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। তাবূক যুদ্ধের ময়দান ছিলো অনেক দূরে। সময়টা ছিলো প্রখর-রৌদ্রতপ্ত, গনগনে উত্তাপে সিদ্ধ। একে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তো উত্তাপময় দিন, তার উপর দীর্ঘ সফর! পিছিয়ে থাকা সুযোগসন্ধানী মুনাফিকরা একে অপরকে প্ররোচনা দিতে লাগলো যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকার জন্যে। আল্লাহ তাদেরকে সাবধান করে দিলেন এই আয়াতটি নাযিল করে:

وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

"এবং তারা বললো: তোমরা এই গরমে অভিযানে বের হয়ো না। আপনি বলুন: জাহান্নামের আগুন এরচেয়েও বেশি উত্তপ্ত। যদি তারা বুঝতো!"[২১০]

আম্মা আর কিছু বললেন না। আয়াতটা শুনেই আমি বুঝে ফেলেছি, যা বোঝা প্রয়োজন। আকলমন্দ কে লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায়! গরমের দোহাই দিয়ে যেখানে সুদীর্ঘ যুদ্ধযাত্রায়ও কোনো হেলার সুযোগ ছিলো না, সেখানে অল্প দূরত্বের মাসজিদে গমনে আমি কীভাবে হেলা করি?

এই আয়াতটা বড় আপার কাছেও অনেকবার শুনেছি। কোথাও যেতে হলে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও পরিপূর্ণ পর্দা করতেন। মেজ আপা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই উত্তপ্ত রোদের মধ্যেও কেন তিনি পোষাকের ক্ষেত্রে শিথিলতা আনছেন না। বড় আপা আয়াতের শেষাংশটা দিয়েই জবাব দিয়ে দিলেন:

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

"আপনি বলুন: জাহান্নামের আগুন এরচেয়েও বেশি উত্তপ্ত। যদি তারা বুঝতো!"

মাসজিদ থেকে ফিরে শুনলাম, আব্বা রোযা রেখেছেন আজকে। প্রতি চান্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখ তাঁকে রোযা রাখতে দেখি। এগুলোকে 'আইয়াম বীদ্ব'-এর রোযা বলা হয়। রাসূলুল্লাহ এই রোযাগুলো রেখেছেন এবং রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন।[২১১] কিন্তু এই তীব্র গরমের মধ্যে নফল রোযা রাখার জন্যে এত কষ্ট ভোগ করাটা আমার কাছে কেমন জানি ঠেকে। আমার কাছে যেমনই ঠেকুক, দিনশেষে সত্য কথা হলো, ভালোবাসা কোনো যুক্তি মানে না।

নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহর প্রতি ভালোবাসা তাঁর অন্তরে গেঁথে আছে, অতএব, এটুকু কষ্ট স্বীকার করে হলেও তিনি সেটা পালন করবেন। আমি জানতে চাইলাম, 'আব্বা, গ্রীষ্মকালে দিন তো এমনিতেই বড়ো, তার ওপর তাপমাত্রার যা অবস্থা, তোমারও উদয়াস্ত দৌড়াদৌড়িতে সময় কাটে; নফল রোযার জন্যে কেন বাড়তি এতো কষ্ট কাঁধে নিচ্ছো?' আব্বা মুচকি হেসে বললেন, 'আয় তোকে একটা হাদীস শোনাই'। বুঝতে পেরেছি, আব্বা সেই চিরচেনা অস্ত্র দিয়েই আমাকে ঘায়েল করে দেবেন। আমি রাজি হলাম শোনার জন্যে। নতুন কিছু জানার জন্যে এমনিতেই তো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উদগ্রীব থাকি, একটা নতুন হাদীস শোনার জন্যে উৎসাহী হতে দোষ কোথায়?

আব্বা শোনালেন রাসূলুল্লাহর একটি হাদীস[২১২]:

من صام يومًا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حرَّ جهنم عن وجهه سبعين خريفًا

"যে আল্লাহর পথে একদিন সাওম পালন করবে, আল্লাহ সেই একদিনের বিনিময়ে সত্তর বছরের জন্যে তাঁর কাছ থেকে জাহান্নামের উত্তাপ দূরে সরিয়ে দেবেন।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। যা বোঝার, বুঝে গেছি। জাহান্নামের উত্তাপের তুলনায় গ্রীষ্মের এই দাবদাহ তাঁর কাছে একেবারে নস্যি। এই দাবদাহে কয়েকদিন না হয় গলা শুকাবে, কিন্তু তার বিনিময়ে অনন্ত ও অসহনীয় দাবদাহ থেকে আল্লাহ যদি তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখেন, তাহলে সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে তাঁর গায়ে লাগবে কেন?

আব্বার বয়স কম হয়নি। পঞ্চাশের কোঠা ছুঁইছুঁই। উচ্চরক্তচাপে ভুগছেন বছর পাঁচেক ধরেই। একান্নবর্তী সংসারের ঘানি একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আয়-রোজগার শতভাগ হালাল রাখতে চান বলে খাটুনি একটু বেশিই খাটতে হয় তাঁকে। আল্লাহ ব্যবসায় যথেষ্ট বারাকাহ দিয়েছেন, দিচ্ছেন। এত পরিশ্রমের পরও, বয়সের ভারে ন্যুব্জ হতে শুরু করলেও ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোথাও কমতি করতে দেখি না তাঁকে। দেখলে না, গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদেও রোযা ছাড়ছেন না!

তাঁর এই পাগলামো দেখে আমার মনে পড়ে একজন তাবি'ঈর কথা। নাম তাঁর আহনাফ বিন ক্বাইস। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তবে নিজ চোখে তাঁকে দেখতে পারেননি। কিন্তু তিনি এমন একজন সৌভাগ্যবান মানুষ, যিনি রাসূল ﷺ-এর সামনে না এসেও তাঁর আন্তরিক দু'আ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তাঁর এই নামের পেছনেও একটা কারণ আছে। আরবিতে 'হানফ' (حنف) মানে হলো পা বাঁকা হওয়া। জন্ম থেকেই তাঁর পা কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিলো বিধায় তাঁকে 'আহনাফ' বলে ডাকা হতো। বাঁকা পা নিয়েই সরলপথের (সিরাত মুস্তাকীম) অভিযাত্রী হয়েছিলেন তিনি। এই মানুষটি বার্ধক্যে উপনীত হয়েও নফল সাওম রাখা বাদ দিলেন না।

তাঁকে বলা হলো: আপনি অতি বয়স্ক একজন বৃদ্ধ, এই সিয়াম আপনাকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে!

আহনাফ বললেন[২১৩]:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

الصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه

"আল্লাহর আযাবের সময় ধৈর্যধারণ করার চেয়ে আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ!"

তাঁর কথাটা আমাকে এতটাই আলোড়িত করেছে যে, আর্টপেপারে ক্যালিগ্রাফি করে ড্রইংরুমের দেয়ালে সাঁটিয়ে দিয়েছি।

আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হলে কেউ কি সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারবে? পারবে না। যেভাবেই হোক, সেই শাস্তি সহ্য করে যাওয়া ছাড়া কারও কোনো উপায় নেই। দাঁতে দাঁত চেপে শাস্তিটা মেনেই নিতে হবে। সেই সুকঠিন মুহূর্তে ধৈর্যধারণের কষ্ট কতটা অসহনীয়, কতটা যন্ত্রণাদায়ক, তা তো কল্পনাতেও ধরা পড়ে না ঠিকঠাক। আহনাফ হিসেব করে দেখলেন, আযাবের সময় ধৈর্যধারণের যে অবর্ণনীয় কষ্ট, সেটাকে লাঘব করতে চাইলে ইবাদাতের সময় ধৈর্যধারণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। রৌদ্রতপ্ত দিনে একদিন উপোস থাকার কষ্ট ততটা বড়ো নয়, সরাসরি সূর্যোত্তাপে আপাদমস্তক গলিত হয়ে যাওয়ার কষ্ট যতটা ভয়ানক।

চোখে ঘুম ঘুম ভাব। আব্বাও শুয়েছেন, ক্লান্তিতে চোখ মুদে আছেন। ছোট ভাই এতক্ষণ ধরে বই পড়ছিলো সোফায় শুয়ে। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাসের উঠানামা বলে দিচ্ছে, ইতোমধ্যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে সে। গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলার ঘুম খুব পরিচিত একটি দৃশ্য। গ্রীষ্মের দুপুরের ঘুম মানে মাদকবিহীন মাদকতা। ঘর্মাক্ত ক্লান্ত দেহ বিছানার কাছে আসতেই তোমাকে সে চুম্বকের মতো টেনে নেবে। ভালোরকম ঘুমিয়ে নিতে পারলে হালকা হয়ে যাবে, আর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলেই নির্ঘাত মাথাব্যথা! আমি অনেকক্ষণ এটা-সেটা পড়ে ঘুম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করলেও মাঝপথে রণে ভঙ্গ দেই, ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করি প্রায়ই। ইতিহাসখ্যাত ইংরেজি-সাহিত্য-সমালোচক হেনরি জেমস মন্তব্য করেছেন, তাঁর কাছে অসংখ্য ইংরেজি শব্দের ভিড়ে দুটো শব্দ সবচে' আকর্ষণীয়: summer afternoon.[২১৪] গ্রীষ্মের দুপুরে তৃপ্তিভরে ঘুমিয়ে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে উঠার সুখানুভূতি যে পায়নি, তার পক্ষে হেনরি জেমস-এর কথার মাজেজা বোঝা সম্ভব নয়। এসব ভাবতে ভাবতে বালিশে মাথা রেখে দিলাম।

সহসা চোখ বুজে আসে না। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেলো। ফিল্টার থেকে দুই গ্লাস ঠান্ডা পানি গলায় ঢেলে দিলাম। মৃদুস্বরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলছিলাম, আর ভাবছিলাম:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"তোমরা যে পানি পান করো, সে সম্পর্কে কি ভেবেছো? এই পানি কি মেঘ থেকে তোমরাই বর্ষণ করেছো? নাকি আমিই বর্ষণ করেছি? আমি তো চাইলে পানিটা লবণাক্ত করে দিতে পারতাম! তোমরা কি এরপরও কৃতজ্ঞ হবে না?"

আসলেই তো! সাগরের লবণাক্ত পানি থেকে এই মেঘ সৃষ্ট। আল্লাহ তো চাইলে মেঘের পানিতে লবণাক্ততা রেখে দিতে পারতেন! আমাদের জন্যে লবণাক্ত বৃষ্টি পতিত হতে পারতো! তারপর পান করতে গিয়ে আমাদের কী অবস্থা হতো? আল্লাহ তো তা করেননি। আমাদের ওপর অনুগ্রহ করে সেই লবণাক্ততা ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান থেকে পুরোপুরি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার করে আমাদের জন্যে সুপেয় বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। আমাদের কি উচিত নয়, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা? চলো, তাঁর অবদানের কথা অবধান করি, অপার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে যাই!

যতটা নিশ্চিন্তে আমি পানিটা পান করেছি, যতটা নির্ভারচিত্তে কলিজাটা ঠান্ডা করেছি, আমাদের পূর্বসুরীরা ততটা নিশ্চিন্ত ও নির্ভার থাকতে পারতেন না। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ﵄-এর কথা তো অনেক শুনেছো। তিনি যখনই ঠান্ডা পানি পান করতেন, তখনই কান্না জুড়ে দিতেন। কেন কাঁদতেন জানো? তাঁর মন চলে যেতো কুরআনের একটি আয়াতের কাছে, যেখানে এক ফোঁটা সুপেয় পানির জন্যে জাহান্নামীদের বুকফাটা আর্তনাদের কথা এসেছে। তীব্র তৃষ্ণায় যখন তাদের বুকের ছাতি ফেটে যাবে, তখন জান্নাতবাসীদের প্রতি লক্ষ করে তারা বলবে:

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

"জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদেরকে সামান্য কিছু পানি দাও! অথবা আল্লাহ তোমাদের যেসব রিযক দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কিছু দাও!" [সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫০]

তাদের এই মর্মন্তুদ আহাজারি ও মর্মান্তিক রোনাজারি কোনো ফল বয়ে আনবে না। কাটাগায়ে লবণের ছিটা পড়লে যেমন যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়, জাহান্নামীদের যাতনাকেও আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে তাদের প্রতি ছুড়ে দেওয়া প্রত্যাখ্যানের উক্তি:

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

"জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহ তো এই পানি ও রিযক কাফিরদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন!" [সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ﵁ এই আয়াত মনে করে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তেন। জীবনের খেরোখাতা উলটে-পালটে দেখতেন। সেই কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। তুমি, আমি, এই আমরা-আমাদেরও উচিত জাহান্নামের শাস্তির কথা নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিটা মুহূর্তেই জাহান্নামের স্মরণ আমাদেরকে সীমা অতিক্রমের দুঃসাহস থেকে ফিরিয়ে রাখে। অকৃতজ্ঞতার চোরাবালিতে পা দেওয়া থেকে আমাদের বিরত রাখে।

আচ্ছা, তোমার মনে তো নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে, যদি ঠান্ডা ও সুপেয় পানি তাদের না দেওয়া হয়, তাহলে তৃষ্ণা পেলে তারা কী পান করবে? এসো, কুরআন থেকে আমরা উত্তর জেনে নেই।

কুরআনে জাহান্নামীদের প্রদেয় পানীয়'র বর্ণনা দিতে গিয়ে মোটামুটি চার ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আমি একে একে চারটি নাম বলবো, দেখি তুমি মনে রাখতে পারো কি না!

- اَلْحَمِيْم আল-হামীম
- اَلْغَسَّاق আল-গাসসাক্ব
- اَلصَّدِيْد আস-সাদীদ
- كَالْمُهْلِ কাল-মুহল।

এবার একে একে এই চার ধরনের পানীয়ের সাথে আমরা একটু পরিচিত হই, কী বলো?

হামীম বলা হয় এমন পানীয়কে, যা অত্যধিক গরম, টগবগ করে ফুটতে থাকে। পানির তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে, পানকারীর নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিশ্বাস হচ্ছে না?

এসো, কুরআন থেকেই শুনি:

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

"এবং তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত গরম পানি, এরপর সেই পানি তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে।"[২১৫]

বলে রাখি, গত মাসে তোমার যে নবজাতক ভাগ্নের নাম 'হামীম' রেখেছো, তার নাম নিয়ে আবার দুশ্চিন্তায় পড়ে যেয়ো না। হামীম-এর একটা ভালো অর্থও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আছেঃ অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই অর্থে কুরআনেও শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে।[২১৬] সুতরাং নাম পরিবর্তনের জন্যে তোড়জোড় লাগিয়ে আপা আর দুলাভাইকে বিব্রত করার প্রয়োজন নেই।

আমরা বরং হামীম (حَمِيم) পানীয়ের আরেকটা বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন থেকে জেনে নেই। এই পানি পেটের সবকিছু উদ্‌গিরণ করে দেবে, একইসাথে চামড়াও ঝলসে দেবে।

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ
. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ.[১৭২]

"অতঃপর যারা কুফরি করেছে, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে 'হামীম' (ফুটন্ত গরম পানি)। এর ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা গলে বেরিয়ে যাবে, গলে যাবে তাদের চামড়াও।"

এবার এসো আল-গাসসাক্ব এর সাথে পরিচিত হই।

কুরআন বলছেঃ

هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ

"এটা 'হামীম' ও 'গাসসাক্ব'; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক।"

[সূরা সাদ, ৩৮:৫৭]

গাসসাক্ব পুরোপুরি হামীম-এর বিপরীত। অত্যধিক তাপমাত্রায় উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হওয়া পানি যেমন পানের অযোগ্য, তেমনি অত্যধিক ঠান্ডা পানিও পান করা যায় না। এরকম পান-অযোগ্য তীব্র ঠান্ডা পানিকে 'গাসসাক্ব' বলা হয়।[২১৮] কিছু বর্ণনায় দেখা যায়, 'গাসসাক্ব'এর অর্থ হচ্ছেঃ জাহান্নামীদের পুঁজ।[২১৯]

'সাদীদ'টা কী?

কুরআনের আয়াতটা পড়ে নিইঃ

وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ

"এবং পান করানো হবে 'সাদীদ' পানি।"[২২০]

শরীরের কোথাও ফোঁড়া হলে, বা ক্ষত সৃষ্টি হলে, সেখান থেকে যে দূষিত রস নিঃসরণ হয়, সেটাই 'সাদীদ'। এক কথায় 'পুঁজ'ও বলতে পারো একে। শুধু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এটুকু বললেই 'সাদীদ'-এর পূর্ণ পরিচয় ধরা যায় না। ইবন কাসীর ﵀ বলছেন, এই পানীয় হবে প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত।[২২১] এই পুঁজমিশ্রিত ও দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় জাহান্নামীদের দেওয়া হবে পান করার জন্যে।[২২২]

'সাদীদ'-এর আরেকটি পরিচয় হচ্ছে, এটি জাহান্নামীদের শরীর থেকে প্রবাহিত হওয়া বমি ও রক্তের মিশ্রিত পানীয়।[২২৩] 'ইকরিমাহ ﵀ এই মতটির প্রবক্তা।[২২৪]

এরকম দুর্গন্ধযুক্ত ঘৃণিত তরল পান করতে হবে জাহান্নামীদের! ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠে!

'সাদীদ' পান করার সময় পানকারীর অবস্থা কী হবে?

কুরআন কী বলে দেখো:

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.

"সে এই পানীয় বারবার ঢোক গিলে পান করতে চাইবে, কিন্তু তা গলা দিয়ে ঢুকতে চাইবে না। মৃত্যু সবদিক থেকে তাকে আচ্ছাদিত করবে, কিন্তু সে মরবে না। তার জন্যে সামনে আরও কঠোর শাস্তি রয়েছে।"[২২৫]

আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে, আমাদের সবাইকে এই অবর্ণনীয় ও অসহনীয় দুরাবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিন।

এবার এসো 'কাল-মুহল'-এর পরিচয় জানি। كالمهل এর মানে: 'মুহল'-এর মতো। কুরআনে এভাবে এসেছে:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ

"বলুন: (এই কুরআন) তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে আগত সত্য। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক। আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে এমন আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার চতুর্মুখী স্ফুলিঙ্গ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। তারা যদি পানি প্রার্থনা করে, তাহলে তাদেরকে এমন পানীয় দেওয়া হবে, যা 'মুহল'-এর মতো, যা জাহান্নামীদের চেহারা ঝলসে দেবে।" [সূরা কাহফ, ১৮:২৯]

'মুহল'-এর অর্থ: তেলের গাদ।[২২৬] এই পানীয় হবে তেলের গাদ-এর মতো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কালো।

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ ﵁ বলেছেন: 'মুহল' হচ্ছে গলিত খনিজ পদার্থ।[২২৭]

বোঝা যাচ্ছে, খনিজ পদার্থ গলনের জন্যে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করা হয়, এই পানীয় সেরকম কঠিন উত্তাপ বহন করবে। একইসাথে তার বর্ণ হবে তেলের তলানির মতোই কালো। এই পানীয় তাদের চেহারা ঝলসে দেবে! এজন্যেই আয়াতটির শেষে আল্লাহ বলেছেন:

بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"কত নিকৃষ্ট এই পানীয়! কত নিকৃষ্ট এই আবাস!"[২২৮]

আমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হবো না, তাঁর প্রতি ঈমানের দাবিতে সত্যিকার অর্থেই সত্যবাদী হবো, তাহলে এই নিকৃষ্ট, নিন্দিত ও ঘৃণিত পানীয় গলাধঃকরণের দুঃসহ অভিজ্ঞতা আমাদের জাম্বিলে পুরতে হবে না।

কী, মনে থাকবে তো আমার?

ইন শা-আল্লাহ, মনে থাকবে।

মনে যে রাখতেই হবে!

আমি তো আর দশজনের মতো উদ্দেশ্যহীন বাউণ্ডুলেপনার জন্যে সুন্দর এই পৃথিবীতে আসিনি। আমার একটা গন্তব্য আছে, আমার পথচলার সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ আছে, আমার জীবনাচারের একটা অর্থ আছে। সুতরাং আমাকে সন্তর্পণে হাঁটতে হবে, আমাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে, আমাকে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে অনুক্ষণ।

উফ, কী যে অবস্থা! কয়েক ঢোক পানি গলায় দিতে গিয়ে কতদূরে চলে এলাম ভাবনার ভেলায় চড়ে! এলামই যেহেতু, আরেকটু যাই। এতক্ষণ তো জাহান্নামীদের প্রদেয় বিভিন্ন পানীয়'র গল্প করলাম। এবার আমাদের আজন্ম লালিত সবুজ ঠিকানা, আমাদের শুদ্ধাচারী জীবনের শেষ সীমানা, বিশ্বাসী হৃদয়ে বিম্বিত স্বপ্নের চূড়ান্ত নিশানা—জান্নাতে কেমন পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে, সেটা তো জানা চাই!

কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে জান্নাতীদের যেসব পানীয়'র কথা বলা হয়েছে, সেগুলো মোটামুটি এই: সুস্বাদু স্বচ্ছ পানি, দুধ, সুরা, মধু, কাফূর, সালসাবীল ও তাসনীম।

কিছু আইটেম তোমার খুব পরিচিত, কিছু নাম খানিকটা অপরিচিত, তাই না?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইন শা-আল্লাহ সবগুলোর পরিচয়ই আমরা একে একে জানার চেষ্টা করবো।

ট্র্যাক ভেঙে সুরা'র প্রসঙ্গটাই আগে আনি, কারণ শব্দটা চোখে পড়ার সাথে সাথেই তোমার ভ্রু কুঁচকে আছে, আমি জানি।

কুরআন বলছেঃ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ

"এবং তাতে রয়েছে সুরার নহর সমূহ।"[২২৯]

তোমার মনে সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

জান্নাতের মতো পবিত্র স্থানে অপবিত্র পানীয়! এটা কীভাবে সম্ভব?

যে মদ্যপানকে আল্লাহ নিজেই বলেছেন 'শয়তানের কদর্য কার্য'[২৩০] (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ), সেই মদ দিয়েই জান্নাতীরা আপ্যায়িত হবে? তাও আবার দুয়েক বোতল নয়, একেবারে নহর বইয়ে দেওয়া হবে।

কী আশ্চর্য!

আরেহ, এটা তো সেই মদ নয়! ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে মদ ও সুরার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, এরপরেও خَمْرٍ শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা 'মদ' শব্দের পরিবর্তে 'সুরা' শব্দ ব্যবহার করেছি, সামান্য হলেও যাতে পার্থক্য নির্দেশ করে। প্রচলন অনুসারে, মদ বলতে আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে এমন একটা মাদকদ্রব্য, যা উৎকট গন্ধ ও উদ্ভট স্বাদযুক্ত, আবার চেতনানাশকও বটে। কিন্তু জান্নাতে প্রদেয় মদ বা সুরা হবে পরিশীলিত, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র পানীয়, যা জান্নাতীদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

দেখো, কুরআন কী সুন্দর করে সেই পানীয়টির বর্ণনা দিচ্ছেঃ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ . بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ . لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ .

"তাদের ঘুরেফিরে পরিবেশন করা হবে প্রবাহিত নহর থেকে ভরে আনা পানপাত্র। পানকারীদের জন্যে সুশুভ্র এ পানীয় হবে বেশ সুস্বাদু এবং উপাদেয়। এতে থাকবে না কোনো নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। আর এটা পান করে তারা মাতালও হবে না।"[২৩১]

সুশুভ্র! একদম সাদা!

স্বাদে হবে অতুলনীয়!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই!

এই পানীয় পান করার পর পানকারীকে মাতলামিতে পাবে না!

কী বোঝা গেলো? তোমার কল্পনায় ধৃত মদ আর এখানে উদ্ধৃত পানীয়'র মাঝে আকাশপাতাল ব্যবধান!

স্বাদহীন, বর্ণহীন, শরীরমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী পচা কোনো মাদকদ্রব্য দিয়ে তোমাকে আপ্যায়ন করবেন তোমার রব্ব, এটা কি ভাবা যায়? যায় না। তোমার রব্ব'র পক্ষ থেকে যা দিয়েই আপ্যায়ন করা হবে, তার সবকিছুই স্বাদে-বর্ণে রুচিশীল, শরীরমনে মন্দ প্রভাব তো দূরের কথা, বরং নতুন সঞ্জীবনীর সঞ্চার করবে পানকারীর মধ্যে। মাতাল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আসবেই-বা কোথা থেকে, তুমি তো চূড়ান্ত সাফল্যের আনন্দে উদ্বেল, পরম আকাঙ্ক্ষিত জান্নাতে প্রবেশের উৎফুল্লতায় তুমি আত্মহারা! অতএব, জান্নাতে প্রদেয় 'সুরা' নিয়ে তুমি নিশ্চিন্তই থাকো, সংশয়ের কাঁটা তুলে ফেলো এক্ষুনি।

এবার প্রথম থেকে চতুর্থ পানীয়গুলোর বর্ণনা একসাথেই একটা আয়াতে দেখে নেই:

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

"সেখানে রয়েছে স্বচ্ছ-নির্মল পানির নহরসমূহ; দুধের নহরসমূহ, যার স্বাদ পরিবর্তিত হবে না; সুরার নহরসমূহ, যা পানকারীদের জন্যে হবে সুস্বাদু; এবং আছে পরিশোধিত মধুর নহর।"[২৩২]

আমার তো ভাবতেই একটা আনন্দানুভূতি তরঙ্গায়িত হচ্ছে। মনে হয়, এই তো চোখের সামনে বয়ে যাচ্ছে নদীগুলো! শান্ত নদীতে স্ফটিক-স্বচ্ছ পানির প্রবাহ, আরেকটি নদীতে জমাট তুষারের মতো সাদা সুস্বাদু দুধের স্রোত। তার পাশে বয়ে যাচ্ছে উপাদেয় সুরার নহর। অনতিদূরে আরেকটা নদী, যেটা বিশুদ্ধ মধু দিয়ে ভরতি। এই-নদী ওই-নদী ঘুরেঘুরে ইচ্ছেমতো পানপাত্র পূর্ণ করছি!

তোমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছে, তাই না? কল্পনায় আঁকা এই চিত্রকে সত্যি করে দিতে পারেন যিনি, স্বপ্নে অনুভূত এই মুহূর্তগুলোকে বাস্তবে সামনে এনে দিতে পারেন যিনি, তাঁর বাধ্যগত বান্দা হয়ে যাই, চলো! তিনি আমাদেরকে দেওয়ার জন্যেই এসব তৈয়ার করেছেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে নেওয়ার যোগ্য হতে চেষ্টা করি। আর জানোই তো, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওমা! শুধু নদী থেকেই পান করবে? কলকল রব তুলে যাওয়া একটা ঝরনার পাদদেশে দাঁড়াতে কি ইচ্ছে করবে না তোমার? তারপর কোনো কথা ছাড়াই আঁজলা ভরে পান করে যাওয়ার শখ জাগ্রত হবে না, বলো? চিন্তার কিছু নেই, সেটারও ব্যবস্থা করে রেখেছেন আমাদের রব্ব:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ

"(সেদিন) মুত্তাক্বীরা থাকবে ছায়াবীথি আর ঝরনাধারায়।"[২৩৩]

সুশীতল ছায়াঘেরা কিছু ঝরনা, তুমি আনমনে বসে আছো তার অববাহিকায়। কোথাও কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, ঝরনার ঢলে আহত হবার আশঙ্কা নেই, ভিড়ের মধ্যে পিষ্ট হবার কোনো ভয় নেই। আছে মৃদুমন্দ বাতাসের ছোঁয়া। ঝরনার প্রবাহ থেকে গায়ে এসে লাগছে কয়েকফোঁটা নির্মল পানি। কখনো হাতে নিয়ে, কখনো পানপাত্রে ভরে পানি পান করে যাচ্ছো। কেমন হতে পারে অনুভূতি!

এরকম বেশ কিছু ঝরনার নাম কুরআনে এসেছে। নামগুলো কী চমৎকার! একেকটা ঝরনার রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। একেকটা ঝরনার পানীয়'র একেক রকম স্বাদ।

জান্নাতের একটা ঝরনার নাম 'কাফূর'[২৩৪] (كافور)।

আরেকটা ঝরনার নাম 'সালসাবীল'[২৩৫] (سلسبيل)।

সবচে' আকর্ষণীয় ঝরনাটার নাম 'তাসনীম'[২৩৬] (تسنيم)।

প্রথম ঝরনাটিকে[২৩৭] 'কাফূর' বলা হয় কেন জানো? 'কাফূর' (كافور) মানে 'কর্পূর'। এটার পানীয় থেকে কর্পূরের মতো সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকবে, এ জন্যে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।[২৩৮] কী দারুণ ব্যাপার তাই না?

আরেকটা দারুণ ঝরনা 'সালসাবীল'। প্রমত্তা তার গতিপ্রবাহ।[২৩৯]

এর নামকরণের ব্যাপারেও 'আলিমগণ চমৎকার পর্যালোচনা হাজির করেছেন।

ইমাম আলূসী বলেছেন, এই ঝরনাটিকে সাবলীল গতিময়তার কারণে (لسلاستها) এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।[২৪০] অনেক ভাষাবিদ এটাকে تسلسل (অর্থ: ধারাবাহিকতা) শব্দ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। এই দৃষ্টিকোণে ঝরনাটিকে 'সালসাবীল' নামকরণের পেছনে কারণ হচ্ছে, এই ঝরনা থেকে পানকারীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একেকজন পানি পান করবে।[২৪১]

এই ঝরনার কথা হাদীসেও এসেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর স্নেহধন্য সাহাবি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ ﵁-এর জন্যে দু'আ করেছেন:

سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة

"আল্লাহ জান্নাতের সালসাবীল ঝরনায় ইবন 'আউফকে সিক্ত করুন।"[২৪২]

কী সৌভাগ্যবান এই মানুষ, তাই না?

আল্লাহর রাসূলের দু'আ পেয়ে গেলেন তিনি। কেমন দু'আ? একদম জান্নাতের ঝরনায় সিক্ত হবার দু'আ। শুধু তা-ই না, যে দশজন সাহাবি জান্নাতের জন্যে পৃথিবীতেই সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফও কিন্তু একজন!

এই মানুষগুলোকে আমার খুব ঈর্ষা হয়, জানো? তোমারও নিশ্চয় ঈর্ষা হয়। এক কাজ করি চলো, এঁদের যাপিত জীবনটাকে একটু জানার চেষ্টা করি। কীভাবে তাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটির দু'আ পাবার মতো উপযুক্ত হয়ে উঠলেন, জানতে নিশ্চয়ই ইচ্ছে হয়! নবিজি ﷺ-এর সান্নিধ্য যাঁদেরকে আলোকিত করেছিলো, পরশ মানিকের পরশে যাঁরা ধন্য হয়েছিলেন, সেই সোনার মানুষগুলোকে যদি ভালোভাবে পাঠ না করি, তাহলে একটা অপূর্ণতা কিন্তু রয়েই যায়। এঁদের সম্পর্কে আমরা যখন জানবো, ঈমানের বীজতলা থেকে আগাছা সরে যেতে থাকবে, চৈতন্যের ধুতরা ফুল বিষহীন হতে থাকবে, এই কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে দৃপ্ত পদভারে হাঁটার সাহস পোক্ত হতে থাকবে। সাহাবিদের জীবন নিয়ে লেখা কত বই আমাদের আশেপাশে আছে! সময় করে সেখান থেকে একটা হাতে নিয়ে নেবো, ইন শা-আল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা শুদ্ধাচারী জীবনে প্রাণিত হবো, শুভাচারী জীবনে প্রণোদিত হবো।

ওহহো, আরেকটা ঝরনার কথা কিন্তু বাকি রয়ে গেছে! এই ঝরনার নাম তাসনীম। এই নামকরণের পেছনেও সুন্দর একটা কারণ আছে।

উৎপত্তিগতভাবে তাসনীম (تَسْنِيْم) এর অর্থ: উঁচু হওয়া। এখান থেকেই উটের কুঁজকে বলা হয় সানাম (سَنَام); কারণ, ওটাই তার শরীরের সবচে' উঁচু অংশ।[২৪৩] জান্নাতেও মর্যাদার দিক থেকে 'তাসনীম' ঝরনার পানীয় সবচে' উঁচুতে, তাই এই নামে তার নামকরণ।

এটা জান্নাতের সবচে' অভিজাত ও মনোরম ঝরনা।[২৪৪] এটাই জান্নাতের সর্বোচ্চ পানীয়।[২৪৫]

এই ঝরনা থেকে পান করার সুযোগ পাবে কারা?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআন বলছেঃ

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

"এটা এমন ঝরনা, যা থেকে পান করবে নৈকট্য অর্জনকারীগণ।"[২৪৬]

তাহলে আর দেরি কেন? চলো, আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ব্রতী হই!

কীভাবে তাঁর নৈকট্য পাওয়া যাবে?

খুব সহজে! তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশনাকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে।

আরও বেশি নৈকট্য অর্জন করতে চাইলে কিছু অতিরিক্ত কাজও আমরা করে ফেলবো সুযোগ পেলেই। একটু সময় বের করে নিয়ে কিছু নফল সালাত আদায় করবো, মাঝেমধ্যে নফল সাওম রাখার জন্যে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করবো। এই ধরো, আগামী পরশুদিন ছুটির দিন আছে, তাহলে আগামীকাল শেষরাতে ঘুম থেকে একটু তাড়াতাড়ি উঠে যাবো, সিজদাবনত শিউলির সাথে রাত্রির শেষ প্রহরে আমিও অশ্রু ঝরিয়ে জায়নামাযের জমিন ভেজাতে পারবো।

দেখো, তুমি পিছিয়ে পড়লে কী হবে, তোমার আশেপাশে অনেক বিশ্বাসী মানুষ কিন্তু পিছিয়ে নেই। নীরবে-নিভৃতে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধানে তাঁরা তৎপর। তাঁরাও তো আমাদের মতো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ, আমাদের পৃথিবীতেই তাদের বাস, আমাদের পরিবেশেই তাদের প্রতিবেশ। আমি যদি পিছিয়ে পড়ি, আল্লাহর কাছাকাছি হবার কাজটাতে যদি আমাকে গাফলতিতে পেয়ে বসে, নিজের কাছেই কেমন ছোট হয়ে থাকবো না? এসো, আত্মপ্রত্যয়ী হইঃ 'আমি পিছিয়ে থাকবো না, বরং এগিয়ে থাকার চেষ্টা করবো!'

এই যে তোমাকে আমি প্রতিযোগিতা করার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছি, এটা কিন্তু তোমার প্রিয়তম রব্ব নিজেই বলেছেন!

কোথায় বলেছেন?

কুরআনে।

কোন জায়গায় বলেছেন?

যেখানে 'তাসনীম' ঝরনার কথা বলেছেন, সেখানেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। এসো, সূরা মুতাফফিফীনের পাতাটা খুলি, আয়াতগুলো এক নজরে দেখে নিই আর হৃদয়ঙ্গম করি:

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ . خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ .
وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ . عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ .

"তাদেরকে পান করানো হবে মোহর করা পানীয় থেকে। তার মোহর হবে কস্তুরী। এটা অর্জন করার জন্যে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। এই পানীয়টির মিশ্রণ হবে 'তাসনীম'-এর পানি। এটা এমন ঝরনা, যা থেকে পান করবে নৈকট্য অর্জনকারীগণ।"[২৪৭]

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে নিজেকে এগিয়ে রাখা কতটা প্রয়োজন, আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে পুণ্যের কাজে নিজেকে কত বেশি সক্রিয় করা দরকার, সেটা এই দুটো আয়াত থেকেই বুঝে নেয়া সম্ভব:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

"অগ্রগামীরা অগ্রগামীই থাকবে। তারাই আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হবে।"[২৪৮]

অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা ইবাদাত ও অন্যান্য ভালো কাজে এগিয়ে থাকবে, আখিরাতেও তারা জান্নাত প্রাপ্তিতে এগিয়ে থাকবে।[২৪৯]

কী বুঝলে?

সর্বোচ্চ রেজাল্টের অধিকারী যারা হতে চায়, তাদেরকে পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকলে তো চলেই না, বরং কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকার চিন্তা করতে হয়। একইভাবে, জান্নাতের সর্বোচ্চ পানীয় যদি আমরা নিজেদের করে পেতে চাই, পিছিয়ে পড়ার চিন্তাকে কি আর সুযোগ দেওয়া যাবে? যাবে না। সর্বোচ্চ রেজাল্টের জন্যে যেমন সর্বোচ্চ অধ্যবসায় চাই, জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার জন্যে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা চাই। চলো, জোর কদমে এগিয়ে যাই রব্বের প্রতিশ্রুত জান্নাতের আহ্বানে, আন্তরিকতার সবটুকু ঢেলে ছুটে চলি শাশ্বত সুন্দরের আবাহনে।

আল্লাহ তোমাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে জান্নাতের ঝরনাধারায় সিক্ত করুন!

এই যে আমরা জাহান্নাম আর জান্নাতের পানীয়ের কথা বলতে বলতে এতদূর চলে এলাম, ফাঁকতালে একটা কথা কিন্তু বলা হলো না, আর সেটা হচ্ছে, ছোট ভাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে গেছে। এদিকে ভাবনার গ্যাঁড়াকলে পড়ে আমার ঘুমের তো দফা সারা। সে ঘুম থেকে উঠেই বায়না ধরেছে, আমবাগানে যাবে। ভাবছো, এটা আবার গ্রাম নাকি? আমবাগান কোথা থেকে আসবে? হ্যাঁ, গ্রাম নয় বটে, তবে একেবারে শহরও বলা যায় না। শহরতলী বললে বোধহয় মোটামুটি জুতসই শোনা যায়। এই বাড়িটা করার সময় শহরতলীও বলা যেত না, বড়জোর শহরঘেঁষা বিজন গ্রাম বলা যেত। তো, বাড়ির অদূরে, আধমাইলের কিছুটা কম দূরত্বে আমাদের আরও কিছু জমি কেনা হয়েছিলো। মাটিগুলো বেশ উর্বর। আব্বা সেখানে আমের বাগান করেছেন। কিছু লিচু গাছও আছে। নানা পদের আরও কিছু ফলের গাছ আছে, তবে দূর থেকে শুধু আমগাছগুলোই দৃশ্যমান। আমরা মাঝেমধ্যে এই বাগানে বিকাল কাটাই। কিন্তু এই মধ্যদুপুরে বাগানে যেতে চাওয়ার হেতু কী? সে বললো, খুব আম খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আরে বাবা, আম তো বিকেলে গিয়েও খাওয়া যায়। না, সে নাছোড়বান্দা। বিকেলবেলা তাকে প্রাইভেট টিউটরের সামনে বসে যেতে হবে, গেলে এখনই যাওয়া চাই। কী আর করা, চললাম দুজনে। ছোট ভাই আবার ভালো সাইক্লিং পারে। আমাকে সাইকেলের পেছনে তুলে সে প্যাডেলে চাপ দিলো। ওর সাইকেল চালানোর কসরত দেখে মনে পড়ছিলো বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটা চমৎকার কথা:

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving."

(জীবনটা বাইসাইকেল চালানোর মতোই। পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে হলে তোমাকে অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।)

এই কথাটা তিনি তাঁর পুত্রকে একটা চিঠিতে বলেছিলেন।[২৫০]

খুব চমৎকার কথা, তাই না?

এরকম আরেকজন বাবার কথা তোমাকে বলি, যিনি তাঁর পুত্রকে একগুচ্ছ সুন্দর উপদেশ দিয়েছিলেন, এই উপদেশগুলো আল্লাহর এতটাই পছন্দ হয়েছে যে, তিনি সেগুলো কুরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন! তাঁর নাম লুকমান ﷺ। খুব জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরাও আছে। আমার যেহেতু গল্প বলতে হবে, আমবাগানের পূর্বাপর কাহিনি তোমাকে শোনাতে হবে, সেহেতু পিতা-পুত্রের উপদেশগুলো একে একে শোনানোর ফুরসত নেই। একটু কষ্ট করে তোমাকেই পড়ে নিতে হবে। এই গল্পটা শেষ করে কুরআন খুলবে, সোজা চলে যাবে কুরআনের একত্রিংশতম সূরা—সূরা লুকমানে। এই সূরার ১২ থেকে ২০ আয়াত পর্যন্ত একবার পড়ে ফেলো। তারপর অর্থটাও দেখে নাও। ব্যস, তুমি চমৎকার এক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঐতিহাসিক উপদেশগুচ্ছ জেনে ফেললে! দেখো তো, আয়াতগুলো তোমার মনে একটু রেখাপাত করে কি না!

চলো আমবাগানের দিকেই। আমরা চলছি। সাইকেলের গতি বাড়ে আর কমে। রোদের তীব্রতা কমা তো দূরের কথা, বেড়েই চলছে। মধ্যদুপুরে এমনিতে সূর্যোত্তাপ নিস্তেজ হওয়া শুরু করে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আরও বেশি তেজি হতে যাচ্ছে। আশেপাশে সবদিক জনমানবহীন। কে বেরোবে এরকম চাঁদিফাটা রোদে? ছোটবেলায় আমরা ছড়া পড়েছিলাম:

"রোদ যেন নয় শুধু গনগনে ফুলকি
আগুনের ঘোড়া যেন ছুটে চলে দুলকি।"

গনগনে রোদকে সওয়ারি করে আগুনের ঘোড়া তো ছুটছেই, এদিকে রোদের বুক চিরে আমাদের সাইকেলও ছুটছে। কিছু বাতাসও গায়ে লাগতে শুরু করেছে। সাইকেলের গতি যত বাড়ে, বাতাসের ছোঁয়াও তত তীব্র হয়, রোদের পরশ তত হালকা হয়ে আসে। গতি যত কমে, বাতাসের ছোঁয়া তত কমে, রোদের তীব্রতাও তত বেশি অনুভূত হয়। যদি এই উত্তপ্ত বালুকাময় রাস্তায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে বাতাসের ছোঁয়া একটুও পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, রোদের তীব্রতা আরও বেশি তীব্রতর হয়ে আমাদের ঘিরে ধরবে। এখান থেকে আমার ভেতর একটা উপলব্ধির অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। এই পাপসংকুল পৃথিবীর ঈমান বিনাশী সব আয়োজন যখন চারপাশে গনগনে রৌদ্রোত্তাপ হয়ে আসে, প্রখর উত্তাপে বিশ্বাসী হৃদয়ে নাভিশ্বাস তোলে, তখন যদি হতাশ হয়ে বসে থাকি, অথবা প্রতিকূল পরিবেশের তীব্রতায় ভড়কে যাই, তাহলে উত্তাপ আরও শক্তভাবেই জেঁকে বসবে আমার উপর। কিন্তু আমার চলার গতি যদি আরও গতিময় হয়, আল্লাহর দিকে যদি আরও ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যেতে থাকি, তাহলে স্বস্তি ও প্রশান্তির বাতাস আমাকে ছুঁয়ে যেতে থাকবে, রৌদ্রোত্তাপের ক্লেশ আমাকে থামিয়ে দিতে পারবে না।

রাস্তার দু-ধারে বিলের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে পানির ঢেউ খেলছে। আসলে পানি নয়, মরীচিকা। কাফিরদের কাজকর্মকে আল্লাহ এই মরীচিকার সাথেই তুলনা দিয়েছেন। মরীচিকা আপাতদৃষ্টিতে পানিসদৃশ হলেও কাছাকাছি গেলে বোঝা যায়, এখানে কোনো পানির অস্তিত্বই নেই। ঠিক তেমনি যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তাদের অর্জনগুলো বাহ্যত খুব চমৎকার হলেও আল্লাহর হিসেবের খাতায় তার কোনো স্থান নেই। সে কথাটাই বলা হচ্ছে এই আয়াতে:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

يَجِدْهُ شَيْئًا

"আর যারা কুফরি করে, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার মতো, যাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে; কিন্তু সে যদি তার কাছে যায়, তাহলে দেখবে কিছুই নেই।"[২৫১]

আমরা বাগানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। ছায়াঘেরা বাগানটা যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বাগানের কেয়ারটেকার সালিম চাচা আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। সালাম এবং কুশল বিনিময় হলো। ফিক করে পানের পিক ফেলে বললেন, 'ছোট সায়েব, বড় সায়েব, ইরাম রইদের মইদ্দে আইছেন? কেনো তকলিফ হয় নাই ত?' আমরা দুজনেই হেসে বললাম, 'একদমই না।' ছোট ভাই তো রুদ্ধশ্বাস সাইকেল চালিয়ে হাঁপিয়ে ওঠেছে। আমি সাইকেলটা একটা গাছের সাথে ঠেকিয়ে রেখে বললাম, 'হাতে খুব সময় নেই চাচা, আপনি যদি আমাদেরকে কয়েকটা আম পেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন!' চাচা আমাদেরকে বাগানের মাঝখানে তাঁর ছোট ঘরটাতে নিয়ে এলেন। বললেন, 'আফনারা এইহানে ছায়ার মইদ্দে বইসা থাকেন। আমি আম নিয়া আসতাছি।'

আম নিয়ে একটা মজার গল্প মনে পড়লো। উর্দু সাহিত্যের এক বিখ্যাত কবি ছিলেন মীর্জা গালিব। তিনি আম খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর এক বন্ধু আম মোটেও পছন্দ করতেন না, এবং এ নিয়ে গালিবকে প্রায়ই খ্যাপানোর চেষ্টা করতেন। একদিন দিল্লীর রাজপথে দুজন হাঁটছিলেন। পথিমধ্যে একটা আম দেখা গেলো। বিপরীত দিক থেকে মালবোঝাই একটা গাধা আসছিলো। আমের কাছে আসার পর গাধাটি আম শুঁকে দেখলো। তারপর না খেয়েই আবার চলতে লাগলো। বন্ধুটি গালিবকে বললেন: 'দেখেছো! গাধাও আম খায় না!' গালিব বললেন: 'হ্যাঁ, ঠিকই! শুধু গাধারাই আম খায় না।'

প্রায় আধামাইল রোদে পুড়ে সাইক্লিংয়ের পর এই ছায়াটুকু এত যে প্রশান্তিদায়ক মনে হচ্ছে! ঝিরিঝিরি দখিনা বাতাস একেবারে কলিজা পর্যন্ত ঠান্ডা করে দিচ্ছে। সালিম চাচা আম নিয়ে আসার ফাঁকে ছোট ভাইকে বললাম, এই যে ছায়ার মধ্যে শান্ত-স্থির হয়ে, নিশ্চিন্ত-নিঃশঙ্ক হয়ে দুজন বসে আছি, চূড়ান্ত হিসেবের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় কি আমাদের জায়গা হবে? ছোট ভাই বললো, 'আসলেই চিন্তার বিষয় ভাইয়া! আরশের ছায়ায় যে সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ আদৃত করবেন, তাদের মধ্যে আমরা পড়ি কি না, একটু মিলিয়ে দেখা দরকার।'

আমি রাজি হলাম। দুজনে মিলে নিজেদের অবস্থান একটু যাচাই করে নেবো। সালিম চাচা আম নিয়ে আসতে আসতে আমরা এই গল্পটা সেরে ফেলি। তারপর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নাহয় আম খাওয়ার গল্প বলা যাবে।

তার আগে হাদীসটা এক নজরে দেখে নেওয়া দরকার:

عن أَبي هريرة – رضي الله عنه – ، عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – ، قَالَ : (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبادة الله تعَالَى ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المسَاجِدِ ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا في اللهِ اجتَمَعَا عَلَيْهِ ، وَتفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذاتُ مَنْصِبٍ وجَمالٍ ، فقَالَ : إِنِّي أخافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)[২৫২]

"আবূ হুরায়রাহ ﷺ নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সাত শ্রেণির লোক, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় ছায়া প্রদান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

- ন্যায়পরায়ণ শাসক,
- এমন যুবক, যিনি আল্লাহর 'ইবাদাতের মধ্যে বেড়ে ওঠেন,
- এমন ব্যক্তি, যার হৃদয় মাসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে,
- এমন দুজন ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসেন, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে পরস্পর একত্রিত হন এবং বিচ্ছিন্ন হন,
- এমন ব্যক্তি, যাকে অভিজাত ও সুন্দরী রমণী আহ্বান করে, কিন্তু তিনি বলেন, 'আমি তো আল্লাহকে ভয় করি!',
- এমন ব্যক্তি, যিনি কোনোকিছু দান করেন, সেটাকে অপ্রকাশিত রাখেন, এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কী দান করেছে,
- ঐ ব্যক্তি, যিনি আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করেন, তারপর তার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়।"

মনে মনে ভাবছো, এতক্ষণ এতগুলো হাদীস এলো, কোথাও কোনো বর্ণনাকারীর নাম নেই, এই হাদীস একেবারে বর্ণনাকারীর নামসহ বলছি কীভাবে? আসলে হয়েছে কি, হাদীসটা খুব সুন্দর তো, আমার ভীষণ লোভ জেগেছিলো, এটা মুখস্থ করে ফেলার জন্যে। যেই ভাবা সেই কাজ! ঐ যে রিয়াদুস সালিহীন বইটার কথা বললাম, ওটা পড়তে গিয়ে যখনই চমৎকার হাদীসটা সামনে এলো, এতটাই আলোড়িত হয়েছি যে, বর্ণনাকারীর নামসহ আরবিতেই হাদীসটা মুখস্থ করে নিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসলে পথ চলতে চলতে যখন জীবনগাড়ির চাকায় গতি কমে আসে, তখন মাঝেমধ্যে কিছু জ্বালানি প্রয়োগ করতে হয়। আমার কাছে এই হাদীসটাকে একটা কার্যকরী জ্বালানি বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো, তাই আগপাছ না ভেবে মুখস্থ করে ফেলেছি। এই যে দেখো, এখন ছোট ভাইকে হাদীসটা শোনাতে পারছি। মুখস্থ না থাকলে পারা যেতো? আমার বিশ্বাস, একদিন সময় বের করে তুমিও হাদীসটা আয়ত্ত্ব করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তোমার সদিচ্ছাকে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দিন।

এবার এসো আমাদের আত্মপর্যালোচনা-পর্বে।

প্রথম শ্রেণির মধ্যে আমরা পড়েছি কি না, এই চিন্তা থেকে দুজন মুক্ত আছি। আমাদের কাঁধে শাসনভার নেই, তাই এ ব্যাপারে আপাতত নিশ্চিন্তই থাকা যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে, আল্লাহর 'ইবাদাতে বেড়ে ওঠা যুবক। পারিবারিক মূল্যবোধ ও কঠোর অনুশাসনের মধ্যে থাকায় আমরা 'ইবাদাতে গড়িমসি করার সুযোগ পাইনি। তবে কিছুক্ষণ ভাবার পর দুজনে বুঝলাম, নফল 'ইবাদাতে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। তারুণ্যের ভরা বাদরে যদি সর্বসন্তাপী 'ইবাদাতের জোয়ার সৃষ্টি করতে না পারি, তাহলে কেমন তরুণ হলাম আমরা?

মাসজিদের সাথে ঝুলন্ত হৃদয়—এটা আবার কেমন? এঁরা সেই সমস্ত লোক, যাঁরা এক ওয়াক্ত সালাতের পর আরেক ওয়াক্ত সালাতের জন্যে অপেক্ষা করেন। মাসজিদে গমনের জন্যে এঁরা নিজেকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখেন। 'হাইয়া আলাস সালাহ'র মর্মবিদারী আহ্বানকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে কোনো খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করাতে তাঁদের মন সায় দেয় না। এই পয়েন্টে এসে আমরা নিজেদের নিয়ে খানিকটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। গল্পের শুরুতে তো দেখেছো, মাঝেমধ্যে মাসজিদে গমনের ব্যাপারে আমি গড়িমসি করার চেষ্টা করি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আজকে থেকে কোনো ধরনের পিছুটানকেই আমরা সুযোগ দেবো না। ইন শা-আল্লাহ, মাসজিদের সাথে আমাদের হৃদয়ের সংযোগসড়ক এমনভাবে নির্মাণ করবো, যেন সেই সড়কে কোনো খানাখন্দ তৈরি হবার সুযোগ না থাকে। দুই ভাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওফীক ভিক্ষা করলাম।

আল্লাহর জন্যে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা দিলখোলা হবার চেষ্টা করে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। দীন পালন করতে গিয়ে ছোটখাটো মতভিন্নতা ও মতবৈচিত্র্যকে আমরা বড় করে দেখি না, ঈমানের সাক্ষ্যপ্রদানকারী সবাইকেই বুকে জড়িয়ে নেই, নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসি। আল্লাহ চান তো এই পয়েন্টেও আমরা নিজেদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এরপর যে শ্রেণির কথা বলা হয়েছে, সেরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আমাদের দৃষ্টিকে অবনত করে পথ চলি, আমাদের কথা, আচরণ ও বেশভূষায় আমাদের আকরিত বিশ্বাসের আচরিত রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। ফলে আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় কোনো সম্পর্কে নিজেরা যেমন জড়াইনি, সেই পথের দিকে আহ্বান করার কথাও কেউ চিন্তা করার সুযোগ পায়নি।

নীরবে নিভৃতে উল্লেখযোগ্য হারে দানের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। আমরা এখনো ছাত্র তো, অতিরিক্ত কোনো অর্থ আমাদের হাতে থাকে না। তবে পথচলার বাঁকে বাঁকে যে ছোটখাটো দান-দক্ষিণা আমরা সাহায্যপ্রার্থীর হাতে তুলে দেই, সেটা গোপনীয়তা বজায় রেখেই করার চেষ্টা করি।

শেষ পয়েন্টে এসে ছোট ভাই আমাকে থামিয়ে দিলো।

'ভাইয়া! আল্লাহর স্মরণের বেলায় আমার না একদম কান্না আসতে চায় না! খুব ভয় হচ্ছে নিজেকে নিয়ে।'

আমি অভয় দিলাম।

কয়েকটা দৃশ্য কল্পনা করলাম আমরা।

আচ্ছা, উচ্চ মাধ্যমিকে যখন বাংলা প্রথম পত্রের ক্লাসে স্যার জসীম উদদীনের 'কবর' কবিতা পড়াতে শুরু করেছেন, তখন কি আমরা কাঁদিনি? একে একে স্বজন হারানোর ব্যথায় কাতর বৃদ্ধ দাদু যখন নিজ হাতে সবার কবরে মাটি দিয়ে এসে তাঁর নাতিকে বলছিলেন:

'মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক
আয় আয় দাদু গলাগলি ধরি, কেঁদে যদি হয় সুখ',

তখন আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো এক্ষুনি কলেজের মাঠে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাই আর গগনবিদারী কান্না জুড়ে দিই। বাসায় এসে যখন কবিতাটা আবার পড়লাম, আবারও আমি কেঁদেছি। তুমিও তো কেঁদেছো, মনে আছে? ছোট ভাই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

শুধু তা-ই না, কোনো গল্প পড়তে গিয়ে যখন গল্পের কোনো চরিত্রের অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ অথবা মৃত্যুর আশঙ্কা দেখি, তখন আমাদের চোখ আপনাতেই ভিজে আসে। যখন কোনো বেদনাদায়ক দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়ে চলচ্চিত্র শেষ হয়, তখনও আমাদের চোখ ছলছল করে ওঠে, কখনো কখনো ডুকরে কেঁদে উঠি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি কবিতা-শ্রবণে কাঁদি, চলচ্চিত্র-দর্শনে কাঁদি, আল্লাহর স্মরণে কেন কাঁদি না?

কারণ, আমি যখন কবিতা শুনছি, তখন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ-অনুভূতি সেখানেই একীভূত করে রাখছি। যখনই সেই অনুভূতি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ছে, আমি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছি। বিপরীত দিকে, আল্লাহর কাছে একান্তে হাত তোলার জন্যে সময় তো এমনিতেই আমি পাই না, তাড়াহুড়ো করে যা-ও একটু সময় কালেভদ্রে বের করি, সেখানেও আমার মনোযোগ থাকে বিক্ষিপ্ত, আমার আবেগ-অনুভূতি থাকে নানামুখী স্রোতে লীন।

চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে বেদনাদায়ক পরিণতি আমাকে কাঁদায়। আমার জীবনের শেষ পরিণতির কথা ভেবে কি আমার কাঁদা উচিত নয়?

গল্প পাঠ করতে গিয়ে একটা কাল্পনিক চরিত্র যখন মরে যায়, তখন আমি শোকাভিভূত হই, শোকানলে পুড়ি, শোকাবেগে কাঁদি। আমি যদি গভীরভাবে ভেবে দেখতাম আর বুঝতে পারতাম, আমার একটা অন্তর আছে, সেই অন্তরটা মরে গেছে, অথবা মৃতপ্রায় হয়ে গেছে, তাহলে এই বাস্তবিক মৃত্যু আমাকে দ্বিগুণ শোকাহত করতো, আমার চোখে অশ্রুর ফোয়ারা বইয়ে দিতো।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ছোট ভাইয়ের চোখ অশ্রুতে চিকচিক করতে শুরু করেছে। ডান চোখের কোণায় টলটল করতে থাকা একটা অশ্রুফোঁটা টপ করে পড়ে গেলো গণ্ডদেশ বেয়ে। আমি তার অশ্রুটা মুছে দিলাম না। আরও অশ্রু আসুক। এই চোখে অশ্রুর ঢল নামুক। আল্লাহর স্মরণে বিগলিত অশ্রুর শ্রাবণ হৃদয়ে বিশুদ্ধতার প্লাবন আনুক।

এই হাদীসটা সামনে রেখে তুমিও নিজের সাথে একটু মিলিয়ে দেখো। দেখবে, কিছু পয়েন্টে তুমি আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। তার জন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। হতে পারে, কিছু পয়েন্টে তুমি পিছিয়ে থাকবে। তার জন্যে আল্লাহর কাছে হাত তোলো।

এই কাজটা করা কেন দরকার, জানো?

আত্মপর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনা যেকোনো সাফল্যপ্রত্যাশী মানুষকেই অপরিহার্য অনুষঙ্গ করে নিতে হয়। আমরা যেহেতু আখিরাতের জীবনে সফলদের কাতারে থাকতে চাই, আমাদেরও একটু নিজেকে নিজে যাচাই করা প্রয়োজন। ধরো, কোনো অফিসে বার্ষিক অডিট চেক করার জন্যে আগামী সপ্তাহে উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তা আসবেন। এই অফিসের কর্তব্যরত ব্যক্তিরা যদি বুদ্ধিমান হয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাকেন, তাহলে অডিটের দিন ঘনিয়ে আসার আগেই নিজেরা নিজেদের যাবতীয় হিসেব-নিকেশ গুছিয়ে রাখবেন। যদি বোকা হন, অথবা অলস প্রকৃতির হন, তাহলে অডিটের দিন নিশ্চিতভাবেই বিব্রতকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে তাকে। এজন্যেই 'উমার ﵁ বলতেন:

حاسبوا قبل أن تحاسبوا

হিসেবের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেরা নিজেদের হিসেব করে ফেলো।[২৫৩]

সালিম চাচা একঝুড়ি আম নিয়ে এলেন। কুঁড়েঘর থেকে চাকু নিয়ে এসে আমাদের সাথে গল্প করতে করতে আমগুলো কাটলেন। আমরা তৃপ্তিভরে খেলাম। ছোট ভাই কয়েকটা আমের আঁটি একটা থলেতে নিয়ে নিলো। এই আঁটিগুলো শুকিয়ে সে ভেঁপু বানাবে। বিচিত্র সব শখ তার!

দু-ভাই আবার সাইকেলে উঠে বসলাম। এবার চালাচ্ছি আমি, আর ও আছে পেছনে। আসরের সময় ঘনিয়ে আসছে। সূর্যের তেজ অনেকটাই কমে আসতে শুরু করেছে। রোদের তাপ ম্রিয়মাণ হয়ে আসছে। আমি মধ্যম গতিতে সাইকেল চালাচ্ছি। বাড়ির গেইটে ঢুকতেই আব্বা বললেন, 'কিছুই না বলে কই চলে গিয়েছিস তোরা? আমরা পেরেশানে অস্থির!' ছোট ভাইয়ের হাতে আমের আঁটি দেখে আব্বা বুঝলেন কোথায় গিয়েছি। একটা মুচকি হাসি তাঁর মুখে পাপড়ি মেলে দিলো। বাড়িতে ঢোকার পর আম্মাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আব্বা-আম্মা দুজন আনন্দিত, আমরাও তাঁদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে যারপরনাই প্রীত। খুব ইচ্ছে হয়, জান্নাতেও সবাই এরকম আনন্দমুখর পরিবেশে একত্রিত হতে। আল্লাহর কিছু বান্দা এই স্বপ্নকে ঠিকই বাস্তবায়ন করবে। যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, যাদের হিসেব সহজেই সমাধা হয়ে যাবে, তারা পরিবারের কাছে ফিরে আসবে হাস্যোজ্জ্বল বদনে। কুরআনের সাক্ষ্য:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا . وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا.[২৫৪]

"সুতরাং যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে খুব সহজ হিসেবের মুখোমুখি হবে। অতঃপর সে তার পরিবারের[২৫৫] কাছে ফিরে আসবে আনন্দোদ্বেল হয়ে।"

এই যে স্বপ্নটা দেখছি, এই স্বপ্নের চূড়া স্পর্শ করার জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার, সেই প্রস্তুতির অনুকূল পরিবেশ আমার পরিবারে আছে তো? কোথাও কোনো ঘাটতি নেই তো? থাকলে সেটা পূরণের জন্যে আমার চেষ্টায় কোনো কমতি কি আছে? স্বপ্ন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেখার সময় এই প্রশ্নগুলোও আমরা নিজেদের করবো।

চলো, স্বপ্নদোলায় দুলতে থাকি ছান্দসিক ঐকতানে:

বুকের খাতায় খুব যতনে
একটা স্বপন আঁকি
ফিরদাউসের ফুল বাগানে
আমরা হবো পাখি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

টীকা

১৬৬. চৈতালি (নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড), পৃ. ৬৬০
১৬৭. বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৯
১৬৮. আত-তারীখ আল-কাবীর লিলবুখারী: ১০৪৬; সাহীহ ইবন খুযাইমাহ: ১২৯২
১৬৯. সাহীহুল বুখারী: ২৪৬৬; সহীহ মুসলিম: ৫৯৯৬
১৭০. শু'আবুল ঈমান: ৩৩৭৮
১৭১. সূরা আল-ইনসান, ৭৬ : ৯
১৭২. মাজমূ' আল-ফাতাওয়া, খ. ১ পৃ. ১৮৩
১৭৩. সহীহ মুসলিম: ১৮৯৩; সুনান আবূ দাউদ: ৫১৩১
১৭৪. সহীহ বুখারীর পরিচ্ছেদের শিরোনাম: باب لا تسبوا الدهر (পরিচ্ছেদ: যুগকে গালমন্দ কোর না); সহীহ মুসলিমে পরিচ্ছেদের শিরোনাম: باب النهي عن سب الدهر (সময়কে গালমন্দ করা থেকে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ)।
১৭৫. সহীহ মুসলিম: ৭৬৯২
১৭৬. সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৭
১৭৭. সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৬
১৭৮. সূরা মারয়াম, ১৯ : ৪
১৭৯. সবুজ নায়ের মাঝি, পৃ. ১৫
১৮০. কাজী নজরুল ইসলাম, ভাঙার গান, পৃ. ১০
১৮১. মুসনাদ আহমাদ: ১৪০৬৯
১৮২. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১৮
১৮৩. সাহীহুল বুখারী: ৯; সহীহ মুসলিম: ১৭১
১৮৪. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩৬
১৮৫. সাহীহুল বুখারী: ৬০১৪
১৮৬. সাহীহুল বুখারী: ২৪২৭; সহীহ মুসলিম: ২৪২৬
১৮৭. আল-আদাব আল-মুফরাদ: ৫৯৪
১৮৮. সহীহ মুসলিম: ২৬২৫
১৮৯. সাহীহুল বুখারী: ৫৭৮২; সহীহ মুসলিম: ৭৬৯০
১৯০. ইবন 'আব্বাস ﷺ-এর বর্ণনা: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জমজমের পানি পান করালাম, তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেছেন।" [সাহীহুল বুখারী: ১৬৩৭]
১৯১. সাহীহুল বুখারী: ১২৯১; সহীহ মুসলিম: ০৪
১৯২. আল-ঈদ্বাহ ফী 'উলূমিল বালাগাহ, খ. ১ পৃ. ৩৪ (পঙ্‌ক্তিটি কবি আব্বাস ইবন আহনাফ-এর)
১৯৩. সুনান আত-তিরমিযী: ১২১০
১৯৪. তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩ পৃ. ৩৫৮
১৯৫. তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩ পৃ. ৩৬০
১৯৬. সুনান আত-তিরমিযী: ১২০৯।
১৯৭. সাহীহুল বুখারী: ৬১; সহীহ মুসলিম: ৭২৭৬
১৯৮. মিফতাহু দারিস-সা'আদাহ, খ. ১ পৃ. ২৩২
১৯৯. শারহু মুসলিম লি-আন-নাওয়াওঈ, খ. ১৭ পৃ. ১৫৪
২০০. শারহু মুসলিম লি-আস-সুয়ূতী, খ. ৬ পৃ. ১৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২০১. সূরা আল-মুমিনূন, ২৩ : ৯৬
২০২. সহীহ মুসলিম: ৬৭৫১
২০৩. এটি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ গল্প। এখানে 'বন্ধু' বলতে লেখকের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী আব্দুল্লাহ বিন আকিল-কে বোঝানো হয়েছে। উর্দু ও ফার্সিতে তার রয়েছে ঈর্ষণীয় দখল। বারাকাল্লাহু ফীহি।
২০৪. গানের মালা (নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃ. ২০৩
২০৫. সূরা আর-রাহমান, ৫৫ : ৬৮
২০৬. সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ, ৫৬ : ২৭–৩২
২০৭. সূরা আল-মুরসালাত, ৭৭ : ৪১
২০৮. সূরা আদ-দুখান, ৪৪ : ৫৫
২০৯. সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ১৯–২৩
২১০. সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৮১
২১১. হিজরী মাসের যে কোনো তিনদিন (নফল) সাওম পালন করা সুন্নাহ। তবে উত্তম হচ্ছে, 'আইয়াম বীদ্ব' তথা হিজরী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সাওম পালন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ যার (র)-কে বলেছেন:

إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثالث عشرة، ورابع عشرة، وخامس عشرة

"যখন তুমি মাসের তিনদিন সাওম পালন করবে, তখন ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ (তারিখে) সাওম পালন করবে।" [তিরমিযী, খ. ৩ পৃ. ১৩৪। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ]

প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালনের বিনিময় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر

"প্রতি মাসে তিনদিন সাওমের সাওয়াব সারা বছর সাওম পালনের সাওয়াবের সমান" [নাসায়ী, খ. ২. পৃ. ৪১৪। সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ১১ পৃ. ৪০৩। মুসনাদ আহমাদ, খ. ৩৩ পৃ. ৪৭৩]

২১২
সুনান আন-নাসাঈ: ২২৫২
২১৩. ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন, খ. ১ পৃ. ২৩৬
২১৪. «Summer afternoon — summer afternoon; to me those have always been the two most beautiful words in the English language.» [A Backward Glance (1934), ch. 10.]
২১৫. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৫
২১৬. সূরা আল-মা'আরিজ, ৭০:১০
২১৭. সূরা আল-হাজ্ব, ২২ : ১৯, ২০
২১৮. ইবন কাসীর (র)-এর বক্তব্য: أما الحميم فهو: الحار الذي قد انتهى حره وأما الغساق فهو: ضده، وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم
দ্রষ্টব্য: তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ৭ পৃ. ৭৮
রঈসুল মুফাসসিরীন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ﷺ ও মুজাহিদ ﷺ-এর মত এটাই। দ্রষ্টব্য: তাফসীর আত-তাবারী, খ. ২১ পৃ. ২২৭; তাফসীর আল-বাগাওয়ী, খ. ৭ পৃ. ৯৯
২১৯. ক্বাতাদাহর অভিমত ও মুজাহিদ (র) এর একটি বর্ণনা এই মত-কে সমর্থন করে। দ্রষ্টব্য: তাফসীর আত-তাবারী, খ. ২১ পৃ. ২২৭
২২০. সূরা ইবরাহীম ১৪ : ১৬
২২১. তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ৪ পৃ. ৪৮৫
২২২. এই ধরণের পানীয়কে বোঝাতে কুরআনে আরেকটি শব্দ এসেছে: غِسْلِينٍ [সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:৩৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'গিসলীন' ও 'সাদীদ' একই অর্থবোধক।
২২৩. তাফসীর আল-কুরতুবী, খ. ৯ পৃ. ৩৫১; তাফসীর আল-বাগাওয়ী, খ. ৪ পৃ. ৩৪১
২২৪. আদ-দুর আল-মানসূর লিসসুয়ূতী খ. ৭ পৃ. ৩৬৭; যাদুল মাসীর, খ. ৪ পৃ. ৩৫২
২২৫. সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১৭
২২৬. তাফসীর আশ-শাওকানী, খ. ৩ পৃ. ৩৩৭; আত-তাফসীর আল-মুনীর, খ. ১৫ পৃ. ২৩৯
২২৭. তাফসীর আশ-শাওকানী, খ. ৩ পৃ. ৩৩৭
২২৮. সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ২৯
২২৯. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৫
২৩০. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৯০
২৩১. সূরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ৪৫-৪৭
২৩২. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৫
২৩৩. সূরা আল-মুরসালাত, ৭৭ : ৪১
২৩৪. সূরা আল-ইনসান, ৭৬:৫
২৩৫. সূরা আল-ইনসান, ৭৬:১৮
২৩৬. সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩:২৭
২৩৭. কোনো কোনো তাফসীরকার 'কাফূর'কে আলাদা ঝরনা হিসেবে উল্লেখ করেন না। তাঁদের মতে كافور শব্দটি صفة للشراب । [তাফসীর আত-তাবারী, খ. ২৪ পৃ. ৯৩]
২৩৮. তাফসীর আত-তাবারী, খ. ২৪ পৃ. ৯৩
২৩৯. তাফসীর আত-তাবারী, খ. ২৪ পৃ. ১০৮
২৪০. তাফসীর রূহুল মা'আনী, খ. ২২ পৃ. ১৭
২৪১. প্রাগুক্ত
২৪২. মুসনাদ আহমাদ: ২৫০৩২
২৪৩. সাফওয়াতুত তাফাসীর, খ. ৩ পৃ. ৫০৬
২৪৪. তাফসীর আত-তাবারী, খ. ২৪ পৃ. ২২৩; তাফসীর আল-কুরতুবী খ. ১৯ পৃ. ২৬৬
২৪৫. তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ৮ পৃ. ৩৪৯
২৪৬. সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩ : ২৮
২৪৭. সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩ : ২৬
২৪৮. সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ, ৫৬ : ১০, ১১
২৪৯. তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ৭ পৃ. ৫১৪
২৫০. Einstein: His Life and Universe, p. 367
২৫১. সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৯
২৫২. সাহীহুল বুখারী: ১৪২৩; সহীহ মুসলিম: ২৪২৭
২৫৩. উসুদুল গাবাহ, খ. ১ পৃ. ৮২৮
২৫৪. সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব, ৮৪ : ৭-৯
২৫৫. এখানে 'পরিবার' (أهل) বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে একাধিক মত আছে:
নিজের পরিবার-পরিজন ও স্বজনদের মধ্যে যারা জান্নাতে যাবে।
[তাফসীর আল-বায়দ্বাওয়ী (খ. ৫ পৃ. ২৯৭); তাফসীর আদ্বওয়াউল বায়ান (খ. ৮ পৃ. ৪৭০); তাফসীর ইবন 'আশূর (খ. ৩০ পৃ. ২২৩)]
আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে: জান্নাতে থাকা সকল মুমিন-ই তার পরিবার।
[তাফসীর রূহুল মা'আনী (খ. ২২ পৃ. ২৯৮)]
আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে: জান্নাতে হূরসহ বিভিন্ন নি'মাত, যা তার জন্যে নির্দিষ্ট করা হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

[তাফসীর আদ্বওয়াউল বায়ান (খ. ৮ পৃ. ৪৭০); তাফসীর আল-বায়দ্বাওয়ী (খ. ৫ পৃ. ২৯৭)]
ইবন 'আশূর কুরআনের অন্য একটি স্পষ্টবোধক আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, প্রথমোক্ত মতটি জোরালো। আয়াতটি এই:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

"এগুলো বসবাস-উপযোগী বাগিচা। এখানে তারা প্রবেশ করবে, এবং প্রবেশ করবে তাদের পিতৃবর্গ, স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা (জান্নাতে প্রবেশের) উপযুক্ত হয়েছে। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরোজা দিয়ে।" [সূরা আর-রা'দ, ১৩ : ২৩]

২৫৬. "..কভু কেয়া কাঁটায়, কভু বাব্‌লা-আঠায়
বারে বারে ভোমরার পাখা জড়ায়.."

দ্রষ্টব্য: বনের বেদে (নজরুল রচনাবলী ৭ম খণ্ড), পৃ. ৩২৫

২৫৭. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

পাতাঝরা মওসুম বিদায় নিয়েছে। গাছের শাখায় শাখায় নতুন পত্রপল্লবে সাজ সাজ রব। নামজানা ও অজানা নানা রকম ফুলের সুবাস চারদিক থেকে আসছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছ এখন আগুনরাঙা। অস্তগামী সূর্যের মতো মেরুন আভা ছড়িয়ে যাচ্ছে পলাশের ডাল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা শিমুল গাছের মিলিত শাখাগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, সাদা ভাতের সাথে লালশাক মাখামাখি করে রেখেছে কেউ। প্রকৃতির সবটুকু এমনকি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের সবগুলো ফলও কোকিলের করায়ত্ত। উত্তুরে বাতাসের দিন ফুরিয়ে এলো। দক্ষিণা বাতাসের এলোমেলো পথচলা আর মাতাল প্রবাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে:

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে..."

ভ্রমরের গুঞ্জন পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়েছে। বাবলা গাছের আঠায় ভ্রমরের পাখা আটকে যাওয়া তো গ্রামীণ দুরন্ত শৈশবের চিরচেনা দৃশ্য। নজরুলের লেখাতেও এই দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।[২৫৬] মাধবীলতার ফুলগুলো ভ্রমরের দখলে চলে গেছে ইতোমধ্যেই। মাধুরীলতায়ও ফুল ফুটেছে। সুবাস ছড়ানোর জন্যে কে এগিয়ে থাকবে, এ লক্ষ্যে মাধবীলতা ও মাধুরীলতায় যেন অঘোষিত একটা প্রতিযোগিতা চলছে। মৌমাছির গুঞ্জরণও কোনোদিক থেকে থেমে নেই। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে রেণু সংগ্রহ করার জন্যে। এক ফোঁটা মধু উৎপন্ন করার জন্যে শত শত ফুলের কাছে তাকে যেতে হয়। আর আমি কোনো কাজে নামলে দুয়েক কদম হেঁটেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে চাই। দুয়েকটা দায়সারা আনুষ্ঠানিক ইবাদাত সেরেই আমি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে চাই। দুয়েক পাতা পড়াশোনা করে আমি জ্ঞানী হবার স্বপ্ন দেখি। দা'ওয়াহর নিয়তে কাউকে দুয়েকটা কথা বলেই ধরে নেই, আমি সফল দা'য়ী; তারপর কোনো কারণে মনোরথ হলে আমি হতাশ হয়ে পড়ি। শতাধিক ফুলের রেণু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আহরণ করার পর এক ফোঁটা মধু উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে—এ কথাটা জীবনের সবক্ষেত্রে স্মরণ রাখলে নিজেকে নিয়ে অনর্থক আত্মতৃপ্তি আর সৃষ্টি হয় না।

এই যে ভ্রমরগুলো, এরা বিষ নিয়ে আসে কিন্তু ফুল থেকেই। আবার মৌমাছিগুলো যে মধু আহরণ করছে, সেটাও কিন্তু ফুল থেকেই। একই ফুল থেকে কেউ পাচ্ছে বিষ, কেউ পাচ্ছে মধু। অদ্ভুত ব্যাপার না? এই বিষয়টার সাথে কুরআনের একটা বক্তব্যের মিল আছে। কুরআন কারও হিদায়াতপ্রাপ্তির মাধ্যম, আবার কারও জন্যে বিপথগামিতার উপলক্ষ্য।

আল্লাহ বলছেন:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

"এর দ্বারা কেউ পথভ্রষ্ট হয়, আবার এর দ্বারা কেউ পথের দিশা পায়।"[২৫৭]

প্রশ্ন জাগতে পারে, যে জিনিসের মাধ্যমে কেউ পথের দিশা পাচ্ছে, সেই একই জিনিসের মাধ্যমে কেউ পথভ্রষ্ট হচ্ছে, এটা কেমন কথা? এই প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আলূসী তাঁর তাফসীরে একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যা অনুধাবন করতে পারলেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁর উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটি হচ্ছে:

كماء صار في الأصداف درا * وفي ثغر الأفاعي صار سما

"এটার উদাহরণ সেই জলবিন্দুর মতোই, যা ঝিনুকে প্রবেশ করলে মুক্তা হয়ে যায়, আর সাপের দাঁত স্পর্শ করলে তা হয়ে যায় বিষ।"[২৫৮]

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা যখন ঝিনুকে প্রবেশ করে, তখন ঝিনুকের ভেতরে মুক্তার জন্ম হয়। আবার বিষধর সাপের বিষদাঁতে বিষ সৃষ্টি হয় এই বৃষ্টিফোঁটা থেকেই! সুতরাং, ভূমিকাটি বৃষ্টিফোঁটার নয়, বরং বৃষ্টিফোঁটা গ্রহণকারীর। যারা কুরআনের অমূল্য রতন ধারণ করার জন্যে চাতকের মতো অপেক্ষমাণ, কুরআন তাদের জন্যে মুক্তা হয়েই আত্মপ্রকাশ করবে। আর যারা অসুস্থ হৃদয় নিয়ে নিজেদের বক্রতা পরিপুষ্ট করার লক্ষ্যে কুরআন খুলে বসে, তাদের বিষাক্ত অন্তরে বিষ বেড়ে যাওয়া ছাড়া এই পাঠে তেমন কোনো উপকার আসবে না।

এই কথাটা কুরআন অন্যভাবে বলেছে আরেক আয়াতে:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্যে আরোগ্য ও অনুগ্রহ। অন্যদিকে তা সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষতিই শুধু বৃদ্ধি করে।"[২৫৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ আয়াতও একই কথাই আমাদেরকে জানাচ্ছে। বিশ্বাসী অন্তরে কুরআন প্রতিষেধকের কাজ করবে। অবিশ্বাসী অন্তর কুরআনের কোনো আবেদন অনুভব করতে না পেরে উলটো ক্ষতিগ্রস্তই হতে থাকবে। যেভাবে ঝিনুকের পেটে এসে বৃষ্টিকণা মুক্তা হয়, সেভাবে মুমিনরাও কুরআনকে মুক্তার মত জাজ্বল্যমান পরশপাথর হিসেবে গ্রহণ করে। যেভাবে সাপ তার মুখে বৃষ্টিকণাকে বিষ করে নেয়, সেভাবেই পাপাচারীরা কুরআনের প্রত্যাদেশে অন্তর্জ্বালা বাড়ানো ছাড়া আর কিছু পায় না। একই উদাহরণ আমরা ভ্রমর ও মৌমাছি থেকে নিতে পারি। ফুল থেকে যে রস ভ্রমরের মুখে প্রবেশ করে, সেটা বিষ হয়ে যায়। একই রস যখন মৌমাছির মুখে যায়, সেটা মধু হয়ে বেরিয়ে যায়।

সুতরাং, কুরআনের শাশ্বত সৌন্দর্যকে ধারণ করার জন্যে নিজেকে আগে উপযুক্ত করতে হবে, নিজের অন্তরকে কুরআন প্রবেশের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। যদি অন্তরকে ঝিনুকের মতো মুক্তাপ্রত্যাশী করে রাখতে পারি, তাহলে কুরআনের বৃষ্টিকণা আমার জন্যে অমূল্য রতন বয়ে আনবে। যদি অন্তরকে মৌমাছির মত পবিত্রতানুসন্ধানী করতে পারি, তাহলে কুরআনের ফুল থেকে আমি মধু আহরণ করতে পারবো। আর যদি সাপের মতো বিষধর বা ভ্রমরের মতো বিষময় থাকতেই চাই, তাহলে কুরআন থেকে কোনো উপকার আমি নিতে পারবো না, আমার বিষময়তা বেড়েই চলবে। এই বিষময়তায় কোনো বিস্ময় নেই।

বিষময়তায় বিস্ময় না থাকলেও মৌমাছিদের কিছু বিষয় সত্যিই বিস্ময়কর। নিয়মতান্ত্রিকতা আর অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাদের কঠোরতা তো সর্বজনবিদিত। এমনকি আল্লাহর হুকুম পালনেও তারা খুবই স্থিতপ্রতিজ্ঞ।

আল্লাহ বলছেন:

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ . ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا.

"আপনার রব মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন: তোমরা ঘর বানাও পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষেরা যা নির্মাণ করে তাতে। তারপর সব রকম ফল থেকে আহার কর এবং তোমাদের প্রভুর সুগম পথসমূহে চলাচল করো।"[২৬০]

খেয়াল করলে একটা জিনিস ধরা পড়ে, মৌমাছির বানানো মৌচাকের অধিকাংশই পাওয়া যায় পাহাড়ে। সংখ্যার বিচারে আরেকটু কম থাকে গাছে। মানুষের বাড়িঘরে মৌচাকের সংখ্যা তো একেবারেই কম। পাহাড়, গাছ ও বাড়িঘর— আল্লাহর আদেশের এই তিন 'সিকুয়েন্স'ই কি তারা রক্ষা করছে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও মজার বিষয় হচ্ছে, মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করার আগে কখনো মধু উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করে না। জুতসই স্থানে বাসা তৈরি করে ফেলার পর ফুলে-ফলে মধু আহরণ করতে শুরু করে। আয়াতে প্রথমে মৌচাক নির্মাণের আদেশ এসেছে, তারপর এসেছে ফল থেকে আহার করার আদেশ। আল্লাহর দুটো আদেশের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলো!

আমরা ওদের তুলনায় আকৃতিতে কত বড়! আমাদের পৃথিবী ওদের তুলনায় কত প্রসারিত! কিন্তু আল্লাহর আদেশকে সবকিছুর ওপরে স্থান দেয়ার মতো বড়ো হৃদয় আমরা অনেকেই ধারণ করতে পারিনি, যেটা ছোট ছোট মৌমাছি পেরেছে। আল্লাহর আদেশ পালন করতে গিয়ে আমি কখনো নিজের খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিই, কখনো নিজের সীমাবদ্ধ বোধশক্তির ওপর আস্থা রেখে সেই তুলাদণ্ডে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মাপজোক করার ধৃষ্টতাও দেখাই। আমার বড়ত্বের দাবি তো এটাই যে, এই ছোট প্রাণীটার চেয়েও আমার হৃদয় বড় হবে আল্লাহর বিধান মান্য করার ক্ষেত্রে। আল্লাহর আদেশ গ্রহণ ও নিষেধ বর্জনের ক্ষেত্রে।

ছোট এই প্রাণীটা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করার বিষয় আরও আছে।

নবিজি ﷺ বলেছেন:

مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبًا ولا تضع إلا طيباً

"একজন মুমিনের উদাহরণ মৌমাছির মতোই। সে ভালো কিছুই খায়, ভালো কিছুই উৎপন্ন করে।"[২৬১]

আল্লাহ তার জন্যে যা বৈধ করেছেন, মৌমাছি তা-ই খায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ যেহেতু মুমিনকে সেই মৌমাছির সাথে তুলনা দিয়েছেন, বুঝতে পারলাম, একজন মুমিনের জন্যে বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ার চিন্তাই করা যাবে না। আবার মৌমাছি যা উৎপন্ন করে, সেই মধুও কিন্তু পবিত্র ও ভীষণ উপকারী। মুমিনের চরিত্রটাও এমন হবে, তার মুখনিঃসৃত কথা, তার হাত দ্বারা সংঘটিত কাজ সবকিছুই হবে অন্যের জন্যে উপাদেয় ও উপকারী।

মৌমাছির সাথে মুমিনের উপমা প্রসঙ্গে ইবনুল আসীর-এর চোখে উভয়ের মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ধড়া পড়েছে। তিনি বলছেন, মৌমাছির কাজকর্মে কয়েকটা জিনিস ব্যাঘাত ঘটায়: অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্নতা, ঝড়োহাওয়া, ধোঁয়া ও আগুন। একইভাবে, একজন মুমিনের ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক পরিস্থিতি হচ্ছে: আলসেমির অন্ধকার, সংশয়ের মেঘ, ফিতনাহর ঝড়োহাওয়া, হারামের ধোঁয়া এবং প্রবৃত্তির আগুন।[২৬২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই সমীকরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইবনুল আসীর

- আলসেমিকে তুলনা দিয়েছেন অন্ধকারের সাথে
- সন্দেহ-সংশয়কে তুলনা করেছেন মেঘের সাথে
- ফিতনাহকে দেখেছেন ঝড়োহাওয়ার মতো
- হারাম বিষয়াদির সাথে তুলনা দিয়েছেন ধোঁয়ার
- প্রবৃত্তির অনুসরণকে বলেছেন আগুনে পোড়ার মতো ভয়াবহ।

মৌমাছির সাথে মিলিয়ে মুমিনের জন্যে এই পাঁচ অবস্থার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা কতটুকু বাস্তবসম্মত, আমরা এবার পর্যালোচনা করবো।

অন্ধকার বেড়ে গেলে মৌমাছি মধু আহরণে বের হয় না। ঠিক তেমনি একজন মুমিনকে যখন প্রচণ্ড অলসতা পেয়ে বসে, তখন সে-ও সালাতের জন্যে বের হয় না। অলসতার অন্ধকার মানেই উদ্যমতার বন্ধ দ্বার।

আকাশ যখন ঘন মেঘে ছেয়ে যায়, মৌমাছি সেসময় ফুলে-ফলে ঘুরে বেড়ায় না। সংশয় জিনিসটাও ঘনঘোর মেঘ হয়ে আমাদের হৃদয়ে আসে, ঈমানের পুষ্পিত কানন আমাদেরকে তখন আর টানে না।

খুব জোরে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময়টুকুও মৌমাছিদের অনুকূলে থাকে না, মৌচাকের বাইরে বেরোলেই বিপদ। চারপাশে যখন ফিতনাহ ছড়িয়ে যায়, ঈমান বাঁচানো যখন খুব কঠিন হয়ে পড়ে, তখন একজন মুমিনকেও সেরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। ঘর থেকে বের হলেই চারপাশে অসংখ্য জাহিলিয়াত ও ফিতনাহর হাতছানি। তাই ঝড়োহাওয়া মৌমাছির জন্যে যতটা বিপজ্জনক, আমাদের জন্যে ফিতনাহ ঠিক ততটাই।

ধোঁয়ার কাছেও মৌমাছি বরাবরই অসহায়। গ্রামে কখনো মৌচাক ভাঙার প্রক্রিয়া দেখে থাকলে এটা অজানা থাকার কথা নয় যে, যারা মৌচাকটি ভেঙে নিয়ে আসতে যান, তারা লাঠি বা অন্য কিছুর আগায় খড় ইত্যাদিতে আগুন ধরিয়ে নেন। সেই আগুনের ধোঁয়া ধীরে ধীরে মৌচাকের কাছে নেয়া হয়। মৌমাছিরা সেই আগুনের ধোঁয়ায় মৌচাকে থাকতে পারে না, অথবা হুল ফোটানোর শক্তিও হারিয়ে ফেলে। হারাম বস্তু ও বিষয়গুলোর ভূমিকাও এমনই। ধোঁয়া যেমন মৌমাছিকে মৌচাক থেকে সরিয়ে দেয়, হারামে লিপ্ত হওয়ার পর আমরাও নিজেদের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হই, লক্ষ্যপথ হারিয়ে ফেলি। মৌমাছি যেমন ধোঁয়ায় তার শক্তি হারিয়ে ফেলে, আমরাও হারাম বিষয়াদিতে ডুবে থাকার মাধ্যমে আত্মিক দৃঢ়তাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধীরে ধীরে হারাতে শুরু করি।

আগুনের কথা আলাদাভাবে না বললেও চলে। শুধু মৌমাছি কেন, সব প্রাণী বা বস্তুর জন্যেই আগুন ভয়ানক। যেকোনো কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করার ক্ষমতা আল্লাহ আগুনকে দিয়েছেন। প্রবৃত্তির অনুসরণও আমাদেরকে তিলে তিলে দগ্ধ করে শেষ করে, সঞ্চিত আমালগুলোকে জ্বালিয়ে ছারখার করে, সর্বোপরি জীবনটা হয়ে যায় দহনোত্তর ছাইয়ের মতো নিঃসার, নির্জীব ও অপাঙ্‌ক্তেয়।

তাহলে, রাসূলুল্লাহর হাদীস, হাদীসের ব্যাখ্যা ও তৎপরবর্তী পর্যালোচনা থেকে আমরা যা বুঝলাম, সেটাকে খুব সংক্ষেপে যদি আরেকটু গুছিয়ে বলি:

- আমরা যা কিছু খাবো বা উপার্জন করবো, তার সবকিছুই বৈধ ও পবিত্র হতে হবে।
- আমাদের কথা হবে মৌমাছির মধুর মতো সুমিষ্ট, আমাদের কাজ ও আচরণ হবে মৌচাকের মধুর মতো উপাদেয় এবং উপকারী।
- অলসতারূপী অন্ধকারকে আমাদের জীবনে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।
- সংশয়ের মেঘ আকাশে তার অস্তিত্বের জানান দিতে শুরু করলেই তড়িৎ গতিতে তাকে নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে, ঘনীভূত হয়ে যাবার আগেই।
- ফিতনাহর প্রসারের সময় নিজের ঈমান-আমাল বাঁচিয়ে রাখতে হবে, যেভাবে ঝড়োহাওয়া থেকে মৌমাছি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- প্রবৃত্তি ও শাইত্বানের কুমন্ত্রণা দৃঢ়তার সাথে এড়িয়ে আল্লাহর কাছে সমর্পিত হবার মনোবল গড়ে তুলবো, যদি দগ্ধীভূত হবার যন্ত্রণা ও পরিতাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। সামনে আগুন দেখলেই যেমন আমি থমকে দাঁড়াই, প্রবৃত্তি কোনো মন্দ প্ররোচনা দিলে সেভাবেই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হবে। আগুন থেকে বাঁচার জন্যে আমার যেমন উৎকণ্ঠার শেষ থাকে না, প্রবৃত্তির দহন থেকে বাঁচার জন্যেও আমাকে অত্যধিক তৎপর ও বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস অর্জনের সাধনা করে যেতে হবে।

চলো তাহলে মৌমাছি হয়ে যাই!

Let's be a bee!

আচ্ছা, শুধু কি মৌমাছিকে নিয়েই গল্প করলে হবে? বসন্তের রূপ-মাধুরীর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও কত অনুষঙ্গ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে! তাদের নিয়েও তো গল্প করা চাই, নাকি?

কোকিল দিয়েই শুরু করা যাক। বসন্ত মানেই কোকিল, কোকিল মানেই বসন্ত। বসন্ত এলে তাদের ডাক শোনা যায়, বসন্ত চলে গেলে এই পাখিকে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। সম্ভবত এজন্যেই সাময়িক বন্ধুত্বের প্রতিপ্রবচন হিসেবে 'বসন্তের কোকিল' বেশ খ্যাতি পেয়েছে। তাছাড়া সুবিধাবাদী পাখি হিসেবে এটার আরও এক বৈশিষ্ট্য সর্বজনবিদিত। আর তা হচ্ছে, বাচ্চা উৎপাদনের নিমিত্ত নিজের ডিম কাকের বাসায় রেখে আসা। কোকিলের চেয়েও মিষ্টি গলায় গান গাওয়া পাখি প্রকৃতিতে আছে, কিন্তু বসন্ত এলে কোকিলের সুরের কাছে সবাই নতজানু হয়ে থাকে। এসময় অন্য কোনো পাখির গান বা সুর তেমন আকর্ষণ করে না। খুব চিকন কণ্ঠে কুহু কুহু করে ডাকে কোকিল। এ কারণেই মিহি সুরে গান গাইতে পারঙ্গম যে কাউকে 'কোকিলকণ্ঠ' বা 'কোকিলকণ্ঠী' নামে অভিহিত করা হয়। শীতের সময় কোকিল এ দেশে একদম থাকে না। শীত সহ্য করা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব হয় না। এ সময় অন্য কোনো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সে অতিথি পাখি হয়। আমাদের জীবনে শীতের রুক্ষতা আছে, কোকিলের তা নেই। এ বিষয়টা খেয়াল করে স্কটিশ কবি জন লোগ্যানের মনে খুব দুঃখ এসেছে। কোকিলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন:

"Sweet bird! thy bower is ever green,
Thy sky is ever clear;
Thou hast no sorrow in thy song,
No winter in thy year." [২৬৩]

আমরা এটাকে কাব্যানুবাদ করতে পারি কি না দেখি:

"মিষ্টি পাখি, চিরসবুজ থাকে তোমার নীড়
তোমার আকাশ স্বচ্ছ থাকে, মেঘ করে না ভিড়
তোমার গানে বিষণ্নতার সুর থাকে না যুক্ত
তোমার জীবন শীতের কবল হতে থাকে মুক্ত।"

কথা সত্য। সবুজতার সাথেই কোকিলের আজীবন বন্ধুতা। কোকিলের নির্ভার কণ্ঠে গান শুনে মনে হয়, তার আকাশে কখনো মেঘ ডাকে না, শুক্ল হয়ে থাকে অহর্নিশ। গানের সুরে কোথাও বিষাদের ছাপ নেই, অপ্রাপ্তির হা-হুতাশ নেই। শীতের দুঃসহ কঠিন প্রকোপ তাকে ছুঁয়ে যায় না। এটা কোকিলের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু আমাদের জীবনকে এরকম কল্পনা করা ভুল। কিংবা এমনতর অবিরত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন দেখাটাও অবাস্তব। বিশেষত আমরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আমাদের কাছে পৃথিবীর জীবন মানেই সুখ ও শোকের সমন্বয়, হাসি ও কান্নার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মিশ্রণ। আমরা বিশ্বাস করি, অবিরাম সুখ-প্রাচুর্য কিংবা অফুরন্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের একমাত্র জায়গা জান্নাত। জান্নাতে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত জীবনের চড়াই-উতরাই পেরোনোর জন্যে আমরা প্রস্তুত থাকি। গ্রীষ্মে নানা রকম ফল খেয়ে আমরা তৃপ্ত হই, আবার প্রচণ্ড খরতাপ ও খরারও সম্মুখীন হই। বর্ষায় নতুন করে চারা রোপণ করি, নতুন স্বপ্নের বীজ বুনি, আবার অকস্মাৎ প্লাবনে সবকিছু হারানোর আশঙ্কাও থেকে যায়। বসন্তে চারিদিকে মনোহারী শোভায় মুগ্ধ হই, আবার নানা রোগের প্রাদুর্ভাবের মুখোমুখিও হই। এগুলো আমাদের জীবনেরই অংশ। এই দোলাচলেই আমরা সময়ের সাঁকো পার হই। তবে কোনো অবস্থায় আরশের অধিপতিকে ভুলে যাই না। সুখ এলে কৃতজ্ঞ হই, শোক এলে ধৈর্যধারণ করি।

পৃথিবীর জীবন হাসি-কান্নার যোগফল। জান্নাতে শুধুই হাসির ফোয়ারা। তাই অনেকসময় সুযোগ সামনে এলেও আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘনের ভয়ে আমরা সব হাসি এখানেই হেসে শেষ করি না, কিছু হাসি জান্নাতে হাসার জন্যে তুলে রাখি। হাসতে হাসতে পৃথিবীর সময়টুকু কাটিয়ে দেওয়া আমাদের কাছে বিস্ময়কর।

ইমাম মালিকের একজন ছাত্রের নাম মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' আল-বাসারী। তিনি একদিন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছেন: আচ্ছা, যদি জান্নাতে কাউকে কাঁদতে দেখো, তোমরা অবাক হবে, তাই না?

সবাই বললো: অবাক হওয়ারই তো কথা!

তিনি বললেন: আমি তার চেয়ে বেশি অবাক হই, যখন কাউকে দুনিয়ায় হাসতে দেখি।

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই গল্পের দিকে তাকালে অনেক গভীর আত্মোপলব্ধির সন্ধান পাওয়া যায়। জান্নাতে যেহেতু কোনো দুঃখ-ক্লেশ নেই, সেখানে কাউকে কাঁদতে দেখা বিস্ময়কর। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদের সমন্বয়ে গড়া, এখানে কাউকে অবিরাম হাসতে দেখাও বিস্ময়কর।

পূর্বদিকের বিলগুলোতে বিস্তৃত সরিষার মাঠ হলদে আভা ছড়িয়ে রেখেছে। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য! যে দৃশ্য কবিতায় নতুন দৃশ্যপট রচনার সক্ষমতা রাখে। ক্ষেতের মাঝখানে শিশুদের ছোটাছুটি সেই দৃশ্যপটের সাথে নিয়ে আসে নতুন উৎপ্রেক্ষা। হলুদ মাঠের এখানে-ওখানে হলুদিয়া পাখির উপস্থিতি সেই উৎপ্রেক্ষাকে ছাপিয়ে কবিতার বাঁক পরিবর্তন করে দেয়। এই দৃশ্যপট ও দৃশ্যকাব্য শীতঋতুতে আরও বেশি তাজা থাকে। এখন সরিষা ঘরে তোলার সময়। এই মাঠেই কয়েকদিন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পর বোরো ধানের চাষ শুরু হবে। ঘানিভাঙা তেল তৈরিতে ব্যস্ত স্বচ্ছল কৃষকেরা।

আমগাছে নতুন পাতা আসতে শুরু করেছে। গ্রামীণ কিশোরেরা আম পাতা দিয়ে বাঁশি বানাতে ওস্তাদ। গাছে বোল পড়ার সময় মালীরা খুব সচেতন থাকে, যাতে কেউ গাছে উঠতে না পারে। এজন্যে আগেভাগেই গাছে চড়ার দুরন্তপনা বোধহয় সেরে নিচ্ছে ওরা। গুলতি বানানোর উপযুক্ত ডাল খোঁজা, বাঁশির পাতা সংগ্রহ করা, মৌচাকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা—কত কাজই তো তাদের আছে। কিন্তু এখন কী কারণে উঠছে, ঠিক নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে কি অনায়াসে ছেলেটা উঠে গেলো! রোগাপটকা ছেলে। কটিদেশ একেবারে ক্ষীণ। পায়ের গোছা তো একেবারেই চিকন। নিচে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা ছেলেটার এই স্বাস্থ্যহানি নিয়ে হাসাহাসি করছে। কেউ 'চিকন আলী' বলে টিটকিরি মারছে, কেউ 'পাটকাঠি' বলে খ্যাপাতে চেষ্টা করছে। এই দৃশ্য আমাকে আরেকটা পুরোনো দৃশ্যের কাছে নিয়ে যায়, যেটা ইমাম আহমাদ ও তাবারানী তাঁদের হাদীসগ্রন্থে অঙ্কন করেছেন।

মরুভূমিতে আরাক নামের একটি বৃক্ষ আছে, যেটার ডাল মিসওয়াক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। একদিন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ ﵁ সেই গাছে উঠলেন মিসওয়াকের ডাল বাছাই করার জন্যে। তাঁর পায়ের হাঁটু ছিলো খুব চিকন। যখন বাতাস বইতে শুরু করলো, তিনি ডানে-বাঁয়ে হেলে পড়ার উপক্রম হলেন। লোকজন এতে হাসাহাসি করছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'কী দেখে তোমরা হাসছো?' তাঁরা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তার পায়ের গোছা ক্ষীণকায় দেখে হাসছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أُحُد

"সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আব্দুল্লাহর এই দুই পা কিয়ামতের দিন মিযানে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ওজনদার হবে।"[২৬৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি থেকে আমাদের জন্যে অনেকগুলো বার্তা আছে।

চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশের দিন আমাদের যাবতীয় কর্মের ওজন করা হবে। আল্লাহর মিযানে যার পুণ্যকাজের পাল্লা ভারী হবে, সে উতরে যাবে। আর যার পাপকাজের পরিমাণ বেশি হবে, তাকে শাস্তি পেতে হবে। শারীরিক গঠন কিংবা আকার-আকৃতিতে কে কতটা ওজনদার ছিলো, কার স্বাস্থ্য কত নাদুসনুদুস ছিলো, ঐদিন তা মোটেও বিবেচ্য হবে না।

আল্লাহ বলছেন:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.

"সেদিন যথাযথভাবে ওজন করা হবে। যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে, আসলে তারাই সফলকাম। আর যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে, তারা সেসব লোক যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।"[২৬৫]

সুতরাং গায়েগতরে ডাকসাইটে হওয়ার পর যদি মিযানে নিজের পুণ্যের পাল্লা ভারী না করা যায়, তাহলে গৌরবের কিছু নেই। কেউ যদি ক্ষীণকায় স্বাস্থ্য নিয়ে নিজের 'মিযান'কে ঠিক রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করলেও দিনশেষে সে-ই সফল। আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও স্পষ্ট করে একটা হাদীসে বলেছেন:

إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة

"কিয়ামতের দিন বিশাল বপু নিয়ে মোটাসোটা ব্যক্তি উপস্থিত হবে, আল্লাহর কাছে যার ওজন একটা মশার ডানার সমানও নয়।"[২৬৬]

আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ-এর ক্ষীণ স্বাস্থ্য নিয়ে হাসাহাসি করাটা আল্লাহর রাসূল ﷺ পছন্দ করেননি, কারণ তিনি জানতেন, আব্দুল্লাহর পা খুব মাংসল ছিলো না বটে, কিন্তু সেই পা ছিলো পুণ্যের কাজে অগ্রগামী। দীনের জন্যে সেই পা কোনো বিশ্রাম নিতো না, অবিরত ছুটে চলতো। এজন্যে আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদাও অনেক বেশি। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মক্কার বৈরী পরিবেশে সব ধরনের ভয়-সংকোচ উপেক্ষা করে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করেছেন। এজন্যে তাঁকে অনেক কষ্টও পোহাতে হয়েছে।

কুরআনের জ্ঞানে তিনি ছিলেন অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছেন: "তোমরা কুরআনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণী জ্ঞানের পাঠগ্রহণ করো এই চারজন থেকে: আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালিম, উবাই ইবন কা'ব ও মু'আজ ইবন জাবাল।"[২৬৭] বোঝাই যাচ্ছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ যাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে সত্যায়ন করছেন, তিনি কত বড় মাপের জ্ঞানী।

ফিকহের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম পণ্ডিত। 'উমার ﷺ-এর খিলাফাতকালে তাঁকে শাম অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিলো মানুষকে দীনের দীক্ষা দেওয়ার জন্যে। 'আলী ﷺ তাঁকে বলতেন 'কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা'।[২৬৮] আরেক সাহাবি আবুদ্দারদা ﷺ-ও তাঁর এই পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাছে কোনো ফাতাওয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলতেন: "তোমাদের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ থাকতে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছো?"[২৬৯] ইলম অর্জনে তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন 'সাধক' ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ যেমন ছিলেন ধীমান, তেমন ছিলো তাঁর ঈমান। শুধু জ্ঞানচর্চায় নয়, রাসূলুল্লাহর সাথে জিহাদেও তিনি ছিলেন একজন অগ্রসেনানী। আবূ জাহল, আল্লাহর রাসূল যাকে 'এই উম্মতের ফিরআউন'[২৭০] বলে অভিহিত করেছেন, বদরের দিন আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ তাকে হত্যা করেছেন।[২৭১] অন্যান্য যুদ্ধেও তিনি বীরত্বের সাথে অংশ নিয়েছেন। যুহদেও তিনি ছিলেন প্রাগ্রসর একজন। অত্যধিক কান্নার দরুন তাঁর দুই চোখে অশ্রুপাতনের কালো দাগ দেখা যেত।[২৭২]

এমন বর্ণাঢ্য জীবন যাঁর, এত কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের অধিকারী যিনি, মিযানে তাঁর পুণ্যের পাল্লা পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে, এ আর এমন বিচিত্র কী!

কিয়ামতে আমরাও তো পুনরুত্থিত হবো! 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের মতো আমাদেরও তো হিসেবের মুখোমুখি হতে হবে! আমাদের পাপ-পুণ্যও সেদিন মিযানে ওজন করা হবে। আমরা কি নিজেদের পুণ্যের পাল্লা ভারী করার জন্যে তেমনই তৎপর? আজকে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে যত কথা বললাম, যত কাজ করলাম, সেগুলোতে গোনাহের পরিমাণ কেমন ছিলো, আর সাওয়াবের অংশই-বা কতটুকু ছিলো, হিসেব কষতে পারি। এখনই, এই মুহূর্তেই যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমার মিযানে পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে, নাকি পাপের পাল্লাটাই ঝুঁকবে বেশি? মাঝেমধ্যে এই প্রশ্ন যদি নিজেদের করতে পারি, আমাদেরই উপকার হবে।

এবার হাদীসের গল্প থেকে আরেকটা দিক আমরা লক্ষ করি। 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের ক্ষীণ পা নিয়ে উপহাসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করেননি, তেমনি আল্লাহও ভীষণ অপছন্দ করেন পারস্পরিক উপহাস করাকে। মানুষের মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানের মূল্যায়নে আল্লাহর দীন সব ক্ষেত্রেই বাস্তবানুগ বিধি প্রণয়ন করেছে। ছোটখাটো কোনো মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিই এই দীনের নজর এড়িয়ে যায়নি। শুধু ত্রুটির বর্ণনা করে ক্ষান্ত হয়নি, এর নেপথ্য কারণ ও তার অসারতাকেও তুলে ধরেছে।

উপহাস-পরিহাসের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী[২৭৩] লক্ষ করলেই আমরা ব্যাপারটি কিছুটা বুঝতে পারি:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"যারা ঈমান এনেছো, তোমরা একে অপরকে উপহাস করবে না। এমনও তো হতে পারে, যাদের উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। কোনো নারীও অপর কোনো নারীকে উপহাস করবে না। হতে পারে, যে নারীগুলোকে উপহাস করা হচ্ছে, তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম।"

কাউকে উপহাস ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণ কী? মোটাদাগে বলতে গেলে, ঐ ব্যক্তিকে নিজের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা উপহাস করতে নিষেধ করার পর বলেছেন, তুমি তো জানো না, যাকে কোনো দুর্বলতার কারণে উপহাস করছো, সে তোমার চেয়ে কোন দিকে এগিয়ে আছে! ইবন মাস'ঊদ স্বাস্থ্যের দিক থেকে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন, তাই তারা হাসাহাসি করেছিলো। কিন্তু ঈমান-আমালে তাদের অনেকের চেয়ে যে ইবন মাস'ঊদ এগিয়ে ছিলেন, এ কথা চিন্তা করলে উপহাসের কথা মাথায় আসতো না।

আল্লাহর এই ঘোষণার মাধ্যমে সকল প্রকার উপহাস ও নিন্দাকেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কোনো মুমিন অপর মুমিনকে উপহাস করতে পারবে না। তার দারিদ্র্যের কারণেও তাকে উপহাস করা যাবে না, তার কোনো পাপের কারণেও না।[২৭৪]

কারও পূর্বেকার পাপ তো বটেই, কারও পূর্বপুরুষের পাপের দিকে ইঙ্গিত করেও কোনো ধরনের উপহাস করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটা গল্প বলা যেতে পারে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ ﷺ বলছেন:

রাসূলুল্লাহর মাজলিসে এসে সাবিত ইবন ক্বাইস এক ব্যক্তির পেছনে বসলেন।

তারপর বললেন: এটা কে?

অনেকে বললেন: এটা অমুক।

সাবিত বললেন: ও আচ্ছা, অমুক মহিলার সন্তান!

তার মা ইসলামগ্রহণ করেননি, জাহিলিয়াতের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন। সাবিত সেই দিকে ইঙ্গিত করাতে ঐ ব্যক্তি খুব লজ্জা পেলেন। তখন আয়াতটি নাযিল হলো।[২৭৫]

আয়াতটির অন্য অংশ 'وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ (কোনো নারীও অপর কোনো নারীকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উপহাস করবে না।)' নাযিল হওয়ারও একটি প্রেক্ষাপট আছে। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ'র বাবা ছিলেন প্রসিদ্ধ ইয়াহূদী হুয়াই ইবন আখতাব। তিনি ইসলামগ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন।

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ﷺ জানাচ্ছেন:

একদিন সাফিয়্যাহ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু মহিলা আমাকে তিরস্কার করছে। তারা আমাকে এই বলে ডাকছে: يا يهوديّة بنت يهوديّين (এই যে ইয়াহূদীর মাইয়্যা ইয়াহূদিয়্যা!)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন[২৭৬]: তুমিও বলতে—আমার পিতা হলেন মূসা ﷺ, আমার চাচা হলেন হারূন ﷺ, আমার জীবনসঙ্গী হলেন মুহাম্মাদ ﷺ!

এরপর আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন।[২৭৭]

তিরস্কার ও উপহাস জিনিসটা আল্লাহর কাছে অত্যধিক অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় বিধায় সাথে সাথেই আয়াত নাযিল করে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আমি কি সতর্ক থাকি? কারও দুর্বলতার দিক খুঁজে পেলে তাকে সুযোগমতো বিব্রত করার জন্যে আমার মন যে উশখুশ করতে থাকে, আমি কি সেই মনের উপর লাগাম লাগিয়ে দিতে পারি?

যদি পারি, তো আমি নিজের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত। আর যদি না পারি, তো আমার পরিণাম ভয়াবহ: (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ)

"উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে মানুষকে তিরস্কারকারী—প্রত্যেকের জন্যে ধ্বংস!"[২৭৮]

সুতরাং, আজকে থেকে আমি এ ব্যাপারে কৃতসংকল্প হচ্ছি, কাউকে নিন্দা করা, তিরস্কার করা কিংবা যেকোনো সম্মানহানিকর কথা বলা ও উপহাসজ্ঞাপক উক্তি করা থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিরত রাখবো ইন শা-আল্লাহ।

আমগাছে বসে বসে অনেক গল্পই তো হয়ে গেলো। এবার সেখান থেকে নেমে আসি। তাহলে কি জামগাছে উঠবো? না, থাক। আমরা বরং ফুলবাগানের দিকেই যাই। ওমা, কাঁঠালচাঁপা ফুটছে যে! এই ফুলের ঘ্রাণ খুবই মনোহর। কিন্তু ঘ্রাণটা ছড়াবে রাতে। তাছাড়া ফুল তো এখনো পুরোপুরি ফোটেনি, তাই ইচ্ছা করলেও ঘ্রাণ নিয়ে প্রাণ জুড়ানোর সুযোগ নেই। ফুলটার সাথে কাঁঠাল গাছের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, ফুলের আকার-আকৃতিও কোনোদিক থেকে কাঁঠালের মতো নয়, তবুও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই ফুলকে কেন 'কাঁঠালচাঁপা' বলেই ডাকা হয়, আমার কাছে অনেকদিন রহস্যটা অজানা ছিলো। একবার ভাবলাম, কাঁঠালের শরীর কিছুটা কাঁটালো, কিন্তু সেই কাঁটা সুচালো বা ধারালো নয়। তাহলে এরকম মৃদু ও হালকা কোনো কাঁটা কি এই ফুলের সাথে আছে? না, তা-ও পেলাম না। ফুল, ফুলের গাছে শাখা-প্রশাখা, গাছের পাতা—কোথাও কোনো কাঁটা নেই। আরেকটা দিক থেকে মেলাতে চাইলাম। কাঁঠালের সাথে আঠার সম্পর্ক খুব জোরালো, এই ফুল থেকে কোনো আঠা হয় কি না দেখা যাক। এবারও হতাশ হলাম। তাহলে কোনদিক থেকে মিলিয়ে ফুলটাকে 'কাঁঠালচাঁপা' নাম দেয়া হলো? রহস্যটা ক্রমশ ঘনীভূত হতে লাগলো আর আমাকে অস্থির করে তুললো।

একদিন রাতের বেলা হুট করে রহস্যের জট খুলে গেলো। সেটা ছিলো কোনো এক পরীক্ষার পূর্বরাত। এই রাতে পাঠ্যবই ছাড়া সব বই-ই আমাদের ভালো লাগে, পাঠ্যবিষয় ছাড়া সব বিষয়ই ভাবতে মজা লাগে। যে ছাত্রটার কাছে কবিতা নিরেট চোখের বালি, পরীক্ষার পূর্বরাতে সেই ছাত্রটাই কাছে কোনো কাব্যগ্রন্থ পেলে আদ্যোপান্ত পড়তে শুরু করে। টেবিলের নিচ থেকে পুরাতন পত্রিকা বের করে উদ্দেশ্যহীন পাতা উলটাতেও তার ভালো লাগে। এ এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। এই রাতে ছাত্রছাত্রীদের মস্তিষ্কে নয়টা দরজা খুলে যায়। যাদের কবিতা লেখার অভ্যাস, তারা এই এক রাতেই দু চারটা উন্নতমানের কবিতা উৎপাদন করে ফেলে। একেকজন শিক্ষার্থী বিশাল মাপের ভাবুকে পরিণত হয়। অবশ্য পরের দিন পরীক্ষার খাতায় লিখতে গিয়ে অদৃশ্য চাবুক পিঠে বসে যাবে, এই ভেবে ভাবুকসত্তা বেশিক্ষণ থাকে না।

সে যাই হোক, এমনই এক পরীক্ষার পূর্বরাতে আমি কবি আল মাহমুদের মতো ছড়া কাটছিলাম:

"আম্মা বলেন পড় রে সোনা
আব্বা বলেন মন দে
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠালচাঁপার গন্ধে।"

সেসময় বসন্তের প্রায় শেষদিক। আমাদের উঠোনের একপাশে কাঁঠালচাঁপা তার মোহনীয় সুবাস বিলিয়ে যাচ্ছে। জানালার শার্সি গুটিয়ে দিয়ে সুবাসিত বাতাস নাকে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করলাম। দেখি ফুরফুরে বাতাস ঠিকই আসছে। সঙ্গে নিয়ে আসছে কাঁঠালচাঁপার ঘ্রাণ। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, সেই ঘ্রাণের সাথে কেমন যেন কাঁঠালের ঘ্রাণের মিল পাচ্ছি! আরও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিছুক্ষণ একমনে ঘ্রাণ পরখ করার পর কোনো সন্দেহ থাকলো না, কাঁঠালের ঘ্রাণ এমনই হয়। তাহলে একই রকম ঘ্রাণের কারণেই এই নাম দেয়া হয়েছে? আমি তো আর্কিমিডিসের মতোই 'ইউরেকা' বলে চিৎকার দিয়ে দিলাম। আম্মা ভেবেছেন, জটিল কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পেরে আমি এমন উল্লাস করছি, তাই শুনতে পেয়েও বকা দিলেন না। মায়েরা পরীক্ষার পূর্বরাতে কোনো বকাঝকা করেন না, রেজাল্টের দিন সব বকা যাতে একসাথে দিতে পারেন। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? 'কাঁঠালচাঁপা'কে কেন কাঁঠালের সাথে সম্বন্ধ করা হলো, তার রহস্য আমার কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। নতুন কিছু আবিষ্কারের আনন্দে মনটাও ফুরফুরে আর হালকা হয়ে গেলো। তারপর একমনে পড়া রিভিশন করতে বসে গেলাম। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, সেই পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়েও আমি 'ইউরেকা' বলতে পেরেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু চূড়ান্তভাবে 'ইউরেকা' বলার সুযোগ আমি পেলাম না।

ভূগোল পরীক্ষায় বি গ্রেড পেয়ে বসে আছি। সিলেবাস দেখে অত বেশি কঠিন মনে হয়নি, ভেবেছিলাম পরীক্ষার দুয়েকদিন আগে থেকে একটানে পড়ে শেষ করব। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিলো। বই খোলার পর বুঝলাম, দুই রাতে শেষ করা সম্ভব নয়। আবার বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ করেই ঘোষণা এলো, পরীক্ষা একদিন আগে নিয়ে আসা হয়েছে। চোখেমুখে অন্ধকার দেখলাম। সব মিলিয়ে ঠিকমতো পড়া প্রস্তুত করতে পারলাম না। যা হবার তা-ই হলো। দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার আগের কয়েক রাত ঘুমাতে পারিনি। পরীক্ষাটাও ভীষণ খারাপ হলো। এই রেজাল্টের পর থেকে আমার অনেক বড় একটা ভুল ভেঙেছে। যেদিনের পড়া সেদিন শেষ না করলে যে বিপদে পড়তে হয়, এ কথা মন-মগজে একেবারে গেঁথে আছে। আশা করি, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর হবে না। এরই সাথে আরেকটা বড় ভুলও ভেঙেছে। অন্য আর দশজনের মতো আমারও মনে হতো, তারুণ্য আর যৌবনে দীন পালনে অত তৎপর হওয়ার কী দরকার? শেষ বয়সে ভালো মতন ইবাদাত-বন্দেগী করে নিলেই তো হয়। কিন্তু এখন বুঝেছি, সারা বছরের পড়া একরাতে শেষ করতে চাইলে যেমন ভালোভাবে কিছুই পড়া হয় না, সারাজীবনের ইবাদাত একটা নির্দিষ্ট সময়ে সারতে চাইলে একই অবস্থাই হবে। যেদিনের পড়া সেদিন শেষ করলে পরীক্ষার আগে আর দুশ্চিন্তা থাকে না, তেমনি যে সময়ের ইবাদাত সে সময়েই করে গেলে আশা করি আখিরাত নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

তাছাড়া আরও একটা চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। আমি যে শেষ বয়সে আমলনামা ভারী করার চিন্তায় বসে আছি, ঐদিন পর্যন্ত যে বেঁচে থাকবো, তার কী নিশ্চয়তাটা আছে? পরীক্ষাটা হুট করেই ঘোষণা দিয়ে একদিন এগিয়ে এসেছিলো,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের আসমানী ফায়সালাও তো বার্ধক্যে পৌঁছার আগেই চলে আসতে পারে! পারে না?

কলেজকর্তৃপক্ষ তো অন্তত কয়েকদিন আগে ঘোষণা দিয়ে পরীক্ষা এগিয়ে এনেছে, আমার মৃত্যুর জন্যে তো তেমন কোনো পূর্বঘোষণাও দেয়া হবে না! আল্লাহর হুকুম অনুসারে অকস্মাৎ এসে হাজির হয়ে যাবে আমার দুয়ারে।

তাহলে আমি যে ইবাদাতে গড়িমসি করার চিন্তা করেছিলাম, যৌবনে ভালোভাবে দীন পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেটা কত মারাত্মক সিদ্ধান্তই না ছিলো! অত বড় ঝুঁকির মুখে নিজেকে ফেলার মানে হয় না। সেজন্যেই তো আমার পড়ার টেবিলের চেহারা পালটে ফেলেছি। কলেজের ক্লাসরুটিনের পাশে এখন সালাতের সময়সূচিও টানানো আছে। দিনের পড়া দিনে শেষ করি, ওয়াক্তের সালাতও ওয়াক্তেই সেরে ফেলি। ক্লাস পারফরম্যান্সে এগিয়ে থাকার জন্যে কিছু অতিরিক্ত অধ্যয়ন যেমন করি, আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহেও নিজেকে এগিয়ে রাখার জন্যে কিছু অতিরিক্ত নফল সাওম পালন করি। তুমিও করো, হ্যাঁ?

আমরা কোন ফুল নিয়ে এতক্ষণ ছিলাম? ও হ্যাঁ, কাঁঠালচাঁপা। ঐদিকে একটু দেখো, কনকচাঁপার গাছও এখন ফুলে শোভিত। এই ফুলের রং কী? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়ার জন্যে রংবিশেষজ্ঞদের উচিত নতুন কোনো রঙের নাম ঠিক করা। এই ফুলটাকে না হলুদ বলা যায়, আর না সোনালি বলা যায়। কী এক বিপত্তি! দুয়ের মাঝামাঝি। মুযাবযাবীনা বাইনা জালিক।

দোলনচাঁপাও দোল খাচ্ছে থোকায় থোকায়। বেলিফুল অত উঁচুতে দোল খাওয়ার সুযোগ না পেলেও আমাদের মনে ঠিকই দোল খায়, জাগিয়ে তোলে অনির্বচনীয় সজীবতার হিন্দোল। ঝোপ থেকে বেলি নিয়ে ঝুপড়ি ভরতি করছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। কড়ামিঠে রোদের মধ্যে গাছের গুঁড়িতে বসে বেলী ফুল দিয়ে মালা গেঁথে যাচ্ছে ওরা। ওদের মালাগাঁথার দৃশ্য দেখে ইকবালের একটা কবিতার কথা খুব মনে পড়ে।

ইকবাল বলছেন:

"নিয়মানুবর্তী হয়ে পাপড়িগুলো ফুলে পরিণত হয়।
নিয়মের অধীনেই ফুলগুলো হয়ে যায় ফুলের মালা।
স্বর যখন নিয়মের অধীন থাকে, তখন সেটা সংগীত হয়ে যায়।
স্বর যখন বেসামাল হয়, তখন শুধু শোরগোলই শোনা যায়।"[২৭৯]

কত সুন্দর করে ভাবতেন তিনি!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইকবাল আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া বিধিবদ্ধ জীবনশৈলীকেই চর্চা করার জন্যে অনুপ্রাণিত করছেন। একটি বিধানের ছায়াতলে থাকলে জীবন যে সুন্দর হয়, সে কথা বোঝাতে চাচ্ছেন কয়েকটি উপমা টেনে।

এই যে পাপড়িগুলো, এরা যদি ইচ্ছেমতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, তাহলে ফুল হয়ে উঠবে না। একটি কুঁড়িতে সবগুলো পাপড়ি নিয়মতান্ত্রিকভাবে জুড়েছে বলেই সুন্দর একটি ফুল হয়েছে। আবার, এই যে ফুলের মালা মানুষের গলায় পরিয়ে শোভাবর্ধন করা হয়, কিংবা সাজিয়ে তোলা হয়, সেখানেও বিধিবদ্ধতার আবেদন আছে। একটি সুতোর অধীনে সব ফুলকে একত্রে গেঁথে দেয়া হয় বলেই পুষ্পমাল্য সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে আমরা দেখি, মানুষের স্বর ও সুর যদি বিক্ষিপ্তভাবে উচ্চারিত হয় অথবা মর্জিমাফিক অনুরণিত হয়, তাহলে কিছু শোরগোল ও হইচই ছাড়া আর কিছুই হয় না। কিন্তু সেই স্বর ও সুর যখন নির্দিষ্ট তাল-লয়ের অধীনে আসে, সাংগীতিক ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে, তখন শ্রুতিমধুর সংগীতে পরিণত হয়।

আমরাও নিয়মের মৃণালে ফুল হয়ে ফুটি।

বিধিবদ্ধ জীবনাচারে পুষ্পমাল্যের মত শোভাবর্ধক হই।

আমাদের জন্যে নির্ধারিত জীবনব্যাকরণ অনুসরণ করে পৃথিবীর সাংগীতিক সৌন্দর্যের অংশ হই।

সেই মৃণালের আল্লাহপ্রদত্ত নাম 'কুরআন'।

সেই জীবনাচারের প্রতিভাষ্য 'সুন্নাহ'।

আর সেই জীবনব্যাকরণের আসমানী অভিধা 'ইসলাম'।

মিলিয়ে নিতে পারলাম?

বেলিফুলের ঘ্রাণ অনেকক্ষণ নেওয়া হলো। আরেকটা ফুলের কাছে আমরা যাই। পাঁচ পাখার স্ট্যান্ডফ্যানের সাথে তুলনা দিলে ফুলটার একটা পরিচয় মোটামুটি স্পষ্ট করা যায়। পাঁচটা পাপড়ি—পাপড়িগুলোর চেহারা সব মিলিয়ে পাঁচ পাখার একটা স্ট্যান্ডফ্যানই এদের সাথে তুলনামূলক সদৃশ। এই ফুলের নাম 'নয়নতারা'। ছোটবেলায় আমরা একে 'পয়সা ফুল' বলেই জেনে এসেছি। কিছুটা গোলাকার, এজন্যে হয়তো এমন নাম দেওয়া হয়েছিল। শৈশবের বৈতরণি পার হবার পরও এই ফুলের প্রকৃত নাম অজানা ছিলো। একদিন পত্রিকার পাতায় ফুলটিকে নিয়ে প্রতিবেদন দেখার পর ছবিটি মিলিয়ে নিলাম। উরিব্বাস, এ তো আমাদের পয়সা ফুল! আমাদের শৈশবে অন্যরকম একটা আনন্দ ছিলো, নতুন কোনো ফুল বা পাখির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাথে পরিচিত হতে পারা, প্রকৃতির নতুন কিছুর রহস্য সম্পর্কে জানতে পারাটা ছিলো ভীষণ গৌরবের। সেলুলয়েডের ফিতা আর তারবিহীন প্রযুক্তির আশীর্বাদ সেই চিরচেনা শৈশবকে কোথায় যে হারিয়ে দিলো! শিশুর ভেতরে জানার ইচ্ছা নেই, আবিষ্কারের নেশা নেই, পঠন-পাঠনের আগ্রহ নেই। বলা হচ্ছে, টেলিভিশন পুরো পৃথিবীকে নিয়ে এসেছে চার দেয়ালের মধ্যে। কিন্তু বলা হচ্ছে না, টেলিভিশন শিশুকে বন্দি করে রেখেছে চার দেয়ালের ভেতর। প্রকৃতির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত, সবুজের স্পর্শ থেকে আলোকবর্ষ দূরে থাকা এই মানবসন্তানগুলো বেড়ে উঠছে বাতাসবিহীন বদ্ধ গুদামঘরে পচতে থাকা পণ্যদ্রব্যের মতো।

আচ্ছা, এত এত ফুলের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো, চম্পা গেলো কই? চম্পা কি চম্পট দিয়েছে কোথাও? না না, ঐ যে ঝোপের মধ্যে ফুটে আছে! বনেবাদাড়ে হাতেকলমে ফুল চেনা না থাকলে কনকচাঁপা থেকে চম্পাকে পার্থক্য করা দুরূহ ব্যাপার। এত তীব্র ঘ্রাণ খুব কম ফুলেই আছে। শৈশবে ছোট চাচ্চুকে দেখতাম, কাচের বোতলে পানির মধ্যে চম্পাকে ভিজিয়ে রাখছেন। অনেকদিন পর্যন্ত ফুলগুলো ওভাবেই তাজা থাকে এবং সুবাস বিলিয়ে যায়। স্বচ্ছ বাতাসে হেঁটে চম্পার ঘ্রাণ নিঃশ্বাসের সাথে মিশিয়ে ফেলার তীব্র সতেজানুভূতি যিনি এখনো পাননি, তিনি প্রকৃতিতে আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতরাজির একাংশ অনুভব করা থেকে সত্যিকার অর্থেই বঞ্চিত। এই ঘ্রাণ একদম প্রাণ ছুঁয়ে যাওয়া, এই সুবাস একদম উদাস করে দেওয়া। চম্পার সুবাস যিনি পাননি, তার জন্যে অনুকম্পা।

বসন্তে মনমাতানো ঘ্রাণ ছড়িয়ে দেওয়ার বিশাল কৃতিত্বে উল্লেখযোগ্য অংশের দাবিদার আরেকটা ফুল, নাম তার নাগকেশর। দুধসাদা পাপড়ির মাঝখানে সোনালি কেশর। নাগকেশরের গাছে বল্লমের মতো পাতা, মোচার মতো ফল। এই ফুলটার সুগন্ধিও একেবারে মাতোয়ারা করে দেওয়ার মতো। দাদার কাছে শুনেছি, এই ফুল থেকে আতর তৈরি হয়। কিন্তু কখনো দেখিনি। আমাদের উঠোনের দক্ষিণ কোণায় ঝোপালো নাগকেশর গাছ অনেক ছিলো আগে। এখন খুব বেশি নেই। 'কুলুউউক ভোয়া' লুকোচুরি খেলার জন্যে নাগকেশরের ঝোপগুলো ছিলো জুতসই জায়গা। ঘ্রাণের মধ্যে নাক ডুবিয়ে অনেকক্ষণ চুপটি করে থাকা যেত। একবার হয়েছে কি, লুকোচুরি খেলা হচ্ছে, নাগকেশরের আড়ালে আমি বসে আছি। আমাকে কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি তখনো। আমি চুপচাপ বসে থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিলাম, তারপর নাকের কাছে এনে সুবাস নিচ্ছিলাম। হঠাৎ ফুল থেকে কী একটা পোকা নাকে ঢুকে গেলো, অমনি বিশাল আওয়াজে একটা হাঁচি চলে এলো। আর যায় কই, আমাকে খুঁজে বের করে ফেললো। শহরে চলে যাওয়ার আগে একটা একটা ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছি, ঘ্রাণের সাথে মিশিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। শহুরে বনসাই কিছুক্ষেত্রে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চোখ জুড়ায় বটে, তবে মন জুড়াতে পারে না।

কাঁঠালচাঁপা, বেলি, চম্পা ও নাগকেশরের মিলিত ঘ্রাণ নাসারন্ধ্রে মিষ্টি একটা ঘোরের সৃষ্টি করে। প্রতিদিনের প্রার্থনায় যেই জান্নাত আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি, সেই জান্নাতেও নাকি থাকবে প্রাণ-আকুল-করা ঘ্রাণ। তবে পৃথিবীর ঘ্রাণের সাথে সেই ঘ্রাণের তুলনা দেয়া যায় না। জান্নাতের ঘ্রাণ এতটাই প্রখর যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন[২৮০], সেই ঘ্রাণ চল্লিশ বছর অতিক্রম্য পথের সমান দূরত্ব থেকেও নাকে পৌঁছে যাবে[২৮১](ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)। আমরা যে ফুলগুলোর ঘ্রাণ নিয়ে আকুল হই, চল্লিশ গজ দূর থেকেও সেই ঘ্রাণ আমাদের নাকে পৌঁছে না। কিন্তু জান্নাতের ঘ্রাণ অনেক বেশি শক্তিশালী ও তীব্র, সেজন্যেই তো এত সহস্র ক্রোশ দূরত্ব থেকেও তার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। আর হবেই-বা না কেন, এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্যে পুরস্কার! আল্লাহর পুরস্কার কি যেন তেন হয়? তাঁর উপহার মানেই তো বিশাল কিছু, বিশেষ কিছু!

জান্নাতের সবখানেই পবিত্র সুবাসের সমারোহ। এমনকি যে পানপাত্র দিয়ে জান্নাতবাসীরা পানীয় গ্রহণ করবে, সেটাও সুগন্ধে ভরপুর। যেন তেন সুগন্ধও আবার নয়, কস্তুরীর সুগন্ধ!

এই তো কুরআন আমাদের জানাচ্ছে:

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ. خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ

"তাদেরকে মোহর করা সুধা পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী মিশ্রিত।"[২৮২]

ছোট পরিসরে কস্তুরীর একটি পরিচয় আমরা নিতে পারি। হরিণের একটি বিশেষ প্রজাতি হচ্ছে কস্তুরীমৃগ, তাদের নাভিতে এই সুগন্ধিকোষের জন্ম হয়। প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত সুগন্ধিটির কদর বহুমূল্য। কিছুটা দুষ্প্রাপ্য, আবার অত্যধিক মূল্যবান বলে সবার হাতের নাগালে এটা পৌঁছে না। মজার বিষয় হচ্ছে, হরিণের নাভিতে যখন এই সুগন্ধিগ্রন্থি সৃষ্টি হয়, তখন সে নিজেও বুঝতে পারে না। সুগন্ধির সন্ধানে দিগ্‌বিদিক ছুটতে থাকে সে। অনেকটা আমাদের মতোই। দুনিয়ার সেরা আসমানী গাইডলাইন 'ইসলাম' আমাদের হাতে আছে, অথচ আমরা তাকে চিনতে পারি না, মুক্তির আশায় দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করি। নিজের সুগন্ধি চিনতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকা অবস্থাতেই হরিণ সবচে' বেশি শিকারের সম্মুখীন হয়। একই অবস্থা আমাদেরও। আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে না ধরে দিশাহীন ছোটাছুটির মধ্যে কে যে কখন শাইত্বানের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি, নিজেরাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বুঝতে পারি না।

যা-ই হোক, কস্তুরীর সুঘ্রাণ যে অনেক বেশি তীব্র, অনেক বেশি মূল্যবান, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আয়াতটিতে যে পানীয়'র কথা বলা হচ্ছে, সেটা কেমন সুগন্ধিযুক্ত হবে, সে ব্যাপারে ইমাম ইবন কাসীর তাঁর তাফসীরে একটি বর্ণনা এনেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির সাহাবি আবুদ্দারদা ﷺ কুরআনে বর্ণিত এই পানীয়টির বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে:

ولو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها

"পৃথিবীর কোনো মানুষ যদি ঐ পানীয়তে আঙুল চুবিয়ে বের করে আনে, এমন কোনো প্রাণী থাকবে না, যে তার ঘ্রাণ পাবে না।"[২৮৩]

সুরভিত পানীয়ের কথা তো জানলাম। ফুলেল ঘ্রাণ কি জান্নাতে থাকবে না?

থাকবে না মানে? হতাশ হবার কিচ্ছু নেই, সেটাও থাকবে। ফুলেল ঘ্রাণ তো থাকবেই, জান্নাতে সর্বোৎকৃষ্ট ঘ্রাণও বলা হয়েছে একটি ফুলের ঘ্রাণকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

سيد ريحان أهل الجنة الحناء

"জান্নাতীদের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট ঘ্রাণ হলো মেহেদী ফুল।"[২৮৪]

আমাদের দেশে অনেক মেহেদী গাছেই ফুল ফুটতে দেখা যায়। সেই এক মাদকতাময় ঘ্রাণ! তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের দেখা মেহেদী ফুলের ঘ্রাণকে জান্নাতের ঘ্রাণ বলে কল্পনা করা যাবে না। শুধু ঘ্রাণই নয়, পৃথিবীর কোনো কিছুকেই জান্নাতে প্রদেয় কোনো কিছুর সাথে তুলনা দেয়া যাবে না। মেহেদী ফুলের যে ঘ্রাণ আমাদের কাছে পরিচিত, সেটা একেবারেই পার্থিব। জান্নাতের ঘ্রাণ হবে বহুগুণ বেশি অনুভূতিস্পর্শী, যেটা পার্থিব কোনো ঘ্রাণের সাথে মিলিয়ে অনুভব করা একেবারেই অসম্ভব। এক্ষেত্রে একটা মূলনীতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আর তা হলো, জান্নাতের বিভিন্ন ফুল-ফল ও সুঘ্রাণের যেসব বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে, সেসবের মধ্যে যেগুলো আমাদের পরিচিত, সেগুলো শুধু নামেই মিল থাকবে, গুণ ও বৈশিষ্ট্যে নয়। সে কথাটাই বলেছেন রঈসুল মুফাসসিরীন (মুফাসসিরগুরু) 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ﷺ:

لا يشبه شَيءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"পৃথিবীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা কিছু জান্নাতে থাকবে, তা শুধু নামেই মিল থাকবে, অন্য কোনো দিকে নয়।"[২৮৫]

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, জান্নাতে কস্তুরীর যে ঘ্রাণ থাকবে, সেটা পৃথিবীতে পাওয়া কস্তুরীর ঘ্রাণের মতো নয়। সেটা কেমন, তা শুধু আল্লাহই জানেন। জান্নাতে যে ফল দেয়া হবে, সেটাও পৃথিবীতে খাওয়া আঙুরের মতো নয়। তার স্বাদ কেমন হবে, সে ব্যাপারে পৃথিবীতে কোনো ধারণা নেয়া সম্ভব নয়। এমনিভাবে জান্নাতের বিভিন্ন নদী ও বাগানও আমাদের কল্পনার ঊর্ধ্বে, চিরচেনা অনুভূতির জালে যাকে আটকানো যাবে না। জান্নাতের বিছানা, পানপাত্র সবকিছুর ক্ষেত্রেই এই একই মূলনীতি। সুতরাং, আমাদের দেখা মেহেদী ফুল আর জান্নাতের মেহেদী ফুল কখনোই এক নয়। সেই ফুল আমাদের চিন্তা ও কল্পনার চেয়েও বহুগুণ বেশি ঘ্রাণময়, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব ছাপিয়ে যাবে সেই অতুলনীয় সৌরভ।

এ তো গেলো জান্নাতের সুঘ্রাণের গল্প। জান্নাত অভিমুখে অভিযাত্রার প্রথম তোরণ হলো কবর, সেখানেও জান্নাতীরা কিন্তু জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত ঘোষিত হবার পর একজন মুমিন প্রথম যে অভ্যর্থনা পাবেন, সেই পর্বে অপার্থিব এক সুবাস পৌঁছে যাবে তাঁর জন্যে। কবরে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হবার পর যাঁরা আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবেন, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে:

صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة

قال فيأتيه من روحها وطيبها

"আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্যে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাত অভিমুখে তার জন্যে একটি দরজা খুলে দাও, আর তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এরপর জান্নাতের নেয়ামতরাজি ও সুবাস তার কাছে আসতে থাকবে।"[২৮০]

আর যারা উত্তর দিতে পারবে না? তাদের জন্যে বলা হবে:

"সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্যে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, এবং জাহান্নাম অভিমুখে একটি দরোজা খুলে দাও। এরপর জাহান্নামের উত্তাপ ও অগ্নিশিখা তার কাছে আসতে থাকবে।"[২৮৭]

পৃথিবীপরবর্তী আসল জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই কেউ আদৃত হবে, আর কেউ শাস্তি পাওয়া শুরু করবে! যাঁরা আদৃত হবে, তাদের কাছে জান্নাতের মনমাতানো সুবাস চলে আসবে কবরস্থিত হওয়ার সময় থেকেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই যে এতক্ষণ আমরা আল্লাহপ্রদত্ত ঘ্রাণের গল্প নিয়ে মেতে থাকলাম, আমরা কি সেই ঘ্রাণে নাক ডোবানোর মতো উপযুক্ত হবার চেষ্টা করি? উঠোনে বেলিফুলের ঝাড়টাতে কত পরিচর্যা করি, জলসিঞ্চন করি, নিড়ানি দিয়ে আগাছাও পরিষ্কার করি। নাগকেশরের ঝোপে খুব বেশি ধুলোবালি জমা হয়ে গেলে পানি ছিটিয়ে পরিষ্কার করে ফেলি। কেন? ফুলগুলোর ঘ্রাণ আমার ভীষণ পছন্দের, তাই এই পরিশ্রমগুলো করি, প্রতি বছর যেন ঠিকঠাক সুবাস দিয়ে আমাকে মাতিয়ে রাখতে পারে, উঠোনের সৌন্দর্যকে সজীব রাখতে পারে। জান্নাতের ঘ্রাণও তো আমি পছন্দ করি! শুধু কি পছন্দ? আমি তো সেই ঘ্রাণে মাতোয়ারা হবার স্বপ্নও দেখি! তাহলে আমাকেও ঈমানের বৃক্ষটা যত্ন নিতে হবে ততোধিক পরিশ্রমে, ততোধিক পরিচর্যায়, ততোধিক নিবিষ্টতায়। আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিন। তোমাকেও!

কাঁঠালচাঁপার অদূরে বাতাবি নেবুর গাছেও ফুল এসেছে। কী অসাধারণ সে ঘ্রাণ! বাতাবি নেবুকে অনেক অঞ্চলে আবার 'জাম্বুরা' বলে ডাকে। জাম্বুরার কোয়া একত্র করে নুন-মরিচ দিয়ে মেখে খাওয়ার মজাই আলাদা! কিছুটা টক, কিছুটা মিষ্টি, সঙ্গে একটু ঝাল যোগ হলে কী দারুণ স্বাদই না হয়! কোয়াগুলো কেটে বের করার পর খোসা নিয়ে বাড়ির পিচ্চি-পাচ্চাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়। ওটা মাথায় দিলে টুপির মতো দেখায়। তোমরা যারা শহরে বড়ো হয়েছো, তারা ফুটপাত থেকে জাম্বুরার ভর্তা কিনে খেয়েছো বটে, কিন্তু গাছপাকা জাম্বুরার গন্ধ শুঁকতে পারোনি! বাতাবি নেবু তো বটেই, বাতাবি নেবুর ফুলেও কিন্তু দারুণ ঘ্রাণ! এই ফুলের ঘ্রাণ ছাড়া বসন্ত অসম্পূর্ণ! কবি সুফিয়া কামালের কবিতায়ও তাই বাদ যায়নি বাতাবি নেবুর ফুল:

"বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"

দখিনা বাতাসের ভেলায় চড়ে শুধু বাতাবি নেবুর ফুলই নয়, আরও অনেক ফুলের ঘ্রাণই ভেসে আসছে। গন্ধরাজের কথা তো আলাদা করে বলার প্রয়োজনই নেই। সাদা গোলাপের সাথে রূপ ও সৌরভ দু ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সক্ষমতা রাখে সে। লেখকের বাড়ির বাগানে গন্ধরাজের গাছ মরে গিয়েছিল। তিনি কালবিলম্ব না করেই বাবাকে সাথে নিয়ে একই জায়গায় সে ফুলের গাছ লাগিয়েছেন আবার। কারণ, এই ফুলের আরবি নাম غاردينية ياسمينية (গার্দিনিয়া ইয়াসমিনিয়া), আর এই নামের শেষাংশটা তার আম্মুর নামের সাথে মিলে যায়। তাই ফুলটার প্রতি আলাদা একটা টান তৈরি হয়েছে আপনাতেই।

গন্ধরাজের নামে তো মাত্র একটা অংশ মিলছে, পুরো নামটাকেই ধারণ করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আছে জুঁই ফুল। 'জুঁই'কে আরবি ও উর্দু দুই ভাষাতেই ياسمين (ইয়াসমিন) বলা হয়। আর তাই এত এত সৌরভ ছড়ানো কিংবা এতবেশি সৌন্দর্য বিলানো সব অভিজাত ফুলকে বাদ দিয়ে লেখকের কাছে 'জুঁই' ফুলটাই প্রিয় হয়ে বসে আছে। শুধু তাই না, তার কাছে ইন্দোনেশিয়া ও তিউনিসিয়া দেশ দুটোও খুব প্রিয়, কারণ এই দুটো দেশ জুঁই ফুলকেই তাদের জাতীয় ফুল বানিয়েছে।

এটা মায়ের প্রতি ভালোবাসার খুব ছোট একটা বহিঃপ্রকাশ। আমাদের সালাফ (পূর্বসূরি)-গণ মায়ের প্রতি কত বেশি দরদমন্দ ছিলেন, মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনে কত বেশি সচেতন ও সজাগ ছিলেন, সেসব ভাবতে গেলে নিজেদেরকে খুব তুচ্ছ মনে হবে আমাদের।

হাদীসের ছাত্রদের কাছে কাহমাস ইবনুল হাসান খুব পরিচিত নাম। দরসগাহে 'হাদ্দাসানা'র সুরে কতবার কাহমাসের নাম শোনেন তাঁরা! সেই কাহমাস হাদীস চর্চায় যেমন নিবেদিতপ্রাণ ও বিশ্বস্ত[২৮৮] ছিলেন, মায়ের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য। একদিন তিনি একটা বিষাক্ত বিচ্ছু দেখে সেটাকে হত্যা করতে চাইলেন। বিচ্ছুটা তার আগেই একটা গর্তে ঢুকে গেলো। তিনি গর্তের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে রাখলেন। বিচ্ছুটা তাকে দংশন করলো। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কেন এমনটি করলেন? তিনি বললেন: ভয় হচ্ছিল, যদি বিচ্ছুটা গর্ত থেকে বেরিয়ে কোনোভাবে আমার মাকে দংশন করে বসে![২৮৯]

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার আরেকজন বিখ্যাত রাওয়ী। সমকালে বসরা শহরে তাঁর মতো অধিক হাদীস মুখস্থ কারোরই ছিলো না। এজন্যে তাঁকে 'বুনদার' (بندار) বলা হয়। মূল নামের চেয়ে এই নামেই তিনি বেশি পরিচিত।

বুনদার এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার অনেক বেশি সম্পদ গচ্ছিত থাকে। হাদীসের সম্পদে তিনি তাঁর সময়ে ও তাঁর শহরে সবচে' প্রাচুর্যশালী ছিলেন, তাই তাঁকে এ নামটি দেয়া হয়েছিলো।[২৯০]

কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে, সেসময়কার অন্যান্য রাওয়ী ও হাদীসবিশারদের মতো তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্যে বসরা'র বাইরে যাননি। কারণ তাঁর মা শহরের বাইরে কোথাও বেরোবার অনুমতি দিতেন না। তিনি বলছেন:

أردت الخروج -يعني الرحلة- فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه

"আমি (হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশে) বাইরে যেতে চাইলাম, কিন্তু আমার মা নিষেধ করলেন। আমি তাঁর আনুগত্য করলাম। এতেই আল্লাহ আমাকে বরকত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিয়েছেন।"[২৯১]

মায়ের প্রতি যত্ন ও ভালোবাসা, মায়ের কথা ও আদেশের প্রতি আনুগত্য; কোনোদিক থেকেই আমরা কাহমাস কিংবা বুনদার ﵀-এর কাছাকাছি হয়তো পৌঁছতে পারবো না। কিন্তু চেষ্টা তো করতে পারি! জ্ঞানে-গুণে তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্ব আর বিশ্বজোড়া খ্যাতি এমনি এমনি অর্জিত হয়নি। নিজেদের চেষ্টা-সাধনায় যেমন কোনো কমতি করেননি, আল্লাহর দয়া ও রহমতপ্রাপ্তির কোনো দরজাতেই কপাট ভেজাতে দেননি। মায়ের অন্তর-নিঃসৃত দু'আ তাঁদের জন্যে আল্লাহর দয়া নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়েছিলো। মায়ের সেবা-যত্ন তাঁদের জীবনে যেমন এনেছিলো, আর ওদিকে সাহাবি হারিসা বিন নু'মানকে তো জান্নাতেই পৌঁছে দিয়েছিলো।

একটা হাদীস[২৯২] লক্ষ করি:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نِمْتُ ، فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَذَلِكَ الْبِرُّ ، كَذَلِكَ الْبِرُّ " . وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "আমি ঘুমালাম। স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে কুরআন পাঠ করতে শুনলাম। বললাম: কে ইনি? ফেরেশতাগণ বললেন: ইনি হারিসা বিন নু'মান। (মায়ের প্রতি) সদাচার ও আনুগত্যের প্রতিদান এমনই হয়, সদাচার ও আনুগত্যের প্রতিদান এমনই হয়।" আর তিনি (হারিসা) ছিলেন মায়ের প্রতি অত্যধিক অনুগত ও সদাচারী।

আরেক সাহাবি ইবনু 'উমার ﵁ মায়ের প্রতি সদাচারকে এতটাই উঁচু দৃষ্টিতে দেখতেন যে, তপ্ত রোদের মধ্যে সুদূর খোরাসান থেকে পিঠে বয়ে মাকে মক্কায় নিয়ে আসা ব্যক্তিকেও বলেছেন: তুমি মায়ের হক আদায় করতে পারোনি। আরেকদিনের ঘটনা। ইবন 'উমার ﵁ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। দেখলেন, একজন ইয়ামানী লোকও তাওয়াফ করছেন। লোকটির মা অতিশয় বৃদ্ধা ছিলেন। নিজে হেঁটে তাওয়াফ করবেন, সে সাধ্য তাঁর ছিলো না। লোকটি পিঠের ওপর মাকে বহন করে তাওয়াফ করছিলেন আর আবৃত্তি করছিলেন:

إني لها بعيرها المذلل * إذا الركاب نفرت لا أنفر

ما حملت وأرضعتني أكثر * ربِّي ذو الجلال أكبر

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"আমার মায়ের বাহন তো নেই, আমিই বাহন অনুগত তাঁর
পালাবো না আমি, যদিও পালায় বাহন না পেরে সওয়ারের ভার
আমাকে জঠরে ধারণ করতে এবং করাতে দুগ্ধ পান
যত ক্লেশ তার হলো, তার বেশি প্রতিদান দিক মেহেরবান।"

এরপর লোকটি ইবন 'উমার ﵁-কে বললেন: "আমার জন্যে মা যত কষ্ট করেছেন, আমি কি তার বিনিময় দিতে পারছি? আপনার কী মনে হয়?"

ইবন 'উমার ﵁ বললেন: "না, এককোঁটাও না!"[২৯৩]

আরেকজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ মানসূর ইবনুল মু'তামির মায়ের সাথে কখনো উঁচু গলায় কথা বলতেন না। মা খুব বকাবকি করলেও তিনি মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। মায়ের সাথে কথা বলা অবস্থায় মানসুরকে যদি অচেনা কেউ দেখতো, তাহলে ভাবতো, মানসুর বুঝি রুগ্‌ণ! এতটাই নরম ভাষায় তিনি কথা বলতেন। তাঁর মা যতো কঠিন ভাষায় বকাঝকা করতেন, মানসূর ততোধিক নম্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাতেন। বাকর ইবন 'আইয়াশ এরকম একদিনের ঘটনা বলতে গিয়ে বলেছেন: মায়ের তীব্র বকুনি শুনেও মানসূর চোখ তুলে তো তাকাননি বটেই, এতটাই নিচু হয়ে ছিলেন যে, তাঁর দাড়িগুলো বুকের সাথে লেপ্টে রেখেছেন।[২৯৪]

আমরা যেকোনো মুহূর্তেই মায়ের সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে পারি তো?

এবার একটা দৃষ্টিনন্দন ফুলের গল্প বলা যাক। এই ফুলে খুব ঘ্রাণ নেই বটে, কিন্তু দেখতে ভীষণ সুন্দর। নামটাও একটু অবাক করার মতো। মোরগ ফুল! দূর থেকে তাকালে মোরগের লাল ঝুঁটির মতো দেখায়, এজন্যে এমন নাম। অথবা মোরগের যে কয়টা পালক পেছন দিকে লেজের মতো ঝুলতে থাকে, সেগুলোর সাথেও তুলনা দেয়া যেতে পারে। ফুলটা ধরতে গেলে কিছুটা খসখসে। হাতে নিলেই ফুলের ভেতর থেকে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার দানা ঝরে পড়তে থাকে। দাদুর হাতে হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়া তসবি থেকে যেভাবে অনবরত দানা পড়ে।

সুবাসপ্রিয়তার প্রসঙ্গ এলে গাঁদা ফুলের কথা একটু আলাদা করেই বলতে হয়। বাড়িতে কেউ বাগান করেছে, আর গাঁদা ফুলের দুয়েকটা গাছ তাতে নেই, এমনটা কখনো হয় না। আমাদের বাগানে গাঁদা ফুল অবশ্য শীতেই ফুটেছে। এখনও কিছু গাছে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতেই রয়ে গেছে তারা। সুবাস বিলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জাতীয় কবি এই ফুলটাকে কত পছন্দ করতেন, তা তো তাঁর লেখাতেই স্পষ্ট:

"হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে, নইলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল।"[২৯৫]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কবির পছন্দের ব্যাপার যেহেতু এলো, এই ফাঁকে আরেকজন মানুষের পছন্দের কথাও বলে ফেলি। কখনো কি ভেবে দেখেছো, আমাদের প্রিয় নবিজি ﷺ-এর কাছে কোন ফুলটা বেশি পছন্দনীয় ছিলো? তিনি তো সৌন্দর্য ভালোবাসতেন, ঘ্রাণও পছন্দ করতেন! তাঁর কাছেও একটা ফুল খুব প্রিয় ছিলো। একটু আগেই আমরা যে ফুলটার কথা বলেছি, জান্নাতে সবচে' বেশি সুবাস ছড়াবে যে ফুল, সেটাই ছিলো তাঁর প্রিয়। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, মেহেদী ফুল! রাসূলুল্লাহ ﷺ মেহেদী ফুলের মঞ্জরি থেকে উদ্ভূত ঘ্রাণ (فاغية) ভীষণ পছন্দ করতেন। হাদীসে এসেছে, এই সুগন্ধি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুব মুগ্ধ করতো।[২৯৬]

সূর্যমুখী ফুলটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম! দেখতেও সে সূর্যের মতো, মুখটাও সূর্যের দিকেই ফিরিয়ে রাখে সে! মাঝখানে ফুলের বৃন্তটা যেন উদীয়মান কোনো সূর্য, আর চারপাশের পাপড়িগুলো যেন সদ্য ছড়িয়ে যেতে শুরু করা দীপ্যমান সূর্যকিরণ। সারিবদ্ধ সরু গাছের আগায় ফোটা ফুলগুলো বাতাসের সাথে যখন দোল খায়, তখন মনে হয়, ওরা সবাই মিলে হাত নেড়ে পুষ্পরাজ্যে স্বাগত জানাচ্ছে আমাকে। আজকে খেয়াল করলাম, ফুলটার দিকে তাকালেই একটা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা কল্পনা করা যায়। বুঝি-বা দেড় বছর বয়সি একটা চপল শিশু হাত-পা ছুড়ে মনের সুখে হেসে যাচ্ছে। এই নিষ্পাপ হাসির জন্যে শিশুটা সবার কাছেই আদরণীয়, এই নিখাদ হাসির জন্যে সূর্যমুখী সবার কাছেই প্রিয়। হাসিমুখে কথা বলা মানুষও সবার কাছে ভীষণ আপন। হাসিমুখে থাকা, হাসিমুখে কথা বলা শুধু কি মানুষের কাছেই আদরণীয়? না, আল্লাহর কাছেও সে আদরণীয়। একটা হাসিও কিন্তু আমাদের জন্যে নির্ধারিত মিযানে পুণ্যের পাল্লাকে ভারী করতে পারে। প্রিয় নবিজি ﷺ বলেছেন:

لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

"কোনো পুণ্যকাজকেই ছোট করে দেখো না। এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করা হলেও।"[২৯৭]

কী সুন্দর কথা!

একটা হাসি কিন্তু মানুষের মন ভালো করে দিতে পারে। আবার একটা হাসিই ভারাক্রান্ত মানুষকে নির্ভার করে তোলে নিমেষের মধ্যে। একটা হাসিই অনেকসময় দীর্ঘকালীন মনোমালিন্যের ইতি টেনে দেয় সুন্দরভাবে। সেজন্যেই হাসিমুখে কথা বলার জন্যে আল্লাহর কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি নিজেও কিন্তু সব সময়ই হাসিমুখে কথা বলতেন। তবে তিনি গগনবিদারী অট্টহাসি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিতেন না, সুন্দরভাবে মুচকি হাসি দিতেন। উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (র) বলছেন:

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم

"আমি নাবি ﷺ-কে কখনো এমনভাবে অট্টহাসি দিতে দেখিনি, যে হাসির কারণে তার আলজিহ্বা দেখা যাবে। তিনি শুধুই মুচকি হাসতেন।"[২৯৮]

খেয়াল করলে দেখবে, অট্টহাসি দেয়ার সময় মানুষের মুখাবয়ব কেমন একটা বিচ্ছিরি রূপ ধারণ করে। মুচকি হাসি দিলে যে-কাউকেই অসম্ভব সুন্দর দেখায়। সে-হাসিতে একটা শীতল ছায়া থাকে, যে ছায়ায় নিখাদ প্রীতি ও ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে, স্নিগ্ধ করে রাখে চারপাশের মানুষগুলোকে। চলো, আমরাও সূর্যমুখীর মতো মুচকি হাসিতে অভ্যস্ত হই। আল্লাহর কাছেও পুরস্কার পেলাম, রাসূলুল্লাহর সুন্নাহও পালন হলো, মানুষের সাথে প্রীতির বন্ধনটাও সজীব হলো! একটা কাজে তিনটা লাভ। একের ভেতর তিন, মুচকি হাসি প্রতিদিন!

সূর্যমুখী ফুল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকলেও একটা ফুল কিন্তু সূর্যালোক সহ্যই করতে পারে না। বসন্তের গল্পে এই ফুলটা প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ এটা শরৎকালে ফোটার ফুল। তবে সূর্যমুখীর বিপরীত বৈশিষ্ট্য ধারণকারী হিসেবে এই স্থানে ফুলটার গল্প করা প্রাসঙ্গিক। সূর্যকিরণে এই ফুলটি একদম ঝিমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হয় সে। নামটাও সন্ধ্যার সাথে সম্পর্কিত: সন্ধ্যামালতি! একটা গাছেই এত রঙের ফুল একসাথে ফোটার দৃশ্য সন্ধ্যামালতি ছাড়া আর কোনো গাছে দেখা মেলে না। আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একটা চমৎকার নিদর্শন এই ফুলগুলো। সাদা, কমলা, হলুদ, গোলাপি, লাল—কত বর্ণের ফুল একটা গাছেই! আমরা যেমন নানা রং ও বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বান্দা হিসেবে একই পৃথিবীর ছায়ায় দিনাতিপাত করি, সন্ধ্যামালতিরাও বিভিন্ন রঙের ফুল হয়ে একই গাছে ফুটে থাকে। সাদা ফুলটা হলুদ ফুলটাকে অবজ্ঞা করে না, কমলা রঙের ফুলটা লাল রঙের ফুলকে কটু কথা বলে না, মিশ্র বর্ণের ফুলটা দূরে ঠেলে দেয় না গোলাপি রঙের ফুলকে। আমরাও তো এমনই! হাজ্বের সময় দেখোনি? কালো, সাদা ও বাদামি রঙের কোনো ভেদ নেই, সবাই এক আল্লাহর বান্দা হয়ে এক আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করার জন্যে একই সাথে তালবিয়া ধ্বনি উচ্চকিত করছে! কত সুন্দর আমাদের দীন! কী নয়নজুড়ানো দৃশ্য! সন্ধ্যামালতির চেয়ে সেই দৃশ্য কোনো অংশেই কম দৃষ্টিনন্দন নয়।

সন্ধ্যামালতি গাছে একই সাথে অনেক রঙের ফুল, আবার এমন একটা ফুল আছে, যার একার গায়েই কয়েকটা রঙ আছে। ঠিক ধরেছো, কাঠগোলাপের কথাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলছি! মোলায়েম শরীর তার। শুধু কাঠগোলাপ নয়, সব ধরনের গোলাপই ভীষণ মোলায়েম। যে বসন্তকে নিয়ে আমাদের গল্প বলা, তাকে বলা হয় ঋতুরানি। আর গোলাপ হলো ফুলের রানি। এক রানিকে নিয়ে গল্প করতে গিয়ে আরেক রানিকে বাদ দেয়া মোটেও সমীচীন হবে না। দুজনের মাঝে আবার সম্পর্কটাও খুব ভালো। ঋতুরানিকে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ফুলের রানি বরাবরই এগিয়ে থাকে।

সৌন্দর্যপিয়াসি মানুষমাত্রই রক্তগোলাপের অনুরক্ত। শুধু রক্তলাল গোলাপ নয়, অনেক রঙের গোলাপই আমরা দেখে থাকি। এই গোলাপ ফুলের গাছগুলো কিন্তু কাঁটায় ভরা। কাঁটার মধ্যে থেকেই সে তার রূপ ও সৌরভ ছড়িয়ে যেতে থাকে। কাঁটা নিয়ে তার কোনো অভিযোগও নেই। মুমিন জীবনের সাথে গোলাপকে মিলিয়ে দেখা যায়। গোলাপ যেমন কাঁটার অস্তিত্ব মেনে নিয়েই বিরামহীন ঘ্রাণ ও সৌন্দর্যের জোগান দিয়ে যায়, একজন মুমিনও সব ঘাত-প্রতিঘাত সঙ্গে নিয়েই জীবনফুলের পাপড়ি প্রস্ফুটিত করতে থাকে।

তন্ময় হয়ে থাকার মতো আরেকটা ফুল আছে, নাম তার কামিনী। একটা যামিনী সুবাসিত করার জন্যে কয়েকটা কামিনীই যথেষ্ট। কী মোহময় তার ঘ্রাণ! এটাকে বসন্তের সাথে নির্দিষ্ট করা যায় না। আমার দেখা যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে এই ফুলটা প্রায় সারাবছরই ফোটে। কামিনী ফুল সৌরভ ছড়াতে শুরু করে সন্ধ্যা এলে। রজনিগন্ধা ফুলও একই কাজ করে। দিনের বেলা সে মোটেই সুবাস ছড়াবে না, সব জমা করে রাখবে রাতে ছড়ানোর জন্যে। কিংবা হাসনাহেনার কথাই ধরি! সেও কিন্তু রাত বাড়ার সাথে সাথে তার ঘ্রাণ ছড়ানোর মাত্রা বাড়াতে থাকবে।

এবার এমন একটা ফুলের গল্প হোক, যে ফুল কয়েকটা ভাষায় একই নাম ধারণ করার দুর্লভ কৃতিত্ব নিয়ে আছে। এই ফুলের নাম নার্গিস। উর্দু আর ফার্সিতেও একে 'নার্গিস' (نرگس) বলা হয়। আরবিতে ফুলটাকে বলা হয় 'নার্জিস' (نرجس)। মিশরীয় আরবিতে 'জীম' বর্ণকে বাংলা বর্ণ 'গ'-এর মত উচ্চারণ করা হয়। যেমন: কথাসাহিত্যিক নাজীব মাহফুযকে (نجيب محفوظ) মিশরে বলা হয় নাগীব মাহফুয। এই বইয়ের লেখককেও তার মিশরীয় বন্ধুরা নাগীব বলে ডাকে। সে হিসেবে 'নার্জিস' কিন্তু মিশরীয় আরবিতে 'নার্গিস'ই হয়ে যায়। তাহলে বাংলা, উর্দু, ফার্সি ও আরবিতে নামটা সমান পাওয়া গেলো। ইংরেজিতেও কাছাকাছি উচ্চারণের একটা নাম দেয়া হয়েছে তাকে। নামটা হলো 'নার্সিসাস'। এতগুলো ভাষায় ফুলটা এক নামেই রয়ে গেছে! এমন ভাগ্য আর কোনো ফুলের কপালে জুটেছে কি না, জানা নেই।

বাংলা সাহিত্যে ফুলটা খুব বেশি আলোচিত নয়। আরবি সাহিত্যে মোটামুটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেখা মেলে তার। ইংরেজি সাহিত্যে কিন্তু অনেক বেশি উচ্চারিত হয় সে। মাধ্যমিকের ইংরেজি প্রথম পত্র (কলেজ ও মাদরাসা উভয়) বইয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা I Wandered Lonely As a Cloud সবারই পড়া আছে। কবিতাটি মূলত ড্যাফোডিল ফুলকে ঘিরে আবর্তিত, সেজন্যে কবিতাটির অন্য নাম Daffodils। এই ড্যাফোডিল মূলত নার্সিসাস ফুলেরই একটা প্রকরণ। আমাদের দেশে যে নার্গিস ফুলটা দেখা যায়, সেটা সাদা বর্ণের। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় উল্লিখিত ড্যাফোডিল হলুদ বর্ণের। বর্ণে ভিন্নতা থাকলেও দুটো মূলত একই প্রজাতির ফুল। সাদা গোলাপ ও লাল গোলাপের মধ্যে যে পার্থক্য, নার্গিস ও ড্যাফোডিলের পার্থক্য অতটুকুই। এই ফুলকে নিয়ে আরও অসংখ্য কবিতা লেখা হয়েছে। এসব কবিতার মধ্য থেকে ইংরেজি সাহিত্যামোদীদের কাছে রবার্ট হেরিক-এর To Daffodils [২৯৯] খুবই বিখ্যাত। বসন্তের গল্পে এই কবিতার শেষার্ধ খুব প্রাসঙ্গিক। এই কবিতায় ব্যবহৃত সব 'মেটাফোর'ই খেয়াল করার মতো। স্বল্পায়ু জীবন ও ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর যে বাস্তব চিত্র ড্যাফোডিলকে অবলম্বন করে তিনি এঁকেছেন, তা নেহাত চিন্তাস্পর্শী। পঙ্‌ক্তিগুলো[৩০০] অনুবাদের চেষ্টা করা যেতে পারে:

"তোমার মতো আমাদেরও তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়
বসন্ত ঋতু যেমন অল্পকাল থেকে চলে যায়, আমরাও তেমনই!
মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্যেই আমাদের দ্রুত বেড়ে ওঠা
তুমিও এভাবেই চলে যাও। শুধু তুমি নও, পৃথিবীর সবকিছুই।
আমরা মৃত্যুবরণ করি
যেভাবে তোমার সময়গুলো ফুরিয়ে যায়, তুমিও শুকিয়ে যাও
গ্রীষ্মকালের বৃষ্টি যেমন শুরু হবার আগেই থেমে যায়!
অথবা আমাদের জীবন মুক্তোদানাতুল্য শিশিরফোঁটার মতোই—
সকালবেলা যে শিশিরফোঁটা দেখা যায়
সকালের পরে কখনোই দেখা যায় না তাকে।"

ইংরেজি সাহিত্যের কবিদের যে ফুল মোহাচ্ছন্ন করে রাখতো, রবার্ট হেরিকও সে ফুলেই বিমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু এই মোহাচ্ছন্নতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। কিছুদিন পরেই ড্যাফোডিল শুকিয়ে যায়। ঝরে পড়ে যায়। বসন্তের এই রূপ-মাধুরীও খুব বেশিদিন থাকে না। বড়জোর দুমাস কিংবা তার কিছু কম-বেশি। এরপর বসন্তকেও বিদায় নিতে হয়। যেন প্রকৃতির এসব অমোঘ নিয়ম আমাদেরকে নিজের জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরাও খুব অল্প সময়ের জন্যে পৃথিবীতে আসি, ক্ষণকাল পরেই বিদায় নিই। কবি গ্রীষ্মকালের দমকা বৃষ্টির সাথে এই স্বল্পায়ু জীবনের তুলনা দিয়েছেন। হঠাৎ করেই বৃষ্টির ঝাপটা আসে, হঠাৎ করেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থেমে যায়। এক্ষুনি ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, এক্ষুনি আবার রোদ। শিশিরকণার সাথেও মিল আছে আমাদের জীবনের। ভোরবেলা কচি ঘাসের ডগায় মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে যে শিশিরফোঁটা, রোদ ওঠার সাথে সাথে তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না আর। এই যে মুহূর্তের পরিবর্তন, মুহূর্তের বিদায়, এ-ই তো জীবন! ড্যাফোডিলের বিদায় দেখে কবি প্রকৃতি থেকে আরও কিছু মেটাফোর নিয়ে এসে সে কথাটাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পার্থিব জীবনের যে 'Simile' কুরআন আমাদেরকে দিয়েছে, সেটা তো আরও জীবন্ত! কুরআনের ভাষাতেই শোনা যাক:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

"তাদের সামনে পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করুন। সেই বৃষ্টির মতো, যা আমরা আকাশ থেকে বর্ষণ করি, তারপর পৃথিবীর উদ্ভিদ-তরুতে মিশে যায়, (এরপর তা সবুজ-সতেজ হয়ে ওঠে,) অতঃপর শুকিয়ে যায় এবং বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।"[৩০১]

একটা গাছ কল্পনা করি। এই গাছের সব পাতা ঝরে গেছে। বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে গাছটি পত্রপল্লবে আবার সুশোভিত হয়ে উঠলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার পাতাগুলো শুকিয়ে গেলো। শুকিয়ে তো গেছেই, ঝরে পড়া পাতাগুলো সেখানে স্থির থাকলো না। বাতাসের টানে দূরে উড়ে গেলো, চলে গেলো দৃষ্টিসীমার বাইরে। পৃথিবীর জীবন তো এটাই!

আমাদের চোখের সামনেই কিন্তু এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। প্রকৃতির যে সজীবতা এখন আমরা দেখছি, কদিন পরেই সেটা আর দেখা যায় না। ফুলে-ফলে ভরে ওঠা চারপাশ হঠাৎ করেই খরতাপে পুড়ে যায়। গানে আর ঘ্রাণে মুখরিত বসন্ত হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায়। আমাদের জীবনটাও তো এমনই। একে তো ক্ষণস্থায়ী, তার ওপর আবার অনিশ্চিত। বোধগম্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য একটা উদাহরণ পেশ করে যেন-বা আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন, যে সবুজতার কোনো স্থায়ীত্ব নেই, সেই সবুজতায় মজে থাকারও মানে নেই। যে সজীবতা চোখের পলকেই অদৃশ্য হয়, সে সজীবতায় ডুবে থেকে দীর্ঘস্থায়ী জীবনকে ভুলে থাকার কোনো অর্থ নেই।

কুরআনে আরেকটা জায়গায় আমাদের রব্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন[৩০২]:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"তুমি কি দেখতে পাও না—আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, সেই পানি পৃথিবীর ঝরনাগুলোতে প্রবাহিত করেন, আবার তা দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন। একসময় তা শুকিয়ে যায়, তোমরা তাকে হলুদাভ দেখতে পাও। তারপর আল্লাহ এসবকিছুকে খড়কুটায় পরিণত করে দেন। এই উপমায় বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।"

এই দৃশ্যটা আমাদের মতো নাতিশীতোষ্ণ ও কৃষিপ্রধান ভূখণ্ডে বসবাসরত মানুষদের জন্যে বোঝা একেবারেই সহজ। একটা ধানখেতের কথাই ধরা যাক। চারা রোপণের পর থেকে ধীরে ধীরে যখন ধানগাছ হয়ে ওঠে, তখন পুরো মাঠ সবুজের চাদরে ঢেকে যায়। একসময় সবুজ শিষে ধানের ছড়া সৃষ্টি হয়। ধান পাকার পর ধীরে ধীরে শিষগুলো হলুদ বর্ণ ধারণ করতে শুরু করে। ধান কাটার পর কী দেখি? একসময়কার সবুজ সতেজ শিষগুলোই হয়ে যায় খড়কুটো। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানেই প্রাণবন্ত সবুজ পরিণত হয় প্রাণহীন হলুদে! এই উপমা প্রয়োগ করার পর আল্লাহ বলছেন, বুদ্ধিমানরা এখান থেকে শিক্ষা নেবে। কাজেই, আমরা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকি, যদি নিজেদেরকে বোকা না বানাতে চাই, তাহলে আল্লাহর প্রয়োগকৃত উপমাটি নিয়ে চিন্তা করা নেহাত জরুরি! জীবনের রূপ-রস ও খ্যাতি-যশ যখন প্রমত্তা নদীর মতো খরস্রোতা, সময়ের মাঠ যখন সবুজে ভরপুর, তখন যদি আমরা ধরে নেই, এই ভরা তটিনীতে কখনো চর জাগবে না, এই সবুজ কখনো হলুদাভ হবে না, তাহলে চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যদি তার ক্ষণস্থায়িত্ব মাথায় রেখে দীর্ঘস্থায়ী সবুজের জীবন নিশ্চিত করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারি।

পার্থিব জীবনের 'মেটাফোর (Metaphor)' এবং 'সিমিলি (Simile)' কুরআনে কেমন এসেছে, তা তো জানা হয়ে গেলো। প্রিয় নবিজি ﷺ কীভাবে এই জীবনকে তুলনা করেছেন, তা-ও একটু জানা হয়ে যাক!

'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ একদিন দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চাটাই বিছিয়ে শুয়ে আছেন, তাঁর দুই কাঁধে চাটাই'র দাগ বসে গেছে। 'উমার বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এরচেয়ে ভালো কোনো বিছানায় শুতে পারেন! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবীর সাথে তাঁর সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন কী অসাধারণ উপমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাধ্যমে! তিনি ﷺ বলেছেন:

ما مثلي و مثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح و تركها

"পৃথিবীর সাথে আমার সম্পর্কের উদাহরণ সেই আরোহী মুসাফিরের মতো, যে কিনা এক রৌদ্রমুখর দিনে ভ্রমণে বের হয়, তারপর দিনের কিছুটা সময় একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, এরপর আবার পথ চলতে শুরু করে এবং বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়।"[৩০৩]

উদাহরণটা কত সুন্দর! দূরাচারী এক পথিক রৌদ্রতপ্ত দিনে মেঠো পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে। পথিমধ্যে যখন ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করেছে, অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক বটবৃক্ষের ছায়ায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলো। বেশিক্ষণ বিশ্রামের সুযোগ তার নেই। গন্তব্যে পৌঁছতে হলে বেলা পড়ার আগেই রওনা হয়ে যেতে হবে। তারপর পথিক আবার হাঁটা শুরু করলো। অল্প সময় যে বটবৃক্ষের ছায়ায় সে ছিলো, তার দিকে ফিরে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই। পথিকের একমাত্র লক্ষ্যস্থল এখন তার গন্তব্য। পৃথিবীটা সেই বটবৃক্ষের মতোই, যার ছায়ায় অল্প কিছুক্ষণ আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি মাত্র। সময় ফুরিয়ে আসার সাথে সাথে এই বৃক্ষছায়ার সরাইখানা থেকে আমাদেরকে সরে যেতে হবে। সেই পথিকের মতোই আমাদেরকে চলতে হবে আখিরাতের জীবনের পানে। ক্ষণিক সময়ের এই বিশ্রামাগারকে আয়েশী জীবনের হেরেম মনে করা একেবারেই বোকামো।

নবিজি ﷺ অল্প কথায় কত চমৎকার বার্তা দিতে পারেন, তার আরেকটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। এই হাদীসেও[৩০৪] অনন্যসাধারণ একটা 'মেটাফোর' দেখতে পাবো আমরা।

ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل رجل إصبعه في البحر ثم يخرجها فبم يرجع؟

"আখিরাতের তুলনায় পৃথিবীর মূল্য কেমন, তার উদাহরণ হচ্ছে: এক লোক সাগরের পানিতে আঙুল চুবালো। তারপর আঙুলটা পানি থেকে বের করে আনলো। লোকটি কতটা পানি নিয়ে আসতে পারবে?"

কী অসাধারণ রূপকশৈলী তাঁর! আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন যে কতটা হালকা ও ওজনহীন, কত কম মূল্য তার, সে কথা বোঝানোর জন্যে একটি উদাহরণ এনেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। কখনো যদি কক্সবাজার বা কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে যাও, তাহলে পরীক্ষা করে দেখো। সমুদ্রের পানিতে একটা আঙুল চুবিয়ে বের করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আনো। তারপর দেখো, কয় ফোঁটা পানি তোমার আঙুলে এসেছে। এক ফোঁটাও না! আঙুলটা সামান্য সময়ের জন্যে ভিজেছে, এটুকুই! এই যৎসামান্য জলবিন্দু, যা এক ফোঁটারও সমান নয়, সেটাই পৃথিবীর জীবন। আর সমুদ্রের বুকে আদিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি হলো আখিরাতের জীবন! অর্ধফোঁটার সমতুল্য জীবন নিয়ে আমরা সমুদ্রতুল্য জীবনকে ভুলে আছি, কী বোকাই না আমরা!

নার্গিস ফুল দেখি আমাদেরকে অনেকদূর নিয়ে এসেছে! অন্য ফুলেরা রুষ্ট হবার আগেই তাদের নিয়ে গল্প শুরু করতে হবে। কোন ফুলটাকে দিয়ে শুরু করা যায়? নার্গিসের প্রতিদ্বন্দ্বী নিলুফারকে নিয়েই শুরু হোক।

এই ফুলটা কিন্তু সূর্যালোকের কোনো তোয়াক্কা করে না। সূর্যকিরণ পড়লো কি পড়লো না, তাতে তার কিছু যায় আসে না। ঘন বৃক্ষরাজিতে ঘেরা কোনো বদ্ধ ডোবা, যেখানে দিনের বেলায়ও রাতের ভূতুড়ে অন্ধকারের ছাপ থাকে, সেখানেও নিলুফার ফুটে থাকে। পানির ওপর ভাসতে থাকে, আমাদের দিকে হাসতে থাকে। এতক্ষণেও তাকে চিনতে পারলে না? বুঝেছি, ফুলটার বাংলা নাম বলতে হবে।

পদ্ম!

উরিব্বাস, এবার দেখি চিনে ফেলেছো! পদ্ম ফুলকেই ফার্সিতে 'নিলুফার' (نیلوفر) বলা হয়। ফার্সি ভাষায় নিলুফার মানে হলো ডানার পালক।[৩০৫] এই নামকরণ অনেকটাই অর্থবহ। খুব কাছে থেকে যদি পদ্মফুলকে দেখা যায়, তাহলে খেয়াল করে দেখতে পারো। পদ্মফুলের প্রতিটা পাপড়িকে আলাদা-আলাদাভাবে একেকটা পালক বলে মনে হয়!

নার্গিসের প্রতিদ্বন্দ্বী নিলুফার—আমরা এরকম একটা উক্তি করেছি কিয়ৎক্ষণ আগে। নার্গিস ও নিলুফার দুজন পিঠাপিঠি বোন, তাদের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়, আমরা এমন কিছু বোঝাইনি। আমাদের এই উক্তির প্রেক্ষাপট হলো একটা আরবি কবিতা, যেখানে কবি বলেছেন, তাঁর কাছে নিলুফার ফুলের সুগন্ধির তুলনায় নার্গিস ফুলের সুগন্ধি কিছুই না! নিলুফারের ঘ্রাণে তিনি এতটাই বিমোহিত যে, গোলাপের ঘ্রাণকেও তিনি গোনায় ধরেন না। এই কবির নাম ইবনুর রূমী।[৩০৬] কবির মুখেই শোনা যাক:

يرتاح للنيلوفر القلب الذي * لا يستفيق من الغرام وجهده

والورد أصبح في الروائح عبده * والنرجس المسكي خادم عبده [৩০৭]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"প্রচণ্ড ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গ প্রেমের ছোঁয়াতেও যে অন্তর জেগে উঠে না,
সে অন্তরও নিলুফার ফুলের সৌরভে বিমোহিত হয়ে যায়!
সুগন্ধি বিলানোর ক্ষেত্রে গোলাপ তো কিছুই না, নিলুফারের দাস মাত্র।
কস্তুরীর ঘ্রাণ মেশানো নার্গিস ফুলের কথা বলছো? সে তো নিলুফারের দাসের সেবক!"

কবির হৃদয়ে নিলুফারের ঘ্রাণ এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এই ঘ্রাণই তার কাছে সেরা ঘ্রাণ, এই ঘ্রাণ ব্যতিরেকে যত ফুলের ঘ্রাণ পৃথিবীতে আছে, কোনোটাই তাঁর কাছে ধর্তব্য নয়। মনমাতানো সৌরভ বিলানোর জন্যে বিখ্যাত যে গোলাপ, কবির নাসারন্ধ্রে সেই ফুলের ঘ্রাণও একেবারে নস্যি মনে হয়। সেজন্যে তাকে একেবারে নিলুফারের দাস বানিয়ে ছেড়েছেন। তাঁর সমসাময়িক অনেক কবির কবিতায় নার্গিস ফুলের ভূয়সী প্রশংসা এসেছে। কেউ যদি সেসব স্তুতিগাথা সামনে এনে কবিকে বিব্রত করতে চায়, তার জন্যেও অগ্রিম জবাব তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রথমে নিজেই নার্গিসের সৌরভকে কস্তুরীর ঘ্রাণের সাথে তুলনা করেছেন। এরপর চূড়ান্তভাবে নার্গিসকে ধুয়ে দিয়েছেন। শক্ত আছাড় দেয়ার আগে কিছুটা উপরে তোলা, ব্যাপারটা অনেকটা এমন। গোলাপকে তা-ও নিলুফারের দাস বানিয়েছেন, কিন্তু নার্গিসকে দাসের সেবক বানিয়ে ছেড়েছেন। যেন-বা কবি বলছেন, আমাকে মুগ্ধ করে রাখা নিলুফার ফুলের সামনে তোমাদের নার্গিস কিছুই না, এমনকি আমার প্রিয় ফুলটার দাস হবারও যোগ্যতা রাখে না সে!

এখানে একটা মজার বিষয় আছে। ইবনুর রূমী হলেন আব্বাসী যুগের কবি। এই যুগের অধিকাংশ কবিই রাজবন্দনায় মত্ত থাকতেন। আমির-ওমারাদের প্রশংসা ও স্তুতি রচনা করা, তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের কুৎসা রটনা করা—সিংহভাগ কবির অধিকাংশ কবিতা রচনার মূলসুর ছিলো এটাই। নিন্দা ও কুৎসা রচনাকে শিল্পিত পর্যায়ে নিয়ে এসে কবিতা চর্চার ধারা এতটাই শক্তিশালী ছিলো যে, সাধারণ কবিতাগুলোতেও তার ছাপ চলে আসতো। আমাদের এই কবিতাটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবলম্বন করে কবিতা রচনা করতে গিয়েও তিনি ফুলের সাথে ফুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ ফুটিয়ে তুলে তবেই ছেড়েছেন।

কবিরা কল্পনাপ্রিয়। রূপক, উপমা বা উৎপ্রেক্ষার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে মানবপ্রকৃতির বিভিন্ন দিককে মেলানোই তাদের স্বভাবজাত প্রকৃতি। তাছাড়া সাহিত্যে 'পারসনিফিকেশন' নামে একটি ধারণাও আছে, যেটা শব্দশিল্পীদের কল্পপ্রবণতার অন্যতম অনুঘটক এবং যাকে অবলম্বন করে এ ধরনের পদ্য বা গদ্য লিখিত হয়ে আসছে। ইবনুর রূমীর এই কবিতায় কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা নেই, নিতান্ত কিছু নৈসর্গিক চিত্রকে তিনি নিজের কল্পনার তুলি দিয়ে ভিন্নভাবে আঁকার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চেষ্টা করেছেন, তাই উদ্ধৃতাংশটি নির্দোষ ও অনাপত্তিকর।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, অন্যকে নিন্দা করে বা কুৎসা রটনা করে কবিতা রচনা করা একটি গর্হিত কাজ। ইবন হাজার আল-হাইতামী একে কবিরা গুনাহের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৩০৮]

আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো কাউকে নিন্দা করেননি, কাউকে কটু কথা বলেননি। আমাদেরও এ কাজ থেকে বারণ করেছেন।

একদিন তিনি সাহাবিদের বললেন: তোমরা কি জানো দেউলিয়া (bankrupt) কে?

তাঁরা বললেন: আমাদের মধ্যে সে-ই দেউলিয়া, যার কোনো অর্থকড়ি ও সহায়সম্পদ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন[৩০৯]:

إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار

"আমার উম্মাতের মধ্যে সে ব্যক্তিটাই দেউলিয়া, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও যাকাতের পুণ্য নিয়ে হাজির হবে। একইসাথে এমন অবস্থায় আসবে: সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুকের কুৎসা রটনা করেছে, অমুকের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়েছে, অমুকের রক্তপাত ঘটিয়েছে, অমুককে প্রহার করেছে। তারপর তার পুণ্য থেকে কিছু অংশ একজনকে দিয়ে দেওয়া হবে, কিছু অংশ দিয়ে দেওয়া হবে আরেকজনকে। এভাবে দিতে দিতে পাওনাদারদের প্রাপ্য পরিশোধ করার আগেই যদি তার পুণ্যের সঞ্চয় শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেই ব্যক্তিদের পাপ থেকে কিছু অংশ তাকে দিয়ে দেয়া হবে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"

কী ভয়ানক ব্যাপার, তাই না? অন্যের ব্যাপারে রসনা সংযত করার এখনই সময়! অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার জন্যে প্রসারিত হাতকে গুটিয়ে ফেলার এখনই সময়! আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিন। তোমাকেও!

গোলাপ নিতে গেলে যেমন কাঁটার খোঁচা মেনে নিতে হয়, পদ্ম তুলতে গেলেও পদ্মখোঁচা মেনে নিতে হয়। ছোটবেলায় আমরা প্রায় সবাই বাংলা দ্বিতীয় পত্রে ভাবসম্প্রসারণ পড়তে গিয়ে হরহামেশাই দুটো সুপরিচিত পঙ্‌ক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?"

পদ্মফুলের আরেক নাম কমল। এই ফুল তুলতে গেলে কাঁটার আঘাত সহ্য করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি চাই। অনেকসময় পদ্মপাতার আড়ালে সাপ লুকিয়ে থাকে। কাঁটার খোঁচা পাওয়ার পাশাপাশি সর্পদংশনের ঝুঁকিও থাকে। পদ্মকে যে পেতে চায়, তাকে এসব বিপত্তি মোকাবেলা করার হিম্মতও রাখতে হয়। সুখপ্রাপ্তির জন্যে কষ্ট মেনে নেয়ার এই দর্শন শাশ্বত। চিরসুখের চূড়ান্ত ঠিকানা জান্নাতে পৌঁছার রাস্তাটাও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কাঁটাবিছানো বন্ধুর পথ মাড়িয়েই পৌঁছতে হয় সেই মঞ্জিলে।

আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে পদ্ম বেশ দাপটের সাথেই তার উপস্থিতির জানান দেয়। পদ্ম নিয়ে শুধু কবিতা নয়, বেশ কিছু প্রবাদ-প্রবচনও নজরে পড়ে। তার মধ্যে একটি: 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'। লোচন মানে চোখ। পদ্মলোচন মানে পদ্মফুলের মতো সুন্দর চোখ। যার চোখটাই কানা, তার চোখকে পদ্মের মতো সুন্দর বলা মানে পরিহাস করা। এই কথাটা বলা হয়ে থাকে তখন, যখন কোনো মন্দ স্বভাবের ব্যক্তিকে সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আরেকটা প্রবচন প্রচলিত আছে: 'গোবরে পদ্মফুল'। গোবর খুবই অপাঙ্‌ক্তেয় বস্তু। পদ্মফুল শুভ্রতা ও আভিজাত্যের প্রতীক। অপাঙ্‌ক্তেয় বস্তুর মধ্যে অভিজাত ফুল ফোটাকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যখন তথাকথিত নীচু বংশে কোনো গুণী ব্যক্তির জন্ম হয়।

কৌলিন্যের এই ধারণা আমাদের দীনে মোটেও স্বীকৃত নয়। হিন্দু ধর্মের শতাব্দীচর্চিত জাতভেদ প্রথার অনিবার্য প্রভাবে উপমহাদেশে একসময় কিছু মুসলমানের মধ্যেও আশরাফ-আতরাফ নাম দিয়ে বিভাজনের একটা চিত্র আমরা ইতিহাসে দেখেছি। মুসলিম শাসক ও রাজন্যবর্গ আল্লাহর দীন থেকে দূরে সরে আসার অপরিহার্য ফলশ্রুতি হলো এসব ভেদাভেদের সূচনা। আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও সম্মানের মাপকাঠি হলো ব্যক্তির তাকওয়া। বংশ ও গোত্রের পার্থক্য মানুষের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়ের মাধ্যম ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ নিজেই বলছেন[৩১০]:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"মানুষেরা! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচে' সম্ভ্রান্ত হবে সে-ই, যে সবচে' বেশি তাকওয়াবান। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।"

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, জাতি ও গোত্রের প্রসঙ্গ আনার আগেই আল্লাহ বলে রেখেছেন, আমরা সকলেই আদম ও হাওয়া ('আ)-এর সন্তান। অর্থাৎ, উৎপত্তিগতভাবে আমরা সবাই মানুষ, আমরা সবাই একই জাতিভুক্ত, সুতরাং জাতভেদ প্রথায় আস্থা রাখার কোনো মানে নেই। এরপর আল্লাহ তা'আলা জাতি ও গোত্রের পার্থক্যকে শুধুই পরিচয়ের মাধ্যম বলে দিয়েছেন। জাতি ও গোত্রের পার্থক্যের ভিত্তিতে যারা মর্যাদা ও সম্মানের পার্থক্য করে থাকে, তাঁদের জন্যেও সতর্কবার্তা ঘোষিত হয়েছে এই বলে, আল্লাহর কাছে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত তারাই, যারা তাঁকে সবচে' বেশি ভয় করে, চাই সে যে বংশেরই হোক না কেন। এসবকিছুর পরও যারা কৌলিন্য ও বংশীয় ভেদাভেদকে জিইয়ে রাখতে চাইবে, তাদের জন্যে আল্লাহর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ: 'আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন!'

আমাদের নবিজি ﷺ-কে আল্লাহ যখন পাঠিয়েছেন, তখন সমগ্র আরবে কুরাইশ বংশ ছিলো অত্যধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। আরব তো বটেই, পুরো বিশ্বে তাদের নামডাক ছিলো, যেহেতু আল্লাহর ঘর রক্ষণাবেক্ষণ ও পুণ্যার্থীদের আতিথেয়তার ভার তারাই নিয়েছিলো। আবূ লাহাব এই সম্ভ্রান্ত বংশেরই সন্তান। কিন্তু আল্লাহর বিধানের সামনে আনুগত্য স্বীকার না করার কারণে আল্লাহর কাছে তার কানাকড়ি পরিমাণ মূল্য থাকলো না, বরং অভিশপ্ত হয়েই থাকলো। অন্যদিকে কুরাইশদের তুলনায় পারসিক জাতিগোষ্ঠী ছিলো তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া। সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে উঠে আসা সন্তান সালমান আল-ফারসী ইসলামগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রভূত সম্মান ও গৌরবের ভাগীদার হয়েছেন। তাঁর বংশ বা গোত্র কতটা পিছিয়ে ছিলো, সমাজে তাদের কদর কতটা কম ছিলো, সেটা আল্লাহর কাছে মোটেও বিবেচ্য হলো না। এটাই তো ইসলাম! 'আলী ﷺ তাঁর এক কবিতায়[৩১১] সে কথাটাই বলছেন:

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه

فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب

فقد رفع الاسلامُ سلمانَ فارسٍ

وقد وضع الشرك الشريفَ أَبا لهب

"শপথ করেই বলছি, মানুষ দীন পরিচয়ে পরিচিত হয়
তাকওয়ার উপর কখনোই যেন না হয় তোমার বংশের জয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুসলিম হয়ে সম্মান পেল পারস্যবাসী সেই সালমান
মুশরিক হয়ে অভিজাত আবু লাহাবের চলে গেল সম্মান।”

সালমান ইসলামগ্রহণ করে কতটা সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাছে কেমন প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, সে সম্পর্কে কয়েকটা গল্প না বললেই নয়।

প্রথম গল্পটা আমরা আবূ হুরাইরার কাছেই শুনে আসি। তিনি জানাচ্ছেন:

“একদিন আমরা রাসূলুল্লাহর কাছে বসা ছিলাম। তাঁর ওপর সূরা আল-জুমু‘আ নাযিল হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আয়াত পাঠ[৩১২] করলেন: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (এবং তিনি এ রাসূলকে পাঠিয়েছেন অন্যদের প্রতিও, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।)

আমি জানতে চাইলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁরা কারা? তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, আমি একে একে তিনবার জিজ্ঞাসা করলাম। আমাদের মধ্যে ছিলেন সালমান আল-ফারসী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতটি সালমানের গায়ে রাখলেন, এবং বললেন: ঈমান যদি (সুদূর আকাশের) সুরাইয়া তারকাতেও থাকে, তবুও এই লোকগুলো তাকে অর্জন করে নেবে।”[৩১৩]

এটা ছিলো ইমাম বুখারী’র বর্ণনা থেকে। এবার ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় একটা গল্প শুনে আসি।

একদিন অনেক লোকের মধ্যে তিনজন সাহাবি বিলাল, সুহাইব ও সালমান ﷺ একত্রে ছিলেন, এমতাবস্থায় আবু সুফয়ান তাঁদের কাছে এলেন। তিনজনই কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন। কোনো সংকোচ ছাড়াই আবু সুফয়ানের মুখের উপর বলে দিলেন: “আল্লাহর শপথ! আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর শত্রুর ঘাড়ে উপযুক্ত জায়গায় স্পর্শ করেনি।”

আবূ বাকর ﷺ বললেন: কুরাইশদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাদের সর্দারকে তোমরা এ কথা বলছো!

আবূ বাকর ﷺ এরপর রাসূলুল্লাহর কাছে এলেন এবং ঘটনাটা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ

“আবূ বাকর! মনে হয় তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করেছো। যদি তাদেরকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্রোধান্বিত করো, তাহলে তোমার রবকেই তুমি ক্রোধান্বিত করেছো।"

আবূ বাকর সোজা আবার তাদের কাছে চলে এলেন। তিন বন্ধুকে বললেন: "আচ্ছা ভাইয়েরা, আমি বোধহয় তোমাদের রাগান্বিত করেছি!"

তাঁরা বললেন: "না না! রাগ করিনি। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, প্রিয় ভাই!"[৩১৪]

দেখলে!

আল্লাহর রাসূল ﷺ যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁর মর্যাদা কত উঁচুতে, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। যাকে ক্রোধান্বিত করলে আল্লাহই ক্রোধান্বিত হন, তাঁর সম্মান কত বেশি, সেটাও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

আবূ লাহাবের মান কীভাবে ধুলায় মিশেছে, তা-ও দীর্ঘ কোনো আলোচনার দাবি রাখে না, যেহেতু আমরা প্রায়সময়ই সূরা মাসাদ পড়ে থাকি। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা নিজে বলেছেন:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

"আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজেও।"[৩১৫]

আরবের সবচে' অভিজাত ও সম্মানিত গোত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে তিনি অভিশপ্ত। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ও তুলনামূলকভাবে কম সমাদৃত বংশ থেকে আসা সালমান আল্লাহর কাছে অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

কাজেই, ইসলামে সম্মান ও মর্যাদার 'প্যারামিটার' কেবলই তাকওয়া, শুধুই তাকওয়া। তাঁকে কে কত বেশি ভয় করে চলে, তাকেই তিনি তত বেশি প্রিয় করে নেন। কৌলিন্য ও বংশীয় আভিজাত্যের বড়াই আল্লাহর কাছে ন্যূনতম মূল্য পায় না।

নাহ, পদ্ম নিয়ে অনেক মাতামাতি হয়ে গেছে। এবার তাকে ছুটি দেয়া যাক।

পদ্মের সমগোত্রীয় ও প্রায়সদৃশ শাপলা ফুলকে বলা হয় বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। শাপলা আমাদের দেশে একসময় প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত, বিশেষ করে বর্ষা ও শরতে বিল-ঝিল পরিপূর্ণ থাকত শাপলা ফুলে। শাপলার গোড়ায় জন্মানো শালুক ছিলো গ্রামবাংলার নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় একটি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন। দেখা যেত, চাষীরা ধান কাটতে কাটতে অসময়ে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে কাছাকাছি কোনো ঝিলে নেমে শালুক নিয়ে আসতো, তারপর খড়ের আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে নিতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছোটবেলায় হতো কি, চাচ্চু আর আমি একসাথে নজরুল রচনাবলি পড়তাম। চাচ্চু হেলেদুলে বলতেন:

"ঝিলের জলে কে ভাসালো নীল শালুকের ভেলা
মেঘলা সকাল বেলা?..."

আমি মাথা নেড়ে নেড়ে বলতাম আর ছড়া বানাতাম:

আল্লাহ ছাড়া কে ভাসাবে নীল শালুকের ভেলা?
তাঁর হুকুমেই মেঘ ডেকেছে আজকে সকাল বেলা।

তারপর চাচ্চু আমার পিঠ চাপড়ে দিতেন। ছোটবেলায় এরকম ছন্দসুরে, গল্পকথায় আমরা এ বিশাল সৃষ্টিরহস্যের মহানিয়ন্তা আল্লাহকে জানতে শিখেছি। একটা আদর্শ মুসলিম পরিবারের চিরচেনা দৃশ্য এমনই ছিলো। বড়রা ছোটদের সাথে গল্প করতেন, আল্লাহ-রাসূল-আখিরাত-জান্নাত ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলোর সাথে বিভিন্নভাবে পরিচিত করিয়ে দিতেন। শৈশব থেকেই শিশুরা জানা শুরু করতো দীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে। তারপর আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার সময় সেই জানা বিষয়গুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেত। যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দীন শিক্ষা করতো না, তারাও অপরিচিত থাকতো না দীনের মূল চেতনার সাথে। পারিবারিক পরিমণ্ডলে দীনচর্চার গুরুত্ব এটাই। আজকের ভঙ্গুর মূল্যবোধের যে দৃশ্য আমাদের খুব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এই ভাঙনের সুর প্রথম বেজেছে তখনই, যখন থেকে মুসলিম পরিবারগুলো আত্মকেন্দ্রিকতায় অভ্যস্ত হয়েছে।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে ছোট-বড় সবাই মিলে বইপড়ার দৃশ্য যেমন খুব একটা দেখা যায় না, ফুলটাও এখন চোখে পড়ে না বললেই চলে। যে দেশে যে ফুলটা সচরাচর বেশি দেখা যায় এবং সহজলভ্য হয়, সেটাকেই ঐ দেশের জাতীয় ফুল ঘোষণা করা হয়। শাপলার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিলো। কিন্তু স্কটল্যান্ডের জাতীয় ফুল এবং এই ফুলকে জাতীয় ফুল করার পেছনে কিংবদন্তিটাও মজাদার। কাঁটাগাছে ফোটা ফুল, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় thistle, এটাই স্কটল্যান্ডের জাতীয় ফুল। কোনো এক ইংরেজি ম্যাগাজিনে (সম্ভবত রিডার্স ডাইজেস্ট) এই ফুলকে স্কটল্যান্ডের জাতীয় ফুল ঘোষণার পেছনে একটি জনশ্রুতির ব্যাপারে পড়েছিলাম। ব্যাটল অব লার্গস-এর সময় নরওয়ের কিছু সৈন্য স্কটল্যান্ডের সৈন্যশিবিরে গোপনে হামলা করতে উদ্যত হয়েছিলো। দুর্ভাগ্যবশত নরওয়ের এক নগ্নপদ সৈন্য সামনে আগাতে গিয়ে থিসেল ফুলের কাঁটায় আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। সাথে সাথে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্কটল্যান্ড শিবিরে সবাই সতর্ক হয়ে পড়ে এবং ঐ যাত্রায় শত্রু হামলা থেকে বেঁচে যায়। জাতীয় প্রতিরক্ষায় থিসেল ফুলের এই ভূমিকা স্মরণ করেই তাকে স্কটল্যান্ডের জাতীয় ফুল বলে ঘোষণা করা হয়।

আমরা একটা কাজ ভুল করে যাচ্ছি। এই লেখাটা শুরু হয়েছিলো বসন্ত নিয়ে, বসন্তে ফোটা ফুলগুলোর গল্প করতে গিয়ে আমরা ভিন্ন ঋতুর সীমানা মাড়িয়ে ফেলেছি। আর নয় অন্য ঋতুর ফুল নিয়ে গল্প করা, এবার শুধুই বসন্তের ফুল।

আচ্ছা, বসন্তের ফুল থেকে আর কী কী যেন বাকি আছে?

কৃষ্ণচূড়া!

কৃষ্ণ মানে কালো। এই গাছকে নিকট বা দূর যেখান থেকেই দেখা হোক, দেখলেই মনে হয় একটা লাল শামিয়ানা গাছের উপর কেউ জড়িয়ে রেখেছে। কখনো কখনো হলুদ কিছু ফুলের দেখা মেলে। চূড়ার দিকে তো রক্তিম লাল! তাহলে লালচূড়া বা হলুদচূড়া না হয়ে কৃষ্ণচূড়া কেন নাম হলো? এটাও দেখছি 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'। অবশ্য এই নামকরণের পেছনে পৌরাণিক- কাহিনি-নির্ভর কিছু ব্যাখ্যা অনেকে দিয়ে থাকেন। কিন্তু ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব বা উদ্ভিদতত্ত্ব কোনো নিক্তিতেই তাকে সন্তোষজনক বলা যায় না। নামকরণের রহস্য যতই গোপন থাকুক না কেন, বসন্তে কৃষ্ণচূড়ার উপস্থিতি কিন্তু সবসময়ই সরব। লাল বর্ণের ফুলের সমারোহ, মাঝে মাঝে আবার হলুদ বর্ণের লুকোচুরি, ফাঁকে ফাঁকে পরিদৃষ্ট পাতার সবুজ—সব মিলিয়ে মনে হয় আকাশের রংধনু পৃথিবীতে নেমে এসেছে। কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের এই চিক্কণতা নিরীক্ষণের জন্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টির পাশাপাশি অন্তর্দৃষ্টিও থাকা চাই!

বসন্তের গণিতে আরেকটা অবিভাজ্য সংখ্যার নাম শিমুল। সুকোমল বৃতি তার। তবে ঘ্রাণ নেই তেমন। শিমুল গাছের ফল ফেটে তুলা (সিল্ক কটন) বের হয়, সেই তুলা দিয়ে বালিশ বানানো হয়। কিন্তু ফুল দিয়ে কী হয়? আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনো বাহ্যিক গুণ তার নেই। বিষয়টা রবি ঠাকুরের কল্পনায় ধরা পড়েছে এভাবে:

'তোরে সবে নিন্দা করে গুণহীন ফুল।'
শুনিয়া নীরবে হাসি কহিল শিমুল,
'যতক্ষণ নিন্দা করে আমি চুপে চুপে
ফুটে উঠি আপনার পরিপূর্ণ রূপে।'[৩১৬]

জীবনের চাকা সক্রিয় রাখার জন্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ। শিমুলকে কেউ গুণহীন বললেও তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে তার অতুলনীয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রূপ ছড়িয়েই মানুষের মন জয় করে যায়। মানুষের মন তো বটেই, পাখিদের কাছেও সে ভীষণ প্রিয়। ফুলের অভ্যন্তরে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে, যার মাধ্যমে পাখিরা অনেকসময় পিপাসা মেটাতে পারে। তাছাড়া বিবিধ ভেষজ গুণাগুণ তো আছেই তার। সুতরাং, তার গুণ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে সেটার পেছনে সময়ক্ষেপণ না করে ফুটন্ত রূপকে পূর্ণতা দেয়ার কাজেই সে মনোযোগী হয়।

এই দর্শনটা আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ইমাম শাফি'ঈর একটি কবিতায়। আমরা মূল কবিতাটি[৩১৭] পড়বো, কবিতাটির কাব্যানুবাদ করারও চেষ্টা করবো।

يخاطبني السفيه بكل قبح * فأكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة فأزيد حلما * كعود زاده الإحراق طيبا

"কোনো অভদ্র আমাকে ইচ্ছেমতো যদি কটু বলে
আমি কখনোই জবাব দিই না, নীরবেই যাই চলে
মূর্খতা নিয়ে থাক সে, সবর নিয়ে বাঁচুক এ প্রাণ
চন্দন কাঠ আগুনে যতই পোড়ে তত বাড়ে ঘ্রাণ!"

পথ চলার সময় অনেক ধরনের নিন্দাবাক্যবাণে আমাদের জর্জরিত হতে হবে। এগুলোকে খুব বেশি আমলে নিতে গেলেই মুশকিল। পৃথিবীতে খুব কম লোকই আছেন, যাদেরকে জীবনের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে নিন্দার ঝড়ে আক্রান্ত হতে হয়নি। শুক্লপক্ষের কোনো এক রাতে খেয়াল করে দেখো, কাকজোছনায় যখন পুরো পৃথিবী আলোর বন্যায় ভাসছে, পোড়োবাড়ির সামনে তখন কিছু কুকুর চাঁদের দিকে মুখ করে তারস্বরে অবিরাম ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে। তাদের এই ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনে চাঁদ কিন্তু তার জোছনা বিলানো বন্ধ করে দেয় না।

ইমাম শাফি'ঈ মানুষকে একটা চন্দন কাঠের সাথে তুলনা করেছেন। এই কাঠ থেকে সুগন্ধি বের করার উপায় হচ্ছে, একে পোড়ানো। যত বেশি পোড়ানো হয়, চন্দন কাঠের ঘ্রাণ তত বেশি তীব্র হতে থাকে। মানুষকেও যত বেশি নিন্দা-সমালোচনা করা হবে, তার মানসিক দৃঢ়তা ততই দৃঢ়তর হতে থাকবে। পাটকাঠিতে আগুন দিলে পুড়ে যাওয়া ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। কিন্তু চন্দনে আগুন দিলে তার কাজ হয় ঘ্রাণ বিলানো। আমাদেরও উচিত চন্দন কাঠের ভূমিকায় নিজেদের দাঁড় করানো। যতই কটুবাক্য সামনে আসবে, অন্তরের শুভ চেতনা ততই দৃপ্ত হবে, শুভ্রতা ততই দীপ্ত হবে।

নির্বোধ নিন্দুকের সামনে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে দূরে সরে থাকার অর্থ, আমি আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সময়কে মূল্যবান মনে করছি। আর তার সাথে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হওয়ার মানে হলো, অপচয় করার মত যথেষ্ট সময় আমার হাতে আছে। এ ধরনের নির্বোধদের এড়িয়ে চলার জন্যে আল্লাহও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর এই নির্দেশ একটা সত্যগল্পের মাধ্যমেই জানার চেষ্টা করি।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (রহ.) একদিন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে মজলিসে বসে আছেন। হঠাৎ এক লোক এসে প্রচণ্ডরকম গালি দিতে শুরু করলো। এ ধরনের ভয়াবহ তিরস্কার শুনে তাঁর ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন: "হে আবূ 'আব্দিল্লাহ! এই নির্লজ্জকে জবাব দিন।"

ইমাম আহমাদ বললেন: "আল্লাহর শপথ, তা করবো না! তাহলে কুরআন থেকে পাওয়া শিক্ষা কোথায় যাবে?"[৩১৮]

এই বলে তিনি আয়াতটি[৩১৯] পড়লেন:

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"আর-রাহমান-এর (প্রকৃত) বান্দা তাঁরাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাচল করে এবং তাদেরকে যখন মূর্খরা সম্বোধন করে (কিছু বলে), তখন তাঁরা বলে: সালাম!"

এই আয়াতটি অনুধাবন ও এর শিক্ষা প্রয়োগে আমরা অনেকে ভুল করে থাকি। এখানে 'সালাম' বলতে 'আসসালামু আলাইকুম' বলাকে বোঝানো হয়নি। কারণ, এই আয়াতটি মাক্কী। সালামের বিধান নাযিল হয়েছে 'সূরা নিসা'তে, যেটা মাদানী সূরা। তাছাড়া এখানে 'মূর্খরা' বলতে প্রধানত কাফিরদের বোঝানো হয়েছে, আর কাফিরদেরকে সালাম দেওয়া মুমিনদের জন্যে অনুমোদিত নয়।[৩২০]

তাহলে, 'সালাম' বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের বক্তব্য মূলত দুটো অভিমতে কেন্দ্রীভূত হয়:

ক) এখানে سَلَامًا এর অর্থ হচ্ছে سدادا ।

অর্থাৎ কেউ মন্দ বললে বিপরীতে তাকে উত্তম কথা দিয়ে জবাব দিতে হবে।[৩২১]

খ) এখানে سَلَامًا এর অর্থ হলো تسلماً منكم ।

অর্থাৎ কেউ মন্দ বললে তার কাছ থেকে সরে আসা এবং এ কথা বলা, আমি তোমার সাথে বাগ্‌বিতণ্ডা করা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম।[৩২২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

والله أعلم بالصواب

তাহলে, আমাদের ওপর আয়াতের দাবি হচ্ছে, যখন কোনো নিন্দা-কুৎসা বা তিরস্কারের মুখোমুখি হবো, তখন পরিবেশ ও প্রতিবেশ বুঝে হয়তো সুন্দরভাবে সেটাকে প্রত্যুত্তর করবো, নয়তো একদম এড়িয়ে যাবো এবং চুপ করে থাকবো। এ ধরনের বিবেকহীন ও শ্লীলতাশূন্য ব্যক্তিগণ যখন মুখের লাগাম ছেড়ে দেয়, তখন অধিকাংশ সময়ই প্রত্যুত্তর করার মতো কোনো স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে না। চুপিসারে তাকে এড়িয়ে চলাই তখন একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়।

শিমুল ফুল আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত কুরআনের কাছেই নিয়ে ছাড়লো। আসলে কুরআনের কাছে আসা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। হৃদয়ের প্রাশস্ত্য বলো, জীবনের প্রশান্তি বলো, কোনোটাই কুরআনকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না।

শিমুল ফুলকে নিয়ে গল্প হচ্ছে, সেখান থেকে পলাশ ফুল বাদ পড়ছে, এই দৃশ্য তো খুবই বেমানান! বসন্তে পলাশ বৃক্ষের দিকে তাকালেই মনে হয় বৃক্ষচূড়ায় আগুন লেগেছে। পলাশ নিজে আগুনরাঙা, এটা একটা কারণ। আবার পলাশের পাপড়িগুলোও দেখতে অনেকটা আগুনের শিখার মতো। তবে মাটির চুলার আগুনে যে ধরনের শিখা বের হয়, তার সাথে মেলানো যাবে না। গ্যাস স্টোভে মোটামুটি হালকা ধরনের আগুন জ্বলার সময় যে স্থূল আঁকাবাঁকা শিখা দৃষ্ট হয়, সেটার সাথে মেলানো যেতে পারে। অন্য কোথাও টিয়া পাখির দেখা না মেললেও পলাশের ডালে নজর রাখলে দুয়েকটা টিয়া পাখি দেখা মোটামুটি নিশ্চিত। কোকিলের কুহু কুহু গানের জন্যেও পলাশের আগুনঝরা শাখাগুলো আরামদায়ক মঞ্চ। এই চমৎকার নৈসর্গিক দৃশ্য আমরা শৈশবে যতটা উচ্ছ্বাসমুখর পেয়েছি, এখন আর তা নেই। এমনকি গ্রামেও পলাশের গাছ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পলাশই যদি না থাকে, তাহলে 'আগুনরাঙা ফাগুন' শুধু কবিদের অনুপ্রাসেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বাস্তবে নয়।

আরও কত ফুল বসন্তের বাসন্তী সাজকে করে তুলতো দৃষ্টিনন্দন! শামুকের খোলের মতো ফুটে থাকা শ্বেতকাঞ্চন ফুল, ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকা টগর ফুল, পঞ্চকোণ তারার মতো প্রস্ফুটিত কুরচি ফুল—উৎকর্ষের দিক থেকে সবগুলো ফুলই ছিলো চমকপ্রদ, দৃষ্টিনন্দন।

ফুলেদের ঘ্রাণে, পাখিদের গানে বসন্ত দোলা দেয় আমাদের প্রাণে। তখন প্রকৃতির চারপাশে যে সবুজতা ও সজীবতার উচ্ছ্বসিত হাসি বিরাজ করে, আমাদের মনোজগতেও সে উৎসবমুখর হিন্দোল জাগিয়ে তুলতে পারলে কেমন হয়? এতক্ষণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শুনে আসা বসন্তের গল্পটা আমাদের ভেতরেই অনুরণিত হতে দেখলে কেমন লাগবে? এতক্ষণ দেখে আসা বসন্তের চিত্রটা আমাদের অন্তরে বিম্বিত হতে থাকলে কী দারুণ অনুভূতি হবে, তাই না?

হ্যাঁ, বসন্তকে আমাদের হৃদয়েও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। ফুলের নির্মল ঘ্রাণ আর পাখিদের নিষ্পাপ গান আমাদের ভেতরেও সঞ্চারিত করা যায়। তাহলে পাতাঝরা মওসুম আর থাকে না অনুভবে, গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদের তাপ আর ছাপ রাখে না অন্তরে, শীতের শুষ্কতা ও রুক্ষতা বিদায় নেয় চিরতরেই। প্রশ্ন করতে পারো, কীভাবে এমন বসন্ত ধারণ করা যায় হৃদয়ে?

উত্তরটা প্রিয় নবিজি ﷺ-এর কাছ থেকেই জেনে নিই। তাঁর কাছে 'হৃদয়ের বসন্ত' ছিলো কুরআন! কুরআন যেন আমাদের হৃদয়ের আঙিনায় বাসন্তী সাজে হাজির হয়, সেজন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেও শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি। কত সুন্দর সেই দু'আ! বিষণ্নতায় পতিত হলে, বিষাদগ্রস্ততা হৃদয়ে গ্রথিত হলে আমাদেরকে এই দু'আটি করতে বলেছেন। দু'আটি একটু দীর্ঘ। দীর্ঘ হবে না? ভালোবাসার আকুতি তো কোনোসময় অল্প কথায় ফুরায় না! চলো তবে নবিজি ﷺ-এর শিখিয়ে দেয়া দু'আটির সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجَلاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي

"আল্লাহ! আমি তোমার একজন বান্দা। তোমারই এক বান্দা এবং তোমার এক বান্দির সন্তান আমি। আমার ভাগ্য তোমারই হাতে। তোমার ফায়সালাই আমাতে প্রভাবসম্পাতী। আমার জন্যে তোমার সিদ্ধান্তই যথাযথ ও ন্যায্য। তোমার প্রত্যেকটি সুন্দর নাম, যদ্বারা তুমি নিজের নামকরণ করেছো, অথবা যা তুমি কুরআনে নাযিল করেছো, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে শিখিয়েছো, কিংবা যা তুমি অদৃশ্যের জ্ঞানে সুপ্ত রেখেছো শুধু নিজের কাছেই, সব কটি নামে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি:

কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দাও, আমার বুকের আলো বানিয়ে দাও, আমার বেদনা উৎপাটনের কারণ বানিয়ে দাও, আমার দুশ্চিন্তা শেষ হবার উপলক্ষ্য করে দাও।"

দেখেছো, কত বেশি মর্মভেদী আকুতি! আল্লাহর কাছে যে জিনিসটা চাওয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হচ্ছে, সেটার কথা খুব অল্পই এসেছে। প্রার্থিত ও আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের আবেদন পেশ করার আগে আল্লাহর কাছে নিজের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা পেশ করা হয়েছে, বিনয় ও সমর্পণের সংশ্লেষ মিশ্রিত অভিপ্রায়ের মাধ্যমে। আল্লাহর কাছে যেকোনো কিছু চাওয়ার সময়, যেকোনো অভাব-অভিযোগ পেশ করার সময় আমাদের উচিত প্রথমেই নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করা, তারপর আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের আন্তরিক স্বীকৃতি দেওয়া। আল্লাহর সুন্দর গুণবাচক নামসমূহ (আল-আসমা আল-হুসনা) সহযোগে তাঁর কাছে প্রার্থনা করাও দু'আর অন্যতম শিষ্টাচার।

এই দু'আ পড়লে কী হবে? রাসূলুল্লাহর কাছেই শুনে নেয়া যাক:

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ .... إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا

"যখন কাউকে দুশ্চিন্তা অথবা বিষণ্নতায় পেয়ে বসবে, তখন যদি এই দু'আটি পড়ে, তার দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতাকে আল্লাহ দূর করে দেবেন এবং সেই বিষাদকে তার জন্যে স্বস্তি ও প্রশান্তি দিয়ে বদলে দেবেন।"[৩২৩]

বলা হলো: "আমাদের কি উচিত না এই দু'আ শিখে নেয়া?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا "অবশ্যই! যে-ই দু'আটি শুনবে, তারই উচিত এটা শিখে নেয়া।"[৩২৪]

আমরা তো শুনে ফেললাম!

আর দেরি নয় তবে। সময় করে দু'আটি আমরা শিখে নেব ইন শা-আল্লাহ।

দু'আটি আমরা তো পড়ব। একইসাথে কুরআনকে হৃদয়ের কাছাকাছি রাখবো, জীবনের সব পর্বকে বসন্তে রূপ দেয়ার জন্যে কুরআনের পুষ্পিত জ্ঞান আহরণ করে যাব। বুকের অন্ধকারে আলো জ্বালানোর জন্যে ঐশী দ্যুতির সন্ধান করবো কুরআনের পাতায়। বিষাদ ও বেদনাকে যদি জায়গা দিতে না চাই, তাহলে হৃদয়ের সিংহাসনে একচ্ছত্র আধিপত্যের সুযোগ করে দিতে হবে কুরআনকেই।

আমাদের জীবন বসন্তের মতোই প্রাণোচ্ছল হোক। আমাদের হৃদয় কুরআনের স্পর্শেই বাসন্তী সাজে মুখরিত হোক। 'জাগ্রত দ্বারে বসন্ত'র রূপ দেখে আল্লাহর কাছে এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

টীকা

২৫৮. তাফসীর আলূসী, খ. ১১ পৃ. ৬৩
২৫৯. সূরা আল-ইসরা, ১ : ৮২
২৬০. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৬৮, ৬৯
২৬১. সুনান আন-নাসাঈ: ১১২৭৮; সাহীহ ইবন হিব্বান: ২৪৭;
২৬২. ফায়দুল ক্বাদীর শারহ জামি' আস-সাগীর, খ. ৫ পৃ. ৫১১
২৬৩. The Oxford Book of English Verse, P. 476. (To the Cuckoo – John Logan)
২৬৪. মুসনাদ আহমাদ: ৩৯৯১
২৬৫. সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৮, ৯
২৬৬. সাহীহুল বুখারী: ৪৭২৯; মুসলিম: ৭২২২
২৬৭. সহীহ মুসলিমের [৬৪৯২] বর্ণনা:
استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل
২৬৮. তাবাকাতুল ফুকাহা, খ. ১ পৃ. ৪৩
২৬৯. প্রাগুক্ত
২৭০. তাবারানী কাবীর: ৮৪৬৯। (هذا فرعون هذه الأمة)
২৭১. দুই কিশোর সাহাবি মু'আজ ও মু'আওয়াজ প্রথমে আঘাত করেন আবূ জাহলকে, এরপর ইবন মাস'ঊদ তাকে চূড়ান্তভাবে হত্যা করেন।
[তাবাকাত ইবন সা'দ, খ. ৩ পৃ. ১১৩]
২৭২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ১ পৃ. ৪৯৫
২৭৩. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১১
২৭৪. তাফসীর আত-তাবারী, খ. ২২ পৃ. ২৯৮
২৭৫. কুরতুবী'র বর্ণনা থেকে সংক্ষেপিত। [তাফসীর আল-কুরতুবী, খ. ১৬ পৃ. ৩২৫]
২৭৬. এখানে পিতা বলতে 'ইয়াহূদী ধর্মের প্রাণপুরুষ' বোঝানো হয়েছে। হারূন (আ)-কে চাচা বলার কারণ হলো, তিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর সহোদর ভাই।
২৭৭. তাফসীর আল-কুরতুবী, খ. ১৬ পৃ. ৩২৬; তাফসীর আল-বাহর আল-মুহীত, খ. ৮ পৃ. ১১২।
২৭৮. সূরা আল-হুমাযাহ, ১০৪ : ১
২৭৯. আসরার ও রমুয, পৃ. ৩২
২৮০. সহীহ বুখারী: ৬৯১৪
২৮১. উল্লেখ্য, জান্নাতের ঘ্রাণ কতদূর দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে, এ নিয়ে আরো কিছু বর্ণনা হাদীসে আছে।
কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, এক হাজার বছর অতিক্রম্য পথের দূরত্ব থেকেই এ ঘ্রাণ পাওয়া যাবে (ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام) [আল-মু'জামুল আওসাত: ৫৬৬৪]।
হায়সামী'র বিশ্লেষণে এটি একটি দুর্বল হাদীস। [মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৮/১৫১]
আবার কোনো বর্ণনায় এসেছে, পাঁচশো বছর অতিক্রম্য পথের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে (رائحة الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام) [সহীহ মুসলিম: ২১২৮]
আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, একশো বছর অতিক্রম্য পথের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে (ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام)।
হায়সামী'র বিশ্লেষণে এখানে একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী আছেন। [মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৬/২৯৬]
সত্তর বছর দূরত্বের ব্যাপারেও একটি হাদীস রয়েছে (وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً) [সুনান আত-তিরমিযী: ১৪০৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চল্লিশ বছর দূত্বের ব্যাপারে বুখারী'র বর্ণনাটি গল্পে ইতোমধ্যে চলে এসেছে।
এখানে কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনা আছে, আবার উল্লিখিত দুর্বল বর্ণনাগুলোও একেবারে অগ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে প্রশ্ন জাগে, যে ব্যাপারে এতগুলো আপাত-পরস্পরবিরোধী বর্ণনা আছে, সে ব্যাপারে কোনো উপসংহারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কি আছে? আসলে কোন বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য?
বস্তুত এই হাদীসগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সব বর্ণনাই অবস্থাভেদে সঠিক। এ ব্যাপারে ইবন হাজার 'আসকালানীর বক্তব্য:

«والذي يظهر لي في الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في الموقف، والسبعين فوق ذلك، والخمسمائة، ثم الألف، أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال»

"এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধনকল্পে যে কথা আমার নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তা হলো: অবস্থানস্থল থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়ার সর্বনিম্ন সময়কাল চল্লিশ বছর। তারপর সত্তর, (তারপর একশো), তারপর পাঁচশো, তারপর এক হাজার বা ততোধিক। এই পার্থক্য সূচিত হবে ব্যক্তি ও তার 'আমালের পার্থক্যের ভিত্তিতে।" [ফাতহুল বারী, খ. ১২ পৃ. ২৬০]
অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে যাঁর 'আমাল যত বেশি পছন্দনীয়, তিনি ততটা অধিক দূরত্বস্থল থেকেই জান্নাতের সুবাস পেতে থাকবেন। যাঁর 'আমাল আরেকটু কম, তিনি আরেকটু কম দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুবাস পাবেন। والله أعلم

২৮২. সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩ : ২৫, ২৬
২৮৩. তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ১১ পৃ. ৭৯
২৮৪. আল-জামি' আস-সাগীর: ৪৭৫৬
২৮৫. তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ১ পৃ. ২০৫
২৮৬. মুসনাদ আহমাদ: ১৮৫৫৭, সুনান আবূ দাউদ: ৪৭৫৩
২৮৭. প্রাগুক্ত
২৮৮. ইমাম যাহাবীর ভাষায়: من كبار الثقات
২৮৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬ পৃ. ৩১৬
২৯০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ১২ পৃ. ১৪৫
২৯১. তারীখু বাগদাদ, খ. ২ পৃ. ২১০
২৯২. মুসনাদ আহমাদ: ২৪৭৬৮
২৯৩. আল-বির ওয়া আস-সিলাহ, পৃ. ৪২
২৯৪. বিররুল ওয়ালিদাইন, পৃ. ৬
২৯৫. বনগীতি ('হলুদ গাঁদার ফুল' শীর্ষক গীতি)
২৯৬. মুসনাদ আহমাদ: ১২৫৬৮; وقال الهيثمي: رجاله ثقات [মাজমা' আয-যাওয়াইদ, খ. ৫. পৃ. ২৮১]
২৯৭. সহীহ মুসলিম: ৬৮৫৭
২৯৮. সাহীহুল বুখারী: ৬০৯২; সহীহ মুসলিম: ২১২৩
২৯৯. একই শিরোনামে অস্টিন ডবসন-এরও একটি কবিতা আছে।
৩০০. অনূদিত অংশের মূল পাঠ:

"We have short time to stay, as you,
We have as short a spring;
As quick a growth to meet decay,
As you, or anything.
We die

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

As your hours do, and dry
Away
Like to the summer's rain;
Or as the pearls of morning's dew,
Ne'er to be found again."

৩০১. সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪৫
৩০২. সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ২১
৩০৩. মুসনাদ আহমাদ: ২৭৪৪
৩০৪. মুস্তাদরাক: ৬৫১০; তাবারানী কাবীর: ৭৩১
৩০৫. নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব, খ. ৩ পৃ. ২১৭
৩০৬. জালালুদ্দীন রূমী নয়। জালালুদ্দীন রূমী ফার্সি ভাষার কবি, আর ইবনুর রূমী হলেন আরবি ভাষার কবি। ইবনুর রূমী-কে জালালুদ্দীন রূমীর সন্তান মনে করারও সুযোগ নেই। জালালুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেছেন ইবনুর রূমীর মৃত্যুর অন্তত তিন শত বছর পর।
৩০৭. দীওয়ান ইবনুর রূমী, খ. ১ পৃ. ৫২৩
৩০৮. আয-যাওয়াজির, পৃ. ৬৬৩
৩০৯. সহীহ মুসলিম: ৬৭৪৪
৩১০. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩
৩১১. শারহুল আরবা'ঈন ('আব্বাদ), খ. ৩২ পৃ. ৭
৩১২. সূরা আল-জুমু'আহ, ৬২ : ৩
৩১৩. সাহীহুল বুখারী: ৪৮৯৭; সহীহ মুসলিম: ৬৬৬২
৩১৪. সহীহ মুসলিম: ৬৫৬৮
৩১৫. সূরা মাসাদ, ১১১ : ১
৩১৬. কণিকা, পৃ. ৮৩
৩১৭. দীওয়ান আশ-শাফি'ঈ, পৃ. ২
৩১৮. হাকাযা 'আল্লামাতনী আল-হায়াত, পৃ. ২
৩১৯. সূরা আল-ফুরক্বান, ২৫:৬৩
৩২০. তাফসীর রূহুল মা'আনী, খ. ১৪. পৃ. ১৩৫
৩২১. তাফসীর তাবারী, খ. ১৯ পৃ. ২৯৫; তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ৬ পৃ. ১২২; তাফসীর বায়দ্বাওয়ী, খ. ৪ পৃ. ১৩০; তাফসীর রূহুল মা'আনী, খ. ১৪ পৃ. ১৩৫; তাফসীর মাযহারী, খ. ৭ পৃ. ৪৬
৩২২. তাফসীর বায়দ্বাওয়ী, খ. ৪ পৃ. ১৩০; তাফসীর আর-রাযী, খ. ১১ পৃ. ৪৪৮; তাফসীর আল-মুনীর, খ. ১৯ পৃ. ১০২; আইসারুত তাফাসীর, খ. ৩ পৃ. ৬২৮
ইমাম কুরতুবী স্পষ্ট করেই লিখেছেন: لَيْسَ» سَلاماً» مِنَ التَّسْلِيمِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ التَّسَلُّمِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: سَلَامًا، أَيْ تَسَلُّمًا مِنْكَ، أَيْ بَرَاءَةً مِنْكَ [তাফসীর কুরতুবী, খ. ১৩ পৃ. ৬৯]
৩২৩. মুসনাদ আহমাদ: ৩৭১২
৩২৪. প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রন্থপঞ্জি

(লেখকদের নামের বর্ণানুক্রমানুসারে)

আরবি

আল-কুরআনুল কারীম

✿ তাফাসীরুল কুরআন

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (তাফসীর আল-কুরতুবী)*, কায়রো: দারুল কুতুব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪ হিজরী

আবূ জা'ফার আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন (তাফসীর আত-তাবারী)*, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২০ হিজরী

আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (তাফসীর ইবন কাসীর)*, রিয়াদ: দারু ত্বাইয়্যিবাহ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০ হিজরী (১৯৯৯ ঈসাব্দ)

আবূ বাকর আল-জাযাইরী, *আইসারুত তাফাসীর, মাদীনাহ: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম*, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪২৪ হিজরী (২০০৩ ঈসাব্দ)

আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন আল-বাগাওয়ী, *মা'আলিমুত তানযীল (তাফসীর আল-বাগাওয়ী)*, রিয়াদ: দারু ত্বাইয়্যিবাহ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৭ হিজরী (১৯৯৭ ঈসাব্দ)

আবূ হাইয়ান মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-উন্দলুসী, *আল-বাহর আল-মুহীত ফী আত-তাফসীর*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪২০ হিজরী

আল-কাদী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আল-ফানিফাতী, *আত-তাফসীর আল-মাযহারী*, করাচী: মাকতাবা রাশিদিয়াহ, ১৪১২ হিজরী

জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আল-জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত-তাফসীর*, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, প্রথম মুদ্রণ ১৪২২ হিজরী

জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আদ-দুর আল-মানসূর*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১০ ঈসায়ী

ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী, *আত-তাফসীর আল-মুনীর*, দিমাশক: দারুল ফিকর, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪১৮ হিজরী

নাসিরুদ্দীন আবূ সা'ঈদ আশ-শিরাজী আল-বায়দাওয়ী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাওয়ীল (তাফসীর আল-বায়দ্বাওয়ী)*, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাস আল-'আরাবী, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৮ হিজরী

মুহাম্মাদ আত-তাহির ইবন 'আশূর, *আত-তাহরীর ওয়া আত-তানওয়ীর (তাফসীর ইবন 'আশূর)*,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিউনিশিয়া: আদ-দার আত-তূনীসিয়াহ লিন-নাশর, ১৯৮৪ ঈসাব্দ

মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতী, *তাফসীর আদ্বওয়াউল বায়ান*, বৈরুত: দারুল ফিকর লিত-ত্বা'আহ, ১৪১৫ হিজরী

মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী, *সাফওয়াতুত তাফাসীর*, কায়রো: দারুস সাবূনী লিতত্বা'আহ, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৭ হিজরী

শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল 'আযীম ওয়া আস-সাব' আল-মাসানী (তাফসীর আল-আলূসী)*, বৈরুত: দারুল কুতুব, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৫ হিজরী

✡ আল-হাদীস

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আল-জামি' আস-সাহীহ (সহীহ মুসলিম)*, বৈরুত, দারুল জাইল, তা.বি.

আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস, *সুনান আবী দাউদ*, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, তা.বি.

আবূ বাকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন আল-বায়হাক্বী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, বৈরুত: দারুল কুতুব, ১৪২৪ হিজরী

ঐ, *শু'আবুল ঈমান*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম মুদ্রণ ১৪২৩ হিজরী

আল-ইমাম আল-হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ, *আল-মুস্তাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন*, বৈরুত: দারুল কুতুব, ১৪১১ হিজরী

আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা (সুনান আন-নাসাঈ)*, বৈরুত: দারুল কুতুব, প্রথম মুদ্রণ ১৪১১ হিজরী

আহমাদ ইবন হাম্বাল আশ-শায়বানী, *মুসনাদু আহমাদ ইবন হাম্বাল*, কায়রো: মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, তা.বি.

জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আল-জামি' আস-সাগীর মিন হাদীসি আল-বাশীর আন-নাযীর*, বৈরুত: দারুল ফিকর লিত-তাবা'আহ, তা.বি.

মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *আল-জামি' আল-মুসনাদ আস-সাহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী (সাহীহুল বুখারী)*, বৈরুত: দারু ত্বাওকিন নাজাহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২২ হিজরী

ঐ, *আল-আদাব আল-মুফরাদ*, জেদ্দা: দার আস-সিদ্দীক, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২১ হিজরী

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমাহ, *সাহীহ ইবন খুযাইমাহ*, বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৩৯০ হিজরী

মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামি' আস-সাহীহ সুনান আত-তিরমিযী*, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাস আল-'আরাবী, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, তা.বি.

মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান, *সাহীহ ইবন হিব্বান বিতারতীবি ইবন বালবান*, কায়রো: মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, তা.বি.

সুলাইমান ইবন মুহাম্মাদ আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, কায়রো: দারুল হারামাইন, ২০১০ ঈসায়ী

✡ শারহুল হাদীস, তাখরীজ

আবুল 'আলা মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান আল-মোবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আত-তিরমিযী, বৈরুত: দারুল কুতুব, তা.বি.

আবুল হাসান নূরুদ্দীন আল-হায়সামী, *মাজমা' আয-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ*, কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৪১৪ হিজরী

আবূ যাকারিয়া ইয়াহয়া ইবন শারফ আন-নাওয়াওঈ, *শারহু মুসলিম*, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪০৭ হিজরী

'আবদুল মুহসিন আল-'আব্বাদ, *ফাতহুল ক্বাওঈ আল-মাতীন ফী শারহিল আরবা'ঈন ওয়া তাতিম্মাতিল খামসী লি আন-নাওয়াওঈ ওয়া ইবন রাজাব*, দাম্মাম: দারু ইবনিল ক্বাইয়িম, প্রথম মুদ্রণ ১৪২৪ হিজরী

আল-'ইরাক্বী, *ইবনুস সাবকী ও আয-যাবীদি*, তাখরীজু আহাদিসি ইহয়াই 'উলূমিদ্দীন, রিয়াদ: দারুল 'আসিমাহ, প্রথম মুদ্রণ ১৪০৮ হিজরী

আহমাদ ইবন 'আলী ইবন হাজার আল-'আসকালানী আশ-শাফি'ঈ, *ফাতহুল বারী শারহ সাহীহিল বুখারী*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হিজরী

জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আদ-দীবাজ 'আলা সাহীহি মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ*, খোবার: দারু ইবন 'আফফান, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৬ হিজরী

মুহাম্মাদ 'আবদুর রঊফ আল-মানাওঈ, *ফায়দুল কাদীর শারহ আল-জামি' আস-সাগীর*, বৈরুত: দারুল কুতুব, ১৪১৫ হিজরী

মুহাম্মাদ শামসুল হাক আল-'আযীম আবাদী, *'আওনুল মা'বূদ শারহ সুনান আবি দাউদ*, বৈরুত: দারুল কুতুব, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১৫ হিজরী

✿ সীরাত-শামাইল, তারীখ, তারাজিম, তাবাকাত

আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন কাসীর, *আস-সীরাহ আন-নাবাওইয়াহ*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৫ হিজরী

ঐ, *কাসাসুল আম্বিয়া*, কায়রো: দার আত-তালীফ, প্রথম মুদ্রণ ১৩৮৮ হিজরী

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল বাক্বী আয-যারক্বানী, *শারহ আয-যারক্বানী 'আলাল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়াহ বিল মিনাহ আল-মুহাম্মাদিয়াহ*, বৈরুত: দারুল কুতুব, ১৪১৭ হিজরী

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, বৈরুত: দারুল কুতুব, প্রথম মুদ্রণ ১৪১০ হিজরী

আবূ 'আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, তাহকীক: আহমাদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা.বি.

আবূ ইসহাক আশ-শিরাযী, *তাবাকাতুল ফুকাহা*, বৈরুত: দার আর-রাইদ আল-'আরাবী, প্রথম মুদ্রণ ১৯৭০ ঈসাব্দ

আবূ বাকর আহমাদ ইবন 'আলী আল-খাতীব, *তারীখু বাগদাদ*, বৈরুত: দারুল কুতুব, তা.বি.

'ইয-উদ্দীন ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ*, বৈরুত: দারুল কুতুব, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৫ হিজরী

✿ যুহদ, বিবিধ

আবুল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-মাওয়ারদী, *আদাব আদ-দুনয়া ওয়া আদ-দীন*, বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৮৬ ঈসাব্দ

আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.

'আলী ইবন 'আবদিল খালিক্ব আল-ক্বরনী, *হাকাযা 'আল্লামাতনী আল-হায়াত*, বৈরুত: আল-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মাকতাব আল-ইসলামী, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৮ হিজরী

ইবনু ক্বাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, *মাদারিজুস সালিকীন বাইনা মানাযিলি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন*, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯৩ হিজরী

ঐ, *মিফতাহু দারিস সা'আদাহ*, বৈরুত: দারুল কুতুব, তা.বি.

ইবন তাইমিয়াহ তাক্বিউদ্দীন আবুল 'আব্বাস, *মাজমূ' আল-ফাতাওয়া*, মাদীনাহ: মাজমা'উল মালিক ফাহাদ, ১৪১৬ হিজরী

ইবন রাজাব আবুল ফারাজ 'আবদুর রহমান আল-হাম্বালী, *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, প্রথম মুদ্রণ ১৪০৮ হিজরী

ইবন হাজার আল-হাইতামী, *আয-যাওয়াজির 'আন ইক্বতিরাফিল কাবাইর*, দিমাশক: দারুল ফিকর, প্রথম মুদ্রণ ১৪০৭ হিজরী

জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী, *আল-বির ওয়া আস-সিলাহ*, বৈরুত: মুআসসাসাতুল কুতুব আস-সাক্বাফিয়্যাহ, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৩ হিজরী

❖ কবিতা ও সাহিত্যতত্ত্ব

আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রাহমান ইবন 'উমার, *আল-ঈদ্বাহ ফী 'উলূমিল বালাগাহ*, বৈরুত: দারুল জাইল, তৃতীয় মুদ্রণ, তা.বি.

আবূ নুওয়াস, *দীওয়ান আবি নুওয়াস*, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরবী, ১৪২২ হিজরী

ইবন আর-রূমী 'আলী ইবন আল-'আব্বাস, *দীওয়ান ইবন আর-রূমী*, বৈরুত: দারুল কুতুব, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪২৩ হিজরী

বিভিন্ন যুগের অসংখ্য কবি, *দাওয়াওঈন আশ-শি'র আল-'আরাবী*, অন্তর্জালিক সংস্করণ: মাওক্বা'উ আদাব, ডিসেম্বর ২০১১ ঈসাব্দ

মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ, *দীওয়ান আশ-শাফি'ঈ*, জেদ্দা: মাকতাবাতু ইবন সীনা, তা.বি.

শিহাবুদ্দীন আন-নুওয়াইরী, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, কায়রো: দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসাইক্ব, প্রথম মুদ্রণ ১৪২৩ হিজরী

বাংলা

আল মাহমুদ, *কবির সৃজন বেদনা*, ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঈসাব্দ

ইসমাঈল হোসেন শিরাজী, *শিরাজী রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭৪ (ডিসেম্বর ১৯৬৭)

কাজী নজরুল ইসলাম, *গানের মালা (নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১২ ঈসাব্দ

ঐ, *গীতি শতদল*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: ডি.এম.লাইব্রেরী, ভাদ্র ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

ঐ, *বনের বেদে (নজরুল রচনাবলী ৭ম খণ্ড)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, কার্তিক ১৪১৯ বঙ্গাব্দ (নভেম্বর ২০১২ ঈসাব্দ)

ঐ, *বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: ডি. এম.লাইব্রেরী, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

ঐ, *ভাঙার গান*, চতুর্থ মুদ্রণ, কলিকাতা: ডি.এম.লাইব্রেরী, শ্রাবণ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

জীবনানন্দ দাশ, রূপসী বাংলা, কলিকাতা: সুধীরচন্দ্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ ঈসাব্দ)

ঐ, *ঝরা পালক*, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৯৫৭ ঈসাব্দ

ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, তৃতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঈসাব্দ)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কণিকা*, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ
ঐ, *চৈতালি (রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড)*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষসচিব কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ
ঐ, *শ্রাবণগাথা (রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড)*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব কর্তৃক প্রকাশিত, ফাল্গুন ১৩৯১ বঙ্গাব্দ
শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, *বাঙ্গলার পরিচিত পাখী*, কলিকাতা: গঙ্গা পাবলিশারস লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

ইংরেজি

Arthur Quiller-Couch (Editor), *The Oxford Book of English Verse (1250-1900)*, London: Clarendon Press, 1912
Andrew Bennett, *Keats, Narrative and Audience : The Posthumous Life of Writing*, 1st Edition, Cambridge University Press, 1994
Edith Wharton, *A Backward Glance*, New York : Scribner, 1998
Emily Dickinson, *Collected Poems*, 1st Edition, London: Courage Books, 1991
Henry Wadsworth Longfellow, *Ballads and other poems*, 2nd Edition, Cambridge University Press
Walter Isaacson, *Einstein: His Life and Universe*, New York : Simon and Schuster, 2000
William Shakespeare, *Hamlet*, New York : Henry Holt And Company, 1914

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীবের জন্ম চট্টগ্রামের লোহাগাড়াতে, ১৯৯৭ সনের ২২ জানুয়ারি। ড. মাহমুদুল হক ওসমানি ও জাহান আরা ইয়েসমিন-এর প্রথম সন্তান তিনি। বর্তমানে অধ্যয়ন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে। তিনি বাংলা, ইংরেজি ও আরবিসহ একাধিক ভাষায় পারদর্শী।

গেল বছর কাতারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিতর্কে বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন এবং একাধিক পর্বে 'শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক' হয়েছেন। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ইসলামিক সিভিলাইজেশন কনফারেন্সে তরুণ নিবন্ধকার হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন সম্প্রতি। কবিতা ও প্রবন্ধগল্পে ইতিমধ্যেই তিনি সব্যসাচী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'বৃষ্টিমুখর রৌদ্রমুখর' তার চতুর্থ প্রকাশনা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

SEAN
PUBLICATION

বসন্ত এসেছে। পত্র-পল্লব ফিরে পেয়েছে প্রাণ, চারপাশে ফুলের ঘ্রাণ আর পাখির গান। শীতের নিষ্প্রাণতায় কদিন আগেই মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়া প্রকৃতি এখন সজীবতায় মুখর। বসন্তের এই প্রাণ আমাদের প্রাণেও কি সঞ্চার হতে পারে?

আল্লাহর রাসূলের কাছে 'হৃদয়ের বসন্ত' ছিলো কুরআন। আমাদের চিরচেনা বসন্তের আবহ সামনে রেখে হৃদয়েও বসন্তের আবাহন অনুভব করা যায় কীভাবে? নিসর্গের গল্প শোনাতে শোনাতে কুরআনের বসন্তকে ছোঁয়ার প্রণোদনা দিতে আপনার কাছে এসেছে আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীবের ব্যতিক্রমী গদ্যরচনা 'বৃষ্টিমুখর রৌদ্রমুখর'।

বিষণ্নতার প্রহরগুলোকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে, জীবনের উঠোনকে জান্নাতের পুষ্পসৌরভে শোভিত করার প্রেরণা যোগানোর জন্যে, বিশ্বাসী তারুণ্যকে সুন্নাহর সবুজতা চিনিয়ে দেয়ার প্রয়াস নিয়েই এই বই।

ISBN 9789843368805
9 789843 368805
৳345.00
www.seanpublication.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com